সরাইখানার যাত্রী

ইবনে ইমাম

পরিবেশনায় :
হরফ প্রকাশনী
এ-১২৬ কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট
কলিকাতা-১২

SARAIKHANAR JATRI

A Bengali belles lettres

by

IBNE IMAM

Rs. Ten only

● প্রথম প্রকাশ
ফেব্রুয়ারী, ১৯৫৮

দশ টাকা

● প্রচ্ছদশিল্পী
সুব্রত ত্রিপাঠি

● প্রকাশক :
ডাঃ মোহম্মদ আবদুল জলীল
সোলেমানপুর, রাজীবপুর, ২৪ পরগণা।

মুদ্রক
মিসেস শান্তি দাশগুপ্ত,
নিরুপমা প্রিন্টিং ওয়ার্কস,
৩/১, নফর কোলে রোড,
কলকাতা-১৫।

বার্নার্ড শ' বলতেন প্রত্যেক শিল্পীর জীবনে তিনটি অধ্যায় আছে— Juvenile phase, Middle phase এবং Third Manner. নিটশে যেমন শোপেনহাওয়ারের দর্শনে বিশ্বাস করতেন কিম্বা ঊনবিংশ শতাব্দীর নবযুগ সৃষ্টিকারী প্যারিসের বিদ্রোহী শিল্পীরা যেমন সপ্তদশ শতাব্দীর রেমব্রাঁর আদর্শে বিশ্বাস করতেন, আমিও ঠিক তেমনি শেভিয়ান দর্শনে বিশ্বাস করি। সুতরাং 'সরাইখানার যাত্রী' আমার Juvenile phase এর লেখা।

ভ্রমণের নামগন্ধও যার মধ্যে আছে অভিজ্ঞ ফরাসীরা তাকে বড় সন্দেহের চোখে দেখে। সেইজন্যেই ফরাসীরা বলে, যারা দেশ ঘোরে তারা গল্প বানায়। ফরাসীদের কাছ থেকে ধার নিয়ে এই চশমাটা চোখে পরে যদি 'সরাইখানার যাত্রী' পড়েন (অবশ্য আমার এ বই কেউ কোনোদিন পড়বেন না সেটা আমি জানি।) তাহলে আপনাদেরও বিভ্রান্ত হবার সম্ভাবনা কম, আমিও বিস্তর ভুল বোঝাবুঝি থেকে বাঁচব।

৮৭, ঝাউতলা রোড,
কলকাতা ১৭

এই লেখকের

মীনা বাজার

বিশ্বের প্রবাদ

এক ॥

সন্ধ্যার চৌরঙ্গীও জাগল। পার্ক স্ট্রীটের হোটেলে আমারও ঘুম ভাঙলো।

ছোট্ট হোটেল। কিন্তু এরও যাত্রী সংগ্রহের দূত আছে। সেই ম্যাটীব মতো শুকনো, আবলুশ কাঠের মতো কালো, আধবুড়ো দূত প্রথমে হোটেলের অবস্থান, খাবারদাবার, আসবাবপত্র, সুখ-সুবিধেব খুব একচোট জাঁকালো বর্ণনা দিয়ে তারপর. 'আমি বলছি স্যার, আমাদের হোটেলে কোনোকিছুর অভাব কিম্বা অসুবিধে হবে না স্যাব, যা চাইবেন তাই পাবেন স্যার, অথচ খুব অল্প খরচ স্যার. ভেবে দেখুন স্যার, এতগুলো আবার এক সঙ্গে আর কোথায় পাবেন স্যার' ইত্যাদি বলে সকালবেলায় আমাকে এয়ারপোর্ট থেকে এখানে ধরে নিয়ে এসেছে।

চোখ মেলে দেখি দিনেব বেলাব নিঃঝুম চুপচাপ হোটেলটাও যেন সন্ধ্যার সঙ্গেসঙ্গে গা ঝাড়া দিয়ে জেগে উঠেছে।

দিনের বেলায় লোকজন আছে বলেই মনে হচ্ছিল না। এখন বঙীন আলোর ঝলমলানি। কত লোকের আনাগোনা। কত রকমের হট্টগোল।

ওদিকের হলঘরে এক দল মাদ্রাজী আর পাঞ্জাবী ভদ্রলোক বিলিয়ার্ড খেলছেন। পাশেই টেবিলে সাজানো কত রঙেব বোতল। সেখানে কত ঢঙেব হাসিব হুল্লোড়।

ও পাশের ঝুলন্ত বারান্দায় ছোট ছোট টেবিলে টেবিলে কত রং-বেরঙের মেয়ে পুরুষ গোল হযে বসে তাস, দাবা খেলছেন। সেখান থেকে ভেসে আসছে 'টু স্পেডস্', 'থ্রি হার্টস', 'ফোর ডায়মণ্ডস', 'হাঃ

হাঃ, কুইন অফ হার্ট', 'চেকমেট', 'ওঃ, ল্যাক লাক'। আর তারি সাথে সাথে অজস্র মেয়ে পুরুষের মিলিত কণ্ঠের হাসি। এ ও'র গায়ে গড়াগড়ি। ধোঁয়া উড়ছে। বোতল চলছে। জুয়োর আড্ডা। উর্দিপরা চাকররা সব হন্তদন্ত হয়ে ছুটোছুটি করে হুজুরদের হুকুম তামিল করছে। মুঠোমুঠো বকশীষ। পয়সার ছড়াছড়ি।

লাউঞ্জেও ফূর্তি। হল্লা। হাসি। হাততালি। চা আসছে। কফি আসছে। পাইপ সিগারেট পুড়ছে। তারি সাথে সাথে বোতল গেলাসের ঠুংঠাং।

এদিকে সেদিকে মৃদু মৃদু আলোয় নির্জনে রঙীন পর্দার আড়ালে আড়ালে আরো কত কী!

জানালা থেকে নীচের দিকে চেয়ে দেখতে পাচ্ছি ট্যাক্সির পর ট্যাক্সি আসছেই। জোড়ায় জোড়ায় ছেলেমেয়ে নামছেই—কোনো কোনো মেয়ের আবার মাথায় সিঁদুর - আর চোখের পলকেই হোটেলের কোথায় যেন তারা অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে। আবার খানিক পরে দেখি তারা জোড়ায় জোড়ায় বেরিয়ে চলে যাচ্ছে। তাদের আসা যাওয়ায় নাচের ছন্দ, উচ্ছলিত উল্লাস।

দিনের স্থির নিস্তব্ধ হোটেল যে, রাত্রির পরশমণির ছোঁয়ায় জেগে উঠে কী রূপ নেয় আগে আমার জানা ছিল না।

সন্ধ্যার চৌরঙ্গীর মীনাবাজারে কিম্বা সরাইখানার রঙের আসরে যাঁরা রং মেলাতে বসেননি তাঁদেরই একজন হচ্ছেন জওয়াদ সেলিম। আমার পাশের কামরায় থাকেন। ইরানী। বিদেশী দেখলে আমি নিজে থেকেই গায়ে পড়ে আলাপ করি। তাই সকালবেলায় হোটেলে পা দিয়ে দূর ইরানের এই দূতকে আমার পাশের কামরায় দেখে নিজেই গিয়ে আলাপ করেছি।

জওয়াদ সেলিম সোজা আমার ঘরে এসে একটা সোফায় আরাম করে বসে শুধোলেন, 'আপনার টিকিট হয়ে গেল?'

মুখ থেকে কিসের যেন একটু মৃদু গা মাতানো গন্ধ নাকে এসে লাগল।

বললুম 'হুঁ।'

একটু হাসির রসে বসিয়ে বললেন, 'অমৃতসরে যাচ্ছেন বটে, কিন্তু মনে রাখবেন অমৃতসর মেল অমৃত বিলি করে না। আমি কয়েকবার অমৃতসর গেছি। তাই জানি।'

আমি বললুম, 'আরো কয়েকজন ওই কথা বলছিলেন বটে। আপনার টিকিট হল?'

উনি যাবেন মাদ্রাজ।

পাইপের মুখে আগুন দিতে দিতে বললেন, 'হ্যাঁ। আপনি কবেকার টিকিট করলেন?'

'কালকের। আপনি?'

'আমিও কাল।'

'তাহলে একসাথেই বেরোনো যাবে। আপনারো তো সন্ধ্যেয় গাড়ী।'

'হুঁ—তা যেতে পারে।' তারপর খানিক চুপচাপ বসে বসে পাইপে দম দিয়ে বললেন, 'কিন্তু আর আমার দেশ ঘুরতে ভালো লাগছে না। এইবার দেশে ফিরে যেতে ইচ্ছে করছে। পাঁচ বছর হতে চলল দেশের মুখ দেখিনি। নানান কাজের ধান্দায় পাঁচ বছর বিদেশে বিদেশেই কেটে গেল। আপনি কখনও ইরাণে গেছেন?'

'না।'

জানালা থেকে দূর আকাশের দিকে একটু উদাস নয়নে খানিকক্ষণ চেয়ে থেকে বললেন, 'কোনো এক শীতের শেষে সোনালী বসন্তে একবার, জীবনে অন্তত একবার আসবেন ইরাণে। গাদা গাদা গোলাপ জাফরানের রঙে, বুলবুলের গানে, কার্পেটের নক্সায়,

আতরের গন্ধে, আঙুরের সোনায় আর মেয়েদের রূপের আলোয় এমন মায়াময় সুন্দর দেশ আর কোথায় আছে! আজ ইয়োরোপে চলেছেন, অনেক দেশ চোখে পড়বে,—তারপর যদি কোনদিন ইরাণে যান সে সব দেশের সঙ্গে মিলিয়ে দেখবেন, আমার কথা যদি ভুল হয়—

আমি বাধা দিয়ে বললুম, 'আর বলতে হবে না, জীবনে একবার না একবার আমি ইরাণে যাবই।'

কোটের পকেটের মধ্যে হাত চালিয়ে দিয়ে কী একটা বার করে বললেন, 'এই নিন, আমার একটা ছবি রেখে দিন। দুনিয়ার এই সরাইখানায় আরো কত লোকের সঙ্গে আলাপ পরিচয় হবে,—আজ বাইরের বিরাট মীনাবাজারে চলেছেন, সেখানে বড্ড ভীড়, হয়তো দুদিন পরেই আমার কথা ভুলে যাবেন। কিন্তু ছবিটা থাকলে অনেকদিন পরে দৈবাত কোথাও থেকে বেরিয়ে পড়লে তখন মনে পড়বে অনেকদিন আগে শরতের এক সন্ধ্যায় শহর কলকাতার পার্ক ষ্ট্রীটের এক ছোট্ট হোটেলে ইরাণের এক পাগল বলেছিল তার দেশে যাবার কথা। আর হয়তো তখন বেরিয়েও পড়তে পারেন। বেরোবার আগে আমায় যদি একটু জানান তাহলে আমি নিজে সঙ্গে করে আপনাকে ঘুরিয়ে দেখাব তেহরান—মায়াপুরী তেহরান, সেখান থেকে নিয়ে যাব কাজ্‌ভিন, কের্‌মান, কাশান, হরমুজ, হামাদান, তারপর যাব ইস্ফাহান, তাব্রিজ, পহ্‌লেভি, শিরাজ, নাইশাপুর—

বললুম, 'আর লোভ দেখাবেন না, ও সব নামগুলোতেই কী রকম একটা নেশা রয়েছে—তাহলে আর আমার ইয়োরোপ যাওয়া হবে না। অনেক টাকা দিয়ে টিকিট কেটেছি। সব মাটি হবে!'

তিনি বলেই চললেন, 'যে রাতে আপনাকে নিয়ে উর্মিয়ায় নৌকোয় করে বেড়াতে বেরোব, যেদিন উটের পিঠে আমরা বিশাল মরুভূমি

দশ্‌ত্‌-ই-কাভির কিম্বা দশ্‌ত্‌-ই-লুত্‌ পার হব, যেদিন ইস্ফাহানের ময়দান-ই-শাহ্‌ চিহল্‌-সতুন আর তেহরানের গুলিস্তান দেখব, যেদিন মসজিদ-ই-শাহ্‌ আর মসজিদ-ই-সুলায়মান—

তাড়াতাড়ি ফের বাধা দিয়ে বললুম, 'আজ আর ইরাণের কথা আমি কিছুতেই শুনব না।'

হেসে ফেলে বললেন 'আচ্ছা থাক, আজ আর বলব না।'

তারপর তিনি তাঁর ভাষায় আরব দেশের বিস্তর আঙুর খেজুরের রস আর ইরাণ দেশের গোলাপ জাফরানের রং মিশিয়ে মিশিয়ে একবার এক দল সওদাগরের সঙ্গে তার উটের পিঠে বিশাল মরুভূমি পার হয়ে সিরিয়া থেকে মিশর যাওয়ার বিচিত্র কাহিনী বর্ণনা [illegible] করে গেলেন।

আমার মনে তখনো সেই [illegible] বেড়ে [illegible]। তাই আমিও চুপচাপ বসে [illegible] ছবিটা কল্পনা করে নিতে লাগলুম—গাধা, ঘোড়া, উট [illegible] মরু পার হয়ে সারি [illegible] বহু পথ চলে তারা ক্লান্ত, চোখে [illegible] শুধু [illegible] তৃষ্ণা, ক্ষুধা, [illegible] এখনো করে করেও আল্লার [illegible] তাদের আকুল প্রার্থনা পৌঁছায়নি, নির্মল আকাশ একটুও সজল হয়নি। তারা জানে না কবে তারা এই জ্বলন্ত বিশাল মরু পার হয়ে পৌঁছবে সেই চির রহস্যময়ী দেশে, যেখানে দিগবিজয়ী বীর সীজার একদিন হার মেনেছিলেন ছেলেমানুষ চপলা রাণী ক্লিওপেট্রার চোখের দৃষ্টির কাছে। কবে তারা নীল নদীর জলে স্নান করে শীতল হবে। কবে দেখবে পিরামিড আর স্ফীনক্স; কবে তাদের পথ চলা শেষ হবে! তারা ক্লান্ত, অনেক মরুপথ এখনো সামনে পড়ে—মিশর এখনো অনেক দূর।

এমন সময় জওয়াদ দেমির আমাকে চমকে দিয়ে বললেন,

'অশোকলালজির সঙ্গে আপনার আলাপ হয়েছে ?'

'না তো ! কে অশোকলালজি ?'

আমার মুখের কথা লুফে নিয়ে বললেন, 'সে কী ! অশোক-লালজির সঙ্গে এখনো আলাপ হয়নি ! আমার পাশের কামরাতেই থাকেন। চলুন আলাপ করিয়ে দিই। উনিও কাল অমৃতসর মেলে পাঞ্জাব যাবেন ! বোম্বাই থেকে উনি এসেছেন।'

'তাই না কী ? চলুন।'

অশোকলালের ঘরে গিয়ে দেখলুম তিনি আর তাঁর স্ত্রী মুখোমুখি দুটো সোফায় বসে গল্প করছেন।

অশোকলাল বুড়ো মানুষ। এক মুখ পাকা দাড়ি। বড় স্নিগ্ধ চেহারা।

কিন্তু তাঁর স্ত্রী বয়সের তুলনায় তাঁর কাছে নেহাৎ খুকী। মাথায় ঘোমটা, সিঁথিতে চওড়া সিঁদুর। কপালে মস্ত গোলাপি রঙের টিপ।

আমাদের দেখে মাথার ঘোমটাটা আর একটু টেনে দিয়ে একটু জড়সড় হয়ে বসলেন।

বিবি বড় হতে হতে মিঞা ছাড়িয়ে গিয়েছেন, না, বুড়ো মিঞাই খুকী অর্ধাঙ্গিনী ল্যাজে বেঁধে পূর্ণাঙ্গ হয়েছেন কে জানে।

[illegible] সেলিম অশোকলালের সঙ্গে আমার আলাপ করিয়ে দিয়ে বললেন 'উনিও কাল অমৃতসব মেলে চলেছেন।' তারপর তিনি আপন সোফায় সারাক্ষণ এমনি মুরগি ঝিমুনি শুরু করলেন যে, মনে হল সাঁঝবেলায় নিজের ঘরে একান্ত গোপনে যে লাল বোতলের সাথে প্রেম জমিয়েছিলেন তারই আবছা নেশাটি ক্রমশ আরো ঘন হয়ে জমে আসছে।

॥ দুই ॥

আমিও কাল সন্ধ্যার অমৃতসর মেলের যাত্রী শুনে বোম্বায়ের অশোকলাল খুশী হয়ে আমাকে শুধালেন, 'আপনি কত দূর যাবেন?'

বললুম, 'অমৃতসর। তার পর অমৃতসর থেকে লাহোর, লাহোর থেকে করাচী—জাহাজ ধরতে।'

'জাহাজ কেন?'

'বিলেতে যাব কিনা। আমার ট্রাভেল এজেন্ট জানিয়েছেন, বোম্বাই থেকে আমার বার্থটা হঠাৎ শেষ মুহূর্তে ক্যানসেল হয়ে গিয়েছে। আমার কেবিন করাচীতে গিয়ে খালি হবে।'

'ও'—বলে উদাস হয়ে অশোক খানিকক্ষণ কী ভাবলেন। তার পর বললেন, 'আপনাকে অনেক দূর যেতে হবে—এ পথে বড় কষ্ট। আমিও যাব চণ্ডীগড়। অনেকটা পথ এক সাথেই যাওয়া যাবে।'

তার পর নানান রকম গল্পগুজবের ফাঁকে ফাঁকে দেখলুম ওঁর ঘন ঘন হাই উঠছে। তিনি আরাম করে দাড়িতে হাত বুলোতে বুলোতে সোফায় হেলান দিয়ে শুয়ে পড়লেন। আর শুয়ে পড়েই এমনি নাক ডাকা শুরু করলেন যে, সে বিচিত্র মধুর নাসিকা ধ্বনি শুনে মনে হল কানের পাশেই যেন অনবরত একটা গাধা ডাকছে। তখন বুঝতে পারলুম কেন বিলেতের এক মেমসায়েব রাত্রে স্বামীর নাক ডাকার অপরাধে কোর্টে ডাইভোর্সের জন্যে নালিশ করেছিলেন!

চেয়ে দেখলুম ওঁর নাক ডাকার শব্দে তাঁর খুকী বৌয়ের দুই গালে লজ্জার আভা ফুটে উঠেছে। বোধ হয় সেটা ঢাকবার জন্যই তিনি মাথার ঘোমটাটা আর একটুখানি টেনে দিয়ে তাড়াতাড়ি সেলাইয়ের ঝাঁপিটা খুলে ছুঁচে সুতো পরাতে শুরু করলেন।

অশোকলালের নাকের ডাক প্রচণ্ড থেকে প্রচণ্ডতম হয়ে মেঘ

গর্জনে পরিণত হতেই জওয়াদ সেলিমের নেশা ছুটে গেল। অশোকলালের দিকে খানিক লাল চোখ মেলে কটমট করে চেয়ে থেকে তাঁকে যেন ভস্ম করে দিয়ে, 'কাল তাহলে একসাথেই সব রওনা হওয়া যাবে' বলে টলতে টলতে নিজের ঘরে চলে গেলেন।

আমার পক্ষে উঠে চলে যাওয়াটাও খারাপ দেখায়, বসে থাকাটাও লজ্জার ব্যাপার—এ রকম অবস্থায় মহা অপ্রস্তুতে পড়ে গিয়ে চপচাপ বসে বসে ভাবতে লাগলুম কাল যদি এক সাথেই সবাই যাই আর বুড়ো অশোকলাল যদি কানের পাশে এ রকম নাসিকা গর্জন শুরু করেন তাহলে কতখানি কাবু হয়ে যেতে পারি!

এতক্ষণ নাক ডাকছিলেন, এইবার নাক ডাকার সঙ্গে ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে কথা বলতে শুরু করলেন। কথা বললে ভুল হবে। চ্যাঁচামেচি! রাজ্যের যত ভাব নিয়ে ধরে রকমারি মজাদার বুলি! এতক্ষণ লক্ষ্য করিনি, এইবার আড়চোখে পাশে চেয়ে দেখলুম ছোট্ট একটা টেবিলের উপরে এক গাদা ছোট ছোট বেসের বই।

এইবার তাঁর স্ত্রী ঠিক নিজের মাথার সিঁদুরের মতোই লজ্জায় লাল হয়ে ফ্রেমে আটা কাপড়টায় জোরে জোরে সূচ চালাতে চালাতে ঘন ঘন গলা খাকারি দিতে শুরু করলেন। স্বামীর কাণ্ড দেখে ভদ্রমহিলা যে ভেতরে ভেতরে শুকিয়ে উঠছেন বলে মনে হল।

অশোকলাল হঠাৎ ধড়মড় করে জেগে উঠে 'হুঁ', কী বলছিলুম যেন' বলে একবার ডাইনে একবার বাঁয়ে চেয়ে আরাম করে একটা সিগারেট ধরিয়ে পর্দার ফাঁক থেকে সামনের বারান্দার দিকে খানিক চেয়ে থেকে হাউমাউ করে চেঁচিয়ে উঠলেন, 'আরে, আরে, ও হাতিমভাই হাতিমভাই এখানে এস।'

অশোকলালের মুখে হাতিমভাই সম্পর্কে খবর পেলুম সিন্ধের মরুভূমি থেকে তিনি এসেছেন। কাপড় ব্যবসায়ী। অশোকলাল বললেন; 'কিন্তু হলে কী হবে? কাপড়ের ব্যবসাও কদ্দিন থাকে

কিছুই বলা যায় না। যে কোনদিন শুনব দোকানে লালবাতি জ্বেলে দিয়েছে। ব্যাচিলরগুলোর যা রোগ—কোনো একটা কাজে বেশিদিন মন লাগিয়ে থাকতে পারে না। একবার এটা একবার ওটা করে করেই জীবনটা কাটিয়ে দিল। তাই তো জীবনে কখনো ব্যাচিলর থাকতে নেই।'

সিন্ধের হাতিমভাই এলেন। বুড়ো হয়েছেন। ছাপমারা ব্যাচিলরের চেহারা। রোগা, শুকনো খটখটে! আধমরা গোছের। লম্বা যেন তালগাছ।

হাতিমভাই আসতেই অশোকলাল এক দমে বলে গেলেন, 'তুমিও তো কাল অমৃতসরে যাচ্ছো? ইনিও কাল যাচ্ছেন অমৃতসর। নতুন যাচ্ছেন, একটু দেখিয়ে শুনিয়ে নিয়ে যেও। আমার তো চণ্ডীগড়ে গিয়েই শেষ।'

বুড়ো হাতিমভাই বললেন, 'যাব ভেবেছিলুম, কিন্তু আমার কাল যাওয়া হচ্ছে না।'

অশোকলাল কটমট করে চেয়ে শুধোলেন, 'কেন—কেন?'

হাতিমভাই খানিকক্ষণ লজ্জা লজ্জা করে মাথা চুলকে তার পর তাঁর প্রশ্নের উত্তরটাকে এড়িয়ে যাবার জন্যেই যেন তাড়াতাড়ি আমাকে শুধোলেন, 'অমৃতসরে কেথায় যাবেন? শিখেদের স্বর্ণমন্দির দেখতে?"

অশোকলাল কী যেন একটা বুঝতে পেরে একটুখানি মুচকি হাসলেন। চেয়ে দেখি হাতিমভায়ের কান দুটো লাল হয়ে উঠেছে।

আমি বললুম, 'অমৃতসরে আমি নামব না। অমৃতসর থেকে যাব লাহোর, লাহোর থেকে যাব করাচী।'

'আহা-হা অমৃতসর দেখবেন না'—এমনভাবে হাতিমভাই কথাটা বললেন যেন অমৃতসর না দেখলে মানব জন্মটাই বৃথা গেল। বললেন, 'ভারি ভালো জায়গা। আমি অনেকদিন অমৃতসরে কাটিয়েছি।

অমৃতসরেই আমার ব্যবসায় হাতে-খড়ি হয়েছিল।' তার পর ফের কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থেকে বললেন, 'নানান কাজের ধান্দায় আমি বহু দেশ চষে বেড়িয়েছি। আজ আমার চুলদাড়ি সব পেকে গেছে, আজ আমি ক্লান্ত। পারে নৌকো ভিড়িয়ে বসে আছি কবে আমার ডাক আসবে তারই আশায়। যাক সে সব কথা। আপনার তাহলে ভারি কষ্ট হবে দেখছি—প্রায় দু'হাজার মাইল। বড় দূরের যাত্রা আপনার। লাহোর থেকে করাচী প্রায় সাত আটশো মাইল। আর এই সাত আটশো মাইল রেলপথের দুধারে দেখবেন কেবল মাইলের পর মাইল ধু ধু মরুভূমি আর ছোট ছোট কাঁটা গাছের ঝোপ। দেখে দেখে দম বন্ধ হয়ে আসবে। জনপ্রাণীর চিহ্ন পর্যন্ত দেখতে পাবেন না,—শুধু খুব ভোরবেলায় মাঝে মাঝে দেখবেন সওদাগরদের দু একটা উটের সারি ধীরে মন্তরে চলেছে মরু পার হয়ে। গরম দমকা হাওয়া আর বালির ঝাপট একেবারে আধমরা করে দেবে। কিন্তু হ্যাঁ, আছে—এ পথেও মাধুরী আছে। মরুভূমির পর মরুভূমি পার হতে হতে হঠাৎ একসময় দেখবেন সবুজ সিন্ধুনদী তলতল ছলছল করে বয়ে চলেছে। আহা! দেখে চোখ জুড়িয়ে যাবে। মরা প্রাণ আবার বেঁচে উঠবে। করাচী কেন যাবেন?'

অশোকলাল আমার হয়ে বলে দিলেন, 'অনেক দূরের যাত্রী উনি। যাবেন বিলেত, তাই করাচী চলেছেন জাহাজ ধরতে।'

শুকনো হাকিমভায়ের মরা চোখদুটো আনন্দে জ্বলজ্বল করে উঠল। বললেন, 'আচ্ছা! বিলেত চলেছেন! তাহলে করাচী পৌঁছেও আপনার যাত্রা শেষ হবে না? আমার ওই একটাই দুঃখু জীবনে রয়ে গেল—এত দেশ ঘুরলুম কিন্তু বিলেতটা দেখা হল না। কতবার বোম্বায়ের সমুদ্রকূলে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কত স্বপ্ন দেখেছি, কত জাহাজ আমার চোখের সামনে দিয়ে চলে গেছে—কিন্তু ওই পর্যন্তই। সে জাহাজে আমার চড়ে বসা আর হল না কোনোদিন। ভারি ইচ্ছে

ছিল একবার দেখার। ও সব দেশ না দেখলে মানুষই হওয়া যায় না, এ কথা স্বীকার করতেই হবে—তা সে ওদের ওপরে আমাদের যত রাগই থাক। কিন্তু আমার আর হবে না। দিন এসেছে শেষ হয়ে। তাই আজ আপনি অনেক দূরের পথ পার হয়ে, অনেক সাগর পেরিয়ে বিলেত চলেছেন শুনে খুশী আমার ধরছে না। করাচী পর্য্যন্ত আপনার বন্ধু জুটিয়ে দিচ্ছি, দাঁড়ান। আমার কাশ্মীরী বন্ধু কাউলজিও এই হোটেলেই উঠেছে। সেও ওই পথেই কাল করাচী যাবে বলেছিল। তাকে নিয়ে এসে আপনার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিচ্ছি।'

কাশ্মীরের কাউলকে দেখলুম বোম্বায়ের অশোকলালও চেনেন। তিনি বললেন, 'কাউলজির তো আজকেই চলে যাওয়ার কথা ছিল?'

হাতিমভাই বললেন, 'হ্যাঁ ছিল, কিন্তু যায়নি। জানো তো কী রকম জুয়াড়ী? কাল রাতে জুয়োয় সর্ব্বশান্ত হয়ে হোটেলে ফিরেছে। একটা পয়সাও নেই, তাই আজকে যেতে পারেনি। আপনি বসুন, আমি কাউলজিকে ডেকে নিয়ে আসছি।'

হাতিমভাই বেরিয়ে গেলে অশোকলাল বললেন, 'এই এক পাগল!'

আমি বললুম, 'কে, হাতিমভাই, না কাউলজি?'

'হাতিমভাই!

'কেন?'

'শুনলেন না, বলল, কাল অমৃতসর যাওয়া হচ্ছে না? অথচ আমি জানি ওর টিকিট পর্য্যন্ত কাটা হয়ে গিয়েছিল! আসল ব্যাপার কী জানেন? বহুকাল থেকে ও এক পাঞ্জাবী মেয়ের পাল্লায় ফেঁসে রয়েছে। সেই মেয়েটাই ওকে কোনদিন কিছু করতে দিল না। বিয়ে করবে বলে বিয়ে তো শেষ পর্যন্ত করলই না, অথচ ওকে চিরকাল নাচিয়ে বেড়াচ্ছে। ওর টাকাপয়সা যা কিছু ছিল সব সেই সর্বনেশে মেয়ে শুষে নিয়েছে। সে যে এ রকম কতগুলো লোককে

এক সাথে নাচাচ্ছে তার ঠিক নেই। অথচ লোকগুলোও এমনি বোকা যে, সব বুঝেসুঝেও তারই হাতে সারাজীবন বাঁদর নাচ নাচছে! এক্কেকটা মেয়ের এ রকম আশ্চর্য ক্ষমতা থাকে! ঝানু মেছো যেমন মাছকে বঁড়শিতে গেঁথে অনেকক্ষণ ধরে খেলায়, সেই মেয়েও তেমনি এক সাথে চার পাঁচজনকে তার বঁড়শিতে গেঁথে খেলাচ্ছে আর দুহাতে করে তাদের টাকাপয়সা শুষে খাচ্ছে। হাতিমভাইজির এই বুড়ো বয়েসেও আক্কেল হল না! হাতিমভাই কলকাতায় এসেছে শুনে সেই ডাইনীও নিশ্চয়ই কলকাতায় এসে জুটেছে,—হাতিমভাই তাই রোজই যাব যাব করে কিছুতেই কলকাতা ছেড়ে নড়তে পারছে না।'

তাঁর স্ত্রীর এক মনে সেলাই করতে করতে হঠাৎ ফের একটুখানি গলা খাকারি দেওয়ার দরকার পড়ল! অশোকলাল তাড়াতাড়ি চুপ করে গেলেন।

এতক্ষণে বুঝলুম অশোকলাল কেন তখন মুচকি হেসেছিলেন এবং হাতিমভায়ের কানদুটো কেন লাল হয়েছিল।

সিঁড়ির হাতিমভায়ের সঙ্গে এলেন কাশ্মীরের কাউল। যেন স্বয়ং গালিভার। আর তাঁর চারপাশে আমরা সব লিলিপুটিয়ান!

অশোকলাল বললেন 'তুমি না কী-কাল পাঞ্জাব হয়ে করাচী যাচ্ছো?'

কাউল হেঁড়ে গলায় বললেন, 'যাওয়ার কথা তো আজকেই ছিল, কিন্তু কপালের দোষে কাল রাতে জুয়োয় সব হেরে গেলুম তাই আজ আর যাওয়া হল না। আমার মাড়োয়াড়ী বন্ধু চুড়ি-ওয়ালার কাছ থেকে মোটা সুদে টাকা ধার করে এনে আজ হোটেলের সাপ্তাহিক বিল দিয়েছি। এখন ফের চলেছি জুয়ো খেলতে। আজ হয়তো হোটেলেই ফিরব না, সারা রাত জুয়ো খেলব,—যদি জিতে যাই তাহলে কাল নিশ্চয়ই করাচী যাবো।'

অদ্ভুত লোক!

অশোকলাল হেসে বললেন, 'সেই প্রবাদ আছে না, এ বছর
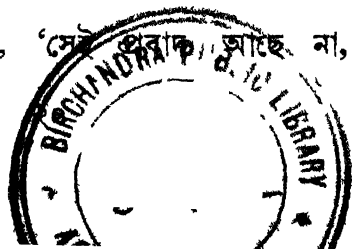
খান যদি সত্যি হয় আমি তাহলে রাজা হব? তোমার করাচী যাওয়া দেখছি ওই রাজা হওয়ার মতো! ফের জুয়ো খেলার টাকা পেলে কোত্থেকে?'

কাউল বললেন, 'ওই যে বললুম চুড়িওয়ালার কাছ থেকে টাকা ধার করে এনেছি।'

হাতিমভাই তাঁর সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দিয়ে তাঁকে বললেন, 'ইনি চলেছেন করাচী, তুমি যদি কাল যাও একটু দেখোশুনো।'

কাউল বললেন, 'জুয়াড়ী বলে কী আমার একটা কাণ্ডজ্ঞান নেই? সে কথা কী তোমায় শিখিয়ে দিতে হবে? আমি না দেখলে শুনলে ওঁকে ওই চিঁড়েচ্যাপ্টা শরীর নিয়ে আর করাচী পর্যন্ত পৌঁছতে হবে না। মাঝ পথেই শুকিয়ে শুকটি হয়ে যাবেন।'

অশোকলাল আমার দিকে চেয়ে সাদা দাড়িতে কালো চিরুণী চালাতে চালাতে বললেন, 'এই পাঞ্জাব লাইনে ঘুরে ঘুরে আমার চুলদাড়ি পেকে গেল। মনে রাখবেন অমৃতসর মেলের যাত্রী হয়ে কেউ যদি না অনবরত কলা আর লাড্ডু খায় তবে সে যেন অমৃতসর পৌঁছবার আশা না রাখে।'

সিন্ধের হাতিমভাই দুই মরাচোখে একগাদা অবজ্ঞা নিয়ে তাঁর দিকে তাকিয়ে বললেন, 'রাখো তোমার কলা আর লাড্ডু।' তার পর আমার দিকে চেয়ে বললেন, 'এক মিনিট।' এবং সঙ্গে সঙ্গে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

আমরা কিছু বুঝতে না পেরে সবাই চোখ চাওয়াচাওয়ি করছি, এমন সময় ফিরে এলেন হাতিমভাই।

এসেই পকেট থেকে গুরু নানকজির মূর্তিওয়ালা একটা স্বর্ণমুদ্রা বার করে বললেন, 'অমৃতসরের এক বুড়ো সর্দারজি এটা আমায় দিয়েছিলেন। এ মুদ্রার অনেক গুণ।' তারপর আমার কপালে মুদ্রাটা বার দুয়েক ছুঁইয়ে দিয়ে বললেন 'ব্যাস, আর কিচ্ছু ভয় নেই,

করাচী পর্যন্ত বহাল তবিয়তে পৌঁছে যাবেন।'

সঙ্গে সঙ্গে কাশ্মীরের কাউল সোফা ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে গম্ভীর হয়ে আমায় বললেন, 'এক মিনিট।' তারপরেই অদৃশ্য।

খানিক পরে হাতে এক রঙীন কার্পেটের ঝুলি নিয়ে ফিরে এলেন। এসে একবার অশোকলালের দিকে চেয়ে বললেন, 'ভারি কলা লাড্ডু শেখাচ্ছেন!' একবার হাতিমভায়ের দিকে চেয়ে বললেন, 'ভারি আমার স্বর্ণমুদ্রাওয়ালা হয়েছেন!' তারপর আমার হাতে সেই ঝুলিটি ধরিয়ে দিয়ে বললেন, 'ও সব কলা লাড্ডু স্বর্ণমুদ্রাফুদ্রা কিছুই লাগবে না। এই এক থলি আপেল আপনাকে দিলুম। আমার দেশের আপেল। সারা পথ চিবোতে চিবোতে এর জোরেই আপনি আপনার খাবি খাওয়া প্রাণটাকে দিব্যি তাজা রেখে করাচী পৌঁছে যাবেন।'

তার পরেই হাতের ঘড়ির দিকে চেয়ে চমকে উঠে বললেন, 'ও', বড্ড দেরী হয়ে গেল, আমায় এখন জুয়োয় যেতে হবে—' সঙ্গে সঙ্গে ঝড়ের বেগে বেরিয়ে গেলেন।

হাতিমভাই বললেন, 'মানুষ যত হেরে যায় জুয়োর ভূত তত আরো বেশী করে ঘাড়ে চাপে। আমিও যাই, আমায় একবার এসপ্ল্যানেডে যেতে হবে।'

হাতিমভাই চলে গেলে অশোকলাল হেসে বললেন 'শুনলেন তো? সেই মেয়ে নিশ্চয়ই ওর জন্যে এসপ্ল্যানেডের কোথাও অপেক্ষা করছে। হাতিমভাই-ই দেখালে। বুড়ো বয়েসে এক কেলেঙ্কারী!'

মরুভূমির বুড়ো হাতিমভাই যে, আসলে চৌরঙ্গীর সন্ধ্যায় মনে একটু রং লাগাবার অভিসারে বেরোলেন সেটা যেন আমিও তাঁর এসপ্ল্যানেডে যেতে হবে বলার ধরণে একটুখানি বুঝতে পেরেছিলুম। অশোকলাল বললেন, 'ব্যাচিলরগুলোর ঘাড়ে বুড়ো বয়েসে এ্যায়সা প্রেমের ভূত চাপে যে, সে ভূত ঘাড় মটকে না খাওয়ার আগে আর তাদের রেহাই নেই!'

লাউঞ্জ থেকে ঝোলানো বারান্দা থেকে তখনো ইংরেজির ফাঁকে ফাঁকে কানে ভেসে আসছে, 'টু স্পেডস,' 'টু নো ট্রাম্পস', 'থ্রি হার্টস্', 'হাঃ হাঃ, কুইন অফ হার্ট, 'ওঃ, লাক—লাক', 'চেকমেট—চেকমেট।'

সরাইখানার আসরে কার কপাল খুলল, কার কিস্তিমাৎ হল জানি না। দু'হাজার মাইলের ধাক্কা সয়ে আমার করাচী পৌঁছনোর বাজীমাৎ হবে কী না তাই ভাবতে ভাবতে আনমনে উঠে পড়লুম।

॥ তিন ॥

কাশ্মীরের কাউল ফের জুয়োয় হেরে গিয়ে ফতুর হয়ে হোটেলে ফিরে এলেন বলে তাঁর পক্ষে করাচী যাওয়াটা সত্যি সত্যিই সেই ধান সস্তা হলে রাজা হওয়ার মতো হয়ে গেল।

সিন্ধের হাতিমভাই বঁড়শিতে ফেঁসে রয়েছেন বলে সুতো ছিঁড়ে আমাদের সঙ্গে অমৃতসর মেলের যাত্রী হতে পারলেন না।

সন্ধ্যেবেলায় তল্পিতল্পা বেঁধে আমি, বোম্বায়ের অশোকলাল, তাঁর স্ত্রী আর ইরাণের জওযাদ সেলিম হোটেল ছেড়ে বেরিয়ে পড়লুম।

জওয়াদ সেলিম উঠলেন মাদ্রাজের গাড়ীতে। আমরা অমৃতসর মেলে।

অশোকলাল পর পর দুরাত্রি ঘুমের ঘোরে ঘোড়াদের নাম ধরে নানান সুরে নানানরকম বুলি আওড়ে চণ্ডীগড়ে নেমে গেলেন।

পার হল অমৃতসর। পৌছলুম লাহোর। এই দীর্ঘ রাস্তা কড়া রোদের ট্যাকা আর আগুনে হাওয়ার ঝাপটা লেগে লেগে, গাড়ীর ঝাঁকুনি খেয়ে খেয়ে আমি তখন একেবারে কাবু হয়ে পড়েছি। কিন্তু আমার দিল্লী এখনো দুরস্ত্—যেতে হবে সেই করাচী। এখনো সাত আটশো মাইলের ধাক্কা।

লাহোরে পৌছে শুনলুম ঘন্টা দুয়েক পরেই করাচীর গাড়ী ছেড়ে যাবে। তাই সব ক্লান্তি গা থেকে ঝেড়ে ফেলে দিয়ে মালপত্র সিন্ধী কুলিটার জিম্মায় রেখে মরিয়া হয়ে ছুটলুম করাচীর টিকিট কাটতে। বুড়ো টিকিট-সায়েব ফোকলা দাঁত বার করে হেসে বললেন, 'আজকের করাচীর গাড়ীতে একটুও জায়গা নেই, সব সিট আগে থেকে বিক্রী হয়ে গিয়েছে।'

মাথায় বজ্রপাত।

মুখ কালো করে ফিরে এসে কুলিটাকে সব কথা বললুম। সিঙ্গী কুলির বেড়াল-চোখ দুটো হেসে উঠল। কানের কাছে একটা হাত তুলে বলল, 'আঁ জী?' কানে একটু বেশী শোনে! ফের বললুম। তার চোখ দুটো আবার ধারালো ছুরীর মতো হেসে উঠল। একটু চুপ করে থেকে বলল, তাকে 'রুপি' দিলে সে সব ব্যবস্থা করে দিতে পারে। রেলের সব কর্তাদেরই সে চেনে। তাদের কী করে স্বায়েল করতে হয় তার জানা আছে। চোখের আড়ালে ভিতরে ভিতরে কী অসম্ভব সব কীর্তি চলে তারও এক লম্বা ফিরিস্তি দিল।

শুধোলুম, 'কত দিতে হবে?'

দু'হাতের দশটা আঙুল সামনে মেলে ধরল। তার চোখ দুটো সাপের চোখের মত হাসছে।

মরিয়া হয়ে বললুম, 'ঠিক আছে তাই দেগা'।

সে মালপত্র ঘাড়ে তুলে বলল, তবে আসুন আমার সঙ্গে।

তারপর এক জায়গায় বসিয়ে এদিক ওদিক ছুটোছুটি করে একবার এ কর্তার কানে ফিসফাস, একবার ও কর্তার কানে গুজগাজ করে কী সব বলে রাজ্যজয়ের গর্বে ফিরে এসে খবর দিল, 'হো গিয়াজী।'

তবুও ভরসা পেলুম না। শুধোলুম, 'ঠিক হবে তো?'

কানের কাছে হাত তুলে বলল, 'আঁ জী?'

জোরে বললুম, 'ঠিক পাব তো?'

চোখ হাসিয়ে বলল, 'হাঁ জী।'

তার পর ফিসফিস করে বলল, 'একটু পরেই একজন সায়েব এসে আপনাকে টিকিট দিয়ে যাবেন। তখন টিকিটের দামের সঙ্গে বাড়তি দশ রুপি সায়েবের হাতে দেবেন।' বলে চোখ টিপল।

ওস্তাদ কুলি!

আমিও ফিসফিস করে বললুম, 'আচ্ছা। কিন্তু টিকিট পেলেও সিট পাব তো ঠিক?'

বলল, 'আ জী ?'

ফের বললুম, 'টিকিট পেলেও সিট ঠিক পাব তো?'

তার মুখে সেই এক বুলি, 'হা জী।'

তার পর বুক ঠুকে বলল, 'সে ভার তো আমার। বসিয়ে দিতে না পারি আমাকে রুপি দেবেন না।'

খানিক পরে এক কর্তা এসে ইশারায় একদিকে ডেকে নিয়ে গিয়ে আমার হাতে একটা স্লিপ ধরিয়ে দিয়ে বললেন, 'এই আপনার টিকিট।'

আমি তাড়াতাড়ি সায়েবকে টিকিটের দামের সঙ্গে বাড়তি দশ রুপি দিলুম। সায়েব 'থ্যাঙ্ক ইউ' বলে, কোথায় কোন সিটে বসাতে হবে কুলিটাকে সবকিছু বুঝিয়ে দিয়ে আমায় বললেন, 'আপনার শোবার মত কোনো সিটের ব্যবস্থা কিন্তু করতে পারলুম না। ছোট্ট একটা সিট পাবেন। সারা রাস্তা আপনাকে বসে থাকতে হবে।'

বললুম, 'ঠিক আছে।'

সিন্ধী কুলি মালপত্র ঘাড়ে তুলে বলল, আইয়ে জী। চললুম। রেলের এক মুড়ো থেকে আর এক মুড়োয় নিয়ে গিয়ে প্রকাণ্ড এক কামরায় জানালার ধারে ছোট্ট একটা সিটে বসিয়ে দিয়ে এক মুখ হলদে দাঁত বার করে হাত পেতে বলল, 'আমার রুপি ?'

রুপি নিয়ে সে চলে গেল।

আমি সেই ছোট্ট সিটে ফ্রেমে আটকে যাওয়ার মত করে এঁটে বসে রইলুম। সাত আটশো মাইল ঠায় এইভাবে বসে থাকতে হবে! গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল।

রেল ছাড়ার ঘণ্টা বাজতেই সেই টিকিট-সায়েবটি কোথা থেকে ছুটে এসে বললেন, 'সিট পেয়েছেন তো? আই উইশ ইউ এ গুড জার্নি। আপনার খুব কষ্ট হবে। আই এ্যাম ভেরি সরি।'

রেলে এক লক্ষ্ণৌই ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ হয়েছিল। দেশ বিভাগের পর তিনি করাচী চলে গিয়েছেন। করাচী পৌঁছে বিছানাপত্র

থেকে বালি ঝাড়তে ঝাড়তে তিনি শুধোলেন, 'আপনি কোথায় উঠবেন ?'

বললুম, 'আমার এক বন্ধু জিন্না হাসপাতালের ডাক্তার। হাসপাতালের মধ্যেই তাঁর কোয়ার্টার। তাঁর ওখানেই উঠব।'

বললেন, 'আমিও ওইদিকেই যাব। আমার ভাই ষ্টেশনে গাড়ী নিয়ে আসবে। আপনার যদি আপত্তি না থাকে তবে আমার গাড়ীতেই চলুন, আপনাকে জিন্না হাসপাতালে নামিয়ে দিয়ে যাই। আপনি তো করাচীর কিছুই চেনেন না। শেষে কোন্ ড্রাইভারের পাল্লায় পড়বেন আর সে আপনাকে বিদেশী দেখে ইচ্ছে করে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে ভাড়া চড়াবে। জিন্না হসপিটাল সে ব্যাটা আর কিছুতেই খুঁজে পাবে না! করাচী বড় খারাপ জায়গা।'

আমি বললুম, 'সে শুধু করাচী কেন, ড্রাইভার গাড়োয়ানরা প্রায় সব জায়গাতেই এক।'

জিন্না হাসপাতালে নামিয়ে দিয়ে তিনি বললেন, 'সময় পেলে একবার দেখা করবেন। আমার ঠিকানা মনে আছে তো ?'

বললুম, 'নিশ্চয়ই দেখা করব। আপনার ঠিকানা আমি পাকা নোট বই-এ লিখে রেখে দিয়েছি।'

পরদিন সকালবেলায় চায়ের টেবিলে ডাক্তারকে শুধোলুম, 'মেরী রোড কোথায় জানেন না কি ?'

ডাক্তার বললেন, 'হঠাৎ মেরী রোড কী দরকার পড়ল ?'

'আমার ট্রাভেল এজেন্ট শেষ মুহূর্তে টেলিগ্রাম করে জানিয়েছিলেন ফ্রান্স আর ইটালীর ট্রান্জিট ভিসা লাগবে। ফ্রান্সের ভিসা আমার নেওয়া আছে, কিন্তু ইটালীর ভিসা নেওয়া হয়নি। টেলিফোন গাইডে দেখলুম ইটালিয়ান এমবেসি মেরী রোডে। আজ সকালেই ভিসার ঝামেলা সেরে ফেলতে চাই হাতে তো সময় খুবই কম।'

ডাক্তার বললেন, 'আমিও নতুন এসেছি। করাচীর সব রাস্তা এখনো চিনে নেওয়া হয়নি। মেরী রোডের নাম আপনার কাছেই

এই প্রথম শুনলুম। রিক্সাওয়ালাদের বললেই ওরা নিয়ে যাবে। তবে একটা ব্যাপারে সাবধান হবেন। করাচীর রিক্সাওয়ালারা বড় খারাপ, বেশীর ভাগই সিন্ধী—ভয়ানক হিংস্র। লোকের চালচলন, কথা বলার ধরণ দেখলেই ওরা বুঝে যায় কে বিদেশী আর কে বিদেশী নয়। বিদেশী বুঝলেই ওরা পাঁচ মিনিটের রাস্তা এদিক সেদিক ঘুরিয়ে পাঁচ ঘণ্টায় পৌঁছোয়। তখন যদি দাম নিয়ে কেউ ওদের সঙ্গে বেশী গোলমাল করে তাকে ওরা সোজা খুন-জখম করে দিতেও দ্বিধা করে না। সুতরাং একটু সাবধান হবেন। সে রকম কোনো রিক্সাওলার খপ্পরে পড়লে বরং সে যা দাম চায় তাই দিয়ে দেবেন, গোলমাল করবেন না।'

কপাল খারাপ তাই সে রকম এক রিক্সাওয়ালার পাল্লাতেই পড়ে গেলুম। হাসপাতালের গেটের সামনেই রিক্সায় বসে বসে ঝিমোচ্ছিল। বুক ফুলিয়ে গট্ গট্ করে গিয়ে বললুম, 'মেরী রোডে যাব।'

পাখি যে রকম ঝিমোতে ঝিমোতে হঠাৎ শব্দ পেলে চোখ বাঁকিয়ে সজাগ হয়ে ওঠে, সেইরকম চমকে জেগে উঠে বলল, 'আঁ জী?'

'মেরী রোডে যাব।'

কাঁচা না পাকা আমাকে বাজিয়ে দেখবার জন্যেই যেন বোধ হয় আকাশ থেকে পড়ে বলল, 'মেরী রোড! সে আবার কোথায়?'

আমাকে চুপ করে থাকতে দেখে সায়েবের দৌড় বুঝতে তার বাকী রইল না। বেড়াল-চোখ দুটো হাসিয়ে বলল, 'আচ্ছা বসুন, লোককে শুধিয়ে শুধিয়ে ঠিক পৌঁছে দোব!'

বুঝতে পারলুম অধিক সন্ন্যাসী লাগবে না, আজ এক সন্ন্যাসীতেই আমার গাজন নষ্ট হবে। কপাল ঠুকে বসে পড়লুম। সে তার সাইকেলে ঘন্টি দিল।

তার পর ইচ্ছে করে অচেনার ভান করে একে শুধিয়ে তাকে শুধিয়ে সরু সরু অলি-গলির ভিতর থেকে একই বড় রাস্তায় বার তিনেক

করে চককর লাগিয়ে. কোথাও তাদের আড্ডা দেখলে সেইখানে নেমে গিয়ে ইয়ার-দোস্তদের সঙ্গে খানিক ইয়ার্কি করে, পান খেয়ে, গাঁজায় দম দিয়ে বিঁড়ি ফুঁকতে ফুঁকতে ফিরে এসে 'হাঁ, এইবারে বন্ধুদের কাছ থেকে পাকা খবর নিয়ে এসেছি' বলে ফের সাইকেলে চড়ে আবার শহরের উত্তরে দক্ষিণে, পূর্বে পশ্চিমে ঘুরিয়ে যখন ইটালিয়ান এমবেসিতে পৌঁছে দিল তখন এগারোটা বেজে. গিয়েছে। বাড়ি থেকে বেরিয়েছিলুম আটটায়। কিন্তু ডাক্তারের তালিম দেওয়া ছিল, তাই বিশেষ কোনো গোলমাল না করে তার দাম চুকিয়ে দিয়ে নেমে পড়লুম।

সিঁড়ি দিয়ে উঠে সামনের ঘরেই দেখতে পেলুম প্রকাণ্ড ভুঁড়িওয়ালা, টেকো মাথা, জয়ঢাকের মতো মোটা দু'জন ইটালিয়ান সামনাসামনি বসে ভাঙা ভাঙা হেঁড়ে গলায় ঠিক যেন মেশিনের মতো অনর্গল প্রচণ্ড তোড়ে কথা বলে চলেছেন। কথা বললে ভুল হবে। কথার ঝড়। কথা বলতে কোনো খর্চা লাগে না বলেই কথা বলার শক্তিটার লোকে এত অপব্যবহার করে যে, সে আর বলবার নয়। একেকটি লোক যেন একেকটি কথা বলার যন্ত্র! মনে মনে বললুম কথার উপরে ট্যাক্স বসানো উচিত। কথার তোড়ে আমাকে তাঁরা লক্ষ্যই করলেন না।

একটু গলা খাঁকারি দিয়ে বললুম, 'আমার একটা ভিসা লাগবে।'

দু'জনেই এক সঙ্গে যেন মেঘ গর্জন করে বলে উঠলেন, 'ওয়াত্' ওয়াত্?'

'আমার একটা ভিসা লাগবে।'

ফের দু'জনেই এক সঙ্গে গর্জে উঠে বললেন, 'পাস্‌পোত্—পাস্‌পোত্।'

পাসপোর্টটা এগিয়ে দিলুম।

উল্টেপাল্টে দেখে ঘরে যেন বাজ হাঁকিয়ে বললেন, 'থাত্তি—থাত্তি

বুঝতে না পেরে ককিয়ে উঠে বললুম, 'হোয়াট থাত্তি?'

'থাত্তি রুপিজ—থাত্তি রুপিজ।'

বলে কী! তি—রিশ টাকা একটা ট্রান্জিট ভিসার ফি! এই বিদেশ-বিভুঁয়ে আমার সম্বল মোটে চল্লিশ টাকা। সবাই জানেন টাকা নিয়ে আসতে পারা যায় না। আমি তখন দুই চোখে সর্ষে ফুল দেখছি আর ঘামছি। চল্লিশ টাকার ভিতরে খুনে রিক্সাওয়ালার দৌলতে আট টাকা আগেই চলে গিয়েছে। ফ্রান্সের ভিসায় মোটে ছ'টাকা লেগেছিল। ইটালীর বেলাতেও আমি সেই ধারণায় ছিলুম।

গুতমত করতে দেখে দু'জনে হাসতে হাসতে বললেন, 'নো মানি? শর্তেজ অফ মানি?'

বললুম, 'হুঁ। জানেন তো টাকা আনতে পারা যায় না। আর আমার সঙ্গে যে ট্রাভেলার্স চেক দেওয়া হয়েছে তা এখানে ভাঙানো চলবে না।'

দু'জনে নিজেদের ভাষায় কী পরামর্শ করে বললেন, 'অল রাইত—তোয়েনতি এইত—তোয়েনতি এইত।'

ভিসা নিয়ে দরাদরি চলে জানতুম না তো!

রাশি রাশি সর্ষে ফুল দেখতে দেখতে ঘামতে ঘামতে আটাশ টাকা বার করে দিলুম।

একজন একটা ফর্ম এগিয়ে দিয়ে বললেন, 'ফিল্ ইত্—ফিল্ ইত্।'

ভিসা নিয়ে ফিরে এসে তাড়াতাড়ি করে খেয়েদেয়ে দীর্ঘ রেলযাত্রার ধকলটা সামলে ওঠবার জন্যে একটু ঘুমোবার চেষ্টা করছিলুম। হঠাৎ খট্ করে দরজা খোলার শব্দে চমকে উঠলুম। চোখ মেলে দেখি ডাক্তার। মুচকি মুচকি হাসছেন। হাতে একটা খবরের কাগজ।

আমি চোখ মেলতেই একটু রহস্যচ্ছলে বললেন, 'জাহাজ ধরার আগে কেউ যদি না খবরের কাগজের দিকে কড়া নজর রাখে তবে সে যেন জাহাজ ধরার আশা না করে!'

বুঝতে না পেরে ধড়মড়িয়ে উঠে বসে বললুম, 'কী ব্যাপার ?'

ডাক্তার একটু হেসে বললেন, 'আপনি বলছিলেন আপনার জাহাজ 'এশিয়া' দশ তারিখ অর্থাৎ কাল সন্ধ্যেয় ছাড়বে। কিন্তু এই দেখুন'—বলে কাগজটা আমার হাতে ধরিয়ে দিলেন।

কাগজের উপর চোখ বুলিয়ে চক্ষু চড়কগাছ। মাথার উপরে এক কোণে দুষ্টু ছেলের মত উঁকি দিচ্ছে একটা খবর,—আসছে, আসছে, হংকং থেকে 'এশিয়া' আজ বিকেলেই এসে পড়ছে। নতুন যাত্রীদের আজ বিকেলেই জাহাজে উঠতে হবে। এশিয়া কাল সকালেই করাচী বন্দর ছেড়ে চলে যাবে।

একেই বলে বিনা মেঘে বজ্রপাত। ঘড়ীতে তখন তিনটে। কিছুই গোছানো হয়নি।

ডাক্তার বললেন, 'আপনার সঙ্গে জাহাজঘাট পর্যন্ত যেতে পারছি না বলে বড় লজ্জিত। আমার আজ এই তিনটে থেকে এমারজেন্সিতে ডিউটি আছে।'

তাড়াতাড়ি করে তল্পিতল্পা বেঁধে হন্তদন্ত হয়ে একটা স্কুটার ধরে ছুটলুম জাহাজ ঘাটে। জীবনে কখনো জাহাজে চড়িনি—কোথায় কী ভাবে কী করতে হয় না হয় কিছুই জানি না।

ঘাটে ঢুকতেই গেটের বাঁ পাশে চোখে পড়ল কাচের একটা ঘরের মধ্যে সাদা সুট পরা একজন লোক বসে বসে ঝিমোচ্ছে। ঠিক যেন দাঁড়ে বসা পাপিয়া পাখিটি! অমনি কালো। অমনি ঘোর রক্ত-চোখ। মুখে অমনি একটা যন্ত্রণা-কাতর ভাব। মগজে যেন পোকা কামড়াচ্ছে।

স্কুটার থেকে নেমে তাকে শুধোলুম, 'এশিয়া জাহাজ কী এসে গেছে ?'

লোকটা লাল চোখ মেলে খানিক চেয়ে থেকে বলল, 'এশিয়া তো আজ আসবে না।'

কাগজটা সঙ্গেই ছিল। বললুম, 'সে কী! এই তো ওরা কাগজে দিয়েছে আজ সন্ধ্যে ছ'টার সময় এসে পড়বে। এখন তো ছ'টা বেজে দশ হয়ে গিয়েছে।'

লোকটা হেসে বলল, 'জাহাজ সম্পর্কে তুমি তাহলে বোধ হয় কিছুই জানো না। জাহাজ ঘাটে এসে না পৌঁছনো পর্যন্ত কেউ বলতে পারে না আসবে কী না!'

ফের সেই স্কুটারেই ছুটলুম ম্যাকলিয়ড স্ট্রীটে আমার ট্রাভেল এজেন্টের অফিসে।

অফিস তখন বন্ধ হয়ে গিয়েছে। একজন মাত্র কেরাণী তখনো কাজ করছেন।

তাঁকে শুধোলুম, 'দেখুন, 'এশিয়া' কী আজ আসবে না? জাহাজ-ঘাট থেকে আমাকে ফিরিয়ে দিল।'

কেরাণীটি বললেন, 'আমি তো ও ব্যাপারে ঠিক মত কিছুই বলতে পারব না। অফিস বন্ধ হয়ে গিয়েছে। তবে আমি যতদূর শুনেছি 'এশিয়া' এসে গেছে।'

আচ্ছা মুশকিলে পড়লুম। এরা বলে এসে গেছে। ওরা বলে আসেনি! ফের ছুটলুম জাহাজ ঘাটে।

সেই লোকটাকে বললুম, 'তুমি বললে 'এশিয়া' আজ আসবে না অথচ আমি শুনলুম 'এশিয়া' তো এসে গেছে? তুমি আমাকে অনর্থক ছুটে ছুটি করিয়ে হয়রান করলে কেন?'

লোকটা লাল চোখ দুটো তুলে বলল, 'কে বলল তোমায় এসে গেছে বলে?'

বললুম, 'আমার ট্রাভেল এজেন্ট।'

'তোমার ট্রাভেল এজেন্টই তাহলে জাহাজ ঘাটের লোকের চেয়ে বেশী জানে।' বলেই একগাদা কাগজপত্র টেনে নিল।

আমার মাথায় তখন খুন চড়ে গিয়েছে। শুরু হ'ল তর্কাতর্কি।

মনে পড়ল কাল রাত্তিরে ডাক্তার বলেছিলেন, 'করাচী যেমন গা ঝিনঝিনে নোংরা শহর—এখানে এক খাবলা মরুভূমি, ওখানে এক খাবলা মরুভূমি, চারিদিকে গাধা ডাকছে, উট চরছে, সরু সরু রাস্তা—তেমনি এখানকার লোকগুলোও হাড়-বজ্জাত—প্যাঁচালো।' দেখলুম ডাক্তারের অভিজ্ঞতা খুব বেশী ভুল নয়।

কপাল ভালো, তাই ঠিক সেই সময় জাহাজ ঘাটের একজন বাঙালী অফিসার গেট থেকে বেরিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি আমাদের তর্কাতর্কি শুনে দাঁড়ালেন। আমাকে শুধোলেন, 'কী হয়েছে?'.

বললুম, 'দেখুন, আমি 'এশিয়া' জাহাজের যাত্রী। আমি তখন জাহাজ ঘাটে এসে এঁকে শুধোলুম 'এশিয়া' এসেছে কী না। উনি আমাকে অনর্থক বললেন, এশিয়া তো আজ আসবে না। আমি বললুম, সে কী কথা, ওরা কাগজে দিয়ে দিয়েছে আজ ছ'টার সময় এসে পড়বে। তার উত্তরে উনি আমাকে বললেন, জাহাজ সম্পর্কে তুমি তাহলে বোধ হয় কিছুই জানো না। জাহাজ ঘাটে এসে না পৌঁছনো পর্যন্ত কেউ বলতে পারে না আসবে কী না। এই করে সেই থেকে উনি অনর্থক আমাকে একবার জাহাজ ঘাট একবার আমার ট্রাভেল এজেন্টের অফিসে ছুটোছুটি করিয়ে হয়রান করছেন।'

অফিসারটি বললেন, 'এশিয়া'র ছ'টায় আসার কথা ছিল, অথচ এশিয়া পাঁচটার সময় এসে গিয়েছে।' ততক্ষণে তাঁর চোখ-মুখ থেকে আগুন বেরোতে শুরু করেছে। সেই কালো লোকটার দিকে চেয়ে ধমক দিয়ে বললেন, 'তুমি জানো না সে কথা?'

দেখি তার কালো মুখ আর এক পোঁচ কালি মেখে নিয়েছে। কিন্তু তখনো গোঁয়ার্তুমি যায়নি। মুখ নীচু করে গোঁ গোঁ করে বলল, 'না স্যার, আমি ও সব কিছু বলিনি।'

অফিসার গর্জে উঠলেন, 'উনি কী তবে মিথ্যে বলছেন?' স্কুটার ড্রাইভার বিহারী। 'কেরাচীওয়ালা'দের উপর তারো যে বড্ড রাগ

সেটা সে আগেই আমাকে গাড়ী চালাতে চালাতে এ কথায় সে কথায় জানিয়ে দিয়েছিল। সঙ্গে সঙ্গে সেও তাই আমার হয়ে সাক্ষী দিল।

অফিসার গর্জন করে বললেন, 'প্যাসেঞ্জারদের সঙ্গে তুমি এই রকম ব্যবহার কর?' তার পর আমার দিকে চেয়ে বললেন, 'আচ্ছা, আপনি ভিতরে চলে যান, আপনার এমবার্ক করার সময় চলে যাচ্ছে। এশিয়ার যাত্রীদের আটটার মধ্যেই এমবার্ক করতে হবে। পাসপোর্ট দেখাতে, কাস্টম্স হতে, হেল্থ্ সার্টিফিকেট চেক করতে অনেক সময় লাগবে—আমি ওকে মজা দেখাচ্ছি।'

তারপর কী হয়েছিল জানি না।

হাঁপাতে হাঁপাতে ভিতরে গিয়ে দেখি, 'এশিয়া' হাজির। প্রকাণ্ড কলেবর—'এশিয়া' তো এশিয়াই!

যাক, কাগজপত্র দেখিয়ে, কাস্টমসের ফাঁদ থেকে পিছলে গিয়ে শেষ পর্যন্ত 'এশিয়া'য় এশিয়াবাসী তো হওয়া গেল! হাঁফ ছেড়ে বাঁচলুম। যেন ঘাম দিয়ে জ্বর ছেড়ে গেল।

ভাগ্যি ডাক্তার কাগজের দিকে কড়া নজর রেখেছিলেন। নইলে তো 'এশিয়া' আমাকে অষ্টরম্ভা দেখিয়েই প'লাত! কারণ, এ কম্লী যে, সে কম্লী নয়—আমি ছাড়লেও আমাকে ছাড়বে না। বরং আমি ধরতে গেলেও এ পালায়!

সে রাত্রে সমুদ্র রাত্রির কালো ঘোমটায় মুখ লুকিয়ে রাখল। তাই প্রথম চোখের মিলনেই প্রেম হল না।

কিন্তু রাত্রে আলোটি নিভিয়ে দিয়ে বিছানায় শুয়ে শুয়ে তার যে রকম তর্জন গর্জন কানে এলো তাতে প্রেম সম্বন্ধে খুব বেশী ভরসাও হলো না।

মেরেছ কলসীর কানা তাই বলে কী প্রেম দিব না—এ ধরণের উদার প্রেমিক সে যে নয় তাতে তো কোনো সন্দেহই রইল না,—

বরং কলসীর কানা না মারলেও প্রেম দেয় কী না সে বিষয়েও নিঃসন্দেহ হতে পারলুম না।

হেমিংওয়ের বুড়ো জেলে অবিরাম সমুদ্র আর শার্ক মাছের সাথে লড়াই করে শেষে ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখেছিল সিংহের। আমি লড়াই না করে এবং সমুদ্রের চেহারা না দেখে শুধু হুঙ্কার শুনেই পিলে উল্টে ফেলে শিবনেত্র হয়ে জেগে জেগেই সারা রাত ধরে স্বপ্ন দেখলুম বাঘ সিংহ দুই-ই।

॥ চার ॥

আমার কেবিন দুই যাত্রীর কেবিন। সঙ্গী একজন ইটালিয়ান। নাম লিওনার্দো। যাবে মিলানো।

সারা রাত বাঘ সিংহের স্বপ্ন দেখে সকালের দিকে ঘুম ধরে গিয়েছিল। হঠাৎ তন্দ্রার ঘোরে কানে এলো কে যেন ডাকছে 'মিস্তার ইভানে—মিস্তার ইভানে—'

চোখ মেলে দেখি লিওনার্দো। মুচকি মুচকি হাসছে আর তার ইটালিয়ান জিভের সঙ্গে নানান রকম কসরত করে কোনো রকমে আমার নাম ধরে ডাকছে 'মিস্তার ইভানে—মিস্তার ইভানে—'বাকীটা ভুল সুরেও কিছুতেই মুখ থেকে বেরোচ্ছে না।

ধড়মড় করে বিছানার উপর উঠে বসে বললুম, 'কী?'

তার ঘড়ীশুদ্ধ হাতটা আমার সামনে মেলে ধরল। সাতটা বাজছে। ভাঙা ভাঙা ইংরেজীতে বলল, 'গেত্ রেদি—কুইক, নো তাইম মাচ।'

তাই তো!

মনে পড়ল কাল রাত্তিরে ডাইনিং হলে, দরজায় দাঁড়ানো কটা-চোখো ইটালিয়ান ওয়েটার বারবার বলে দিয়েছে ব্রেকফাস্টের সময় সাড়ে সাতটা থেকে সাড়ে আটটা। এক মিনিট দেরী হলেই আর রক্ষে নেই। সে সামনে একটুখানি ঝুঁকে সবিনয়ে বলবে, 'ভেরির সরির স্যার, ইউ কামিং লেত্, নো ব্রেকফাস্ত্ তু দে; রিমাইন্দ লাঞ্চ এ্যাত্ তুয়েলভ, নো লেত্।'

তাড়াতাড়ি করে মুখ হাত ধুয়ে, দাড়ী কামিয়ে, সুটবুট পরে চকচকে হয়ে নিয়ে ছুটলুম ডাইনিং হলে।

চারিদিকে গোল গোল টেবিলে টেবিলে সাজানো আছে বিস্কুট, টোস্ট, ডিম, মাখন, ছোট ছোট ঝিনুক শামুকের ধাঁচে কাটা ইটালিয়ান

পনির, ফল আর চায়ের সরঞ্জাম। আরো কিছু খেতে ইচ্ছে হলে ওয়েটারদের ব'ললেই এনে দেবে।

একটু একটু করে রুটিতে কামড় দিচ্ছি আর একটা একটা করে পনিরের ঝিনুক মুখে ফেলছি এমন সময় শুনি জাহাজের মাইকে করে ঘোষণা করছে—আতুচ্চে. আতুচ্চে প্লিজ অর্থাৎ এ্যাটেনশন, এ্যাটেনশন প্লিজ।

আতুচ্চে হয়ে শুনলুম, জাহাজ এইবার করাচী বন্দর ছেড়ে যাচ্ছে।

তাড়াতাড়ি খাওয়া শেষ করে বিস্তর অলিগলির গোলক-ধাঁধা পার হয়ে, নাচঘরের মেঝের মত পিছল মেঝে আর সিঁড়িতে পা পিছলে শেষে হাজির হলুম ডেকে।

দিনের আলোয় সমুদ্রের সঙ্গে চা'র চোখে মিলন হল বটে, কিন্তু যে রণরঙ্গিণী, উন্মাদিনী মূর্তি দেখলুম তাতে প্রেমের কথা মাথায় উঠল। কোনদিকে পালাব তার দিশে পাই না।

দিগদীগন্ত জুড়ে সহস্র ক্রুদ্ধ চক্ষে জ্বলছে সংহারের রুদ্র অগ্নিশিখা। লক্ষ লক্ষ লোল-জিহবা দিয়ে ঝরছে লেহনের জ্বালাময়ী ফেনা। যত দূর দৃষ্টি যায় শুধু নীল মৃত্যু মহাক্রোশে শ্বেত হয়ে উঠছে।

যেন সহস্র সহস্র দৈত্য পৈশাচিক আনন্দে খলখল করে অট্টহাসি হাসতে হাসতে আমাদের জাহাজটাকে একবার আকাশের দিকে ছুঁড়ে দিয়ে একবার পাতালের দিকে আছড়ে ফেলে লোফালুফি খেলছে। আমাদের প্রাণ যে তাতে খাবি খাচ্ছে সে দিকে তাদের ভ্রুক্ষেপমাত্র নেই।

চারিদিকে ঢেউগুলোর তোলপাড় দেখে মনে হয় জাহাজের চারিদিকে যেন বড় বড় পাহাড় ভেঙে পড়ছে।

শুনতে পেলুম কে একজন তার বন্ধুকে বলছে, 'এ কী দেখছ! চাপতে বোম্বাই থেকে তো বুঝতে। এর এই লোফালুফি খেলার চোটে পটল তুলতে হত। এখন তো এ কাল থেকে লোফালুফি খেলতে খেলতে এলিয়ে পড়েছ, তাই ঘুমে ঢুলছ।'

এই · যদি এলিয়ে পড়া চেহারা হয়, না জানি তাহলে না এলিয়ে পড়া মূর্তিটি কী জিনিষ! ভাগ্যি বোম্বাই থেকে বুকিংটা শেষ মুহূর্তে ক্যান্সেল হয়ে গিয়েছিল! শেষে কী বেঘোরে প্রাণটা হারাতুম!

নাম আরব সাগর, স্বভাবেও দেখি আরব-বেদুঈন!

ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গিয়ে চেয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ চোখে পড়ল, না, শুধু তো নীল মুক্তা মহাক্রোশে শ্বেতই হয়ে উঠছে না। সূর্যের আলো পড়ে এর সমস্ত নীল অঙ্গ ছেয়ে ময়ূরকণ্ঠি রঙের খেলা চলেছে।

কোথাও একেবারে রক্তের ধারা বয়ে চলেছে, কোথাও রাত্রির চেয়েও কালো, কোথাও আকাশের চেয়েও নীল, কোথাও লজ্জার চেয়েও গোলাপি, কোথাও পান্নার চেয়েও সবুজ। কখনো বেগনী হয়ে উঠছে, কখনো সোনালী হয়ে উঠছে, কখনো রূপালী। আরো কত হাজার রঙের রামধনু ওর অসীম অঙ্গ জুড়ে জ্বলছে নিভছে সে সব মেশামেশি রঙের বর্ণনা দেওয়া অসম্ভব।

ওই বিরাট বহুরূপীর দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে নেশা ধরে গিয়েছিল। দেখি উত্তাল রঙবেরঙের ঢেউয়ের মাথায় দুলছে প্রকাণ্ড এক রঙীন ঝিনুক, তাতে ক্রমশঃ সিক্ত সোনালী কেশে মাথা তুলে ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়াচ্ছেন ভুবনমোহিনী নগ্ন-সুন্দরী জ্যোতির্ম্ময়ী ভেনাস—এইমাত্র তাঁর জন্ম হল।

তারপর দেখি আকাশের দিকে মাথা তুলে নীল সমুদ্র আলো করে দাঁড়িয়ে আছেন মূর্তিমতী ঊষার মত অতুল রূপসী উর্বশী—সহস্র ঢেউ মন্ত্রমুগ্ধ নাগিনীর মত তাঁর রক্তিম চরণতলে ফণা লুটিয়ে পড়ে আছে। ক্রুদ্ধ গর্জন আর কানে আসছে না, তার বদলে শুনি লক্ষ লক্ষ শঙ্খধ্বনি।

হঠাৎ কাঁধের উপরে কার একটা হাত পড়ল। চমকে পিছনে চেয়ে দেখতে পেলুম যেমন লম্বা তেমনি চওড়া এক লোক। যেন ব্রবডিংনাগের রাজা। আমাকে ইচ্ছে করলে পুতুল করে খেলতেও

পারেন। তামাটে রং। পশমী চুল। নীল চোখ। মুখে হাসি। গায়ে নীল স্যুট। দশ আঙুলের বুড়ো আঙুল দুটি বাদে আট আঙুলে আট রঙের পাথরের আংটি। হাতে কালো চকচকে পালিশ করা এক বাঁশী, তাতে সোনালী মীনায় পিরামিডের গায়ের ছবির সব নক্সা।

থতমত করে বললুম, 'আপনাকে তো——

বিকট অট্টহাসি হেসে উঠে বললেন, 'চেনেনই না তো। কে বলেছে চেনেন? কিন্তু না চিনলে কী চেনাশোনা পাতা'তে নেই?' আবার সেই হাসি।

তারপর বললেন, 'কাল রাত্তিরে আপনাকে ডাইনিং হলে দেখেছিলুম। তার পর থেকেই আপনার উপর চোখ রেখেছি—যে করে হোক পাকড়াও করতেই হবে। আজ সকালেই ধরা পড়ে গেছেন! কাল প্রথম দর্শনেই আপনার চেহারাটা আমাকে ভারি মাত করেছে। আর চেহারা দেখেই যার কাছে আমার মনটা চুরি হয়ে যায় তার সঙ্গে আমি জোর করে আলাপ করি! শুনুন—আমার নাম শফিক শাবান। পিরামিডের দেশের লোক। খাই দাই, আপন মনে বাঁশি বাজাই আর দেশবিদেশে ঘুরে বেড়াই। এই হল আমার কাজ। তাই জাহাজই একরকম বলতে গেলে আমার দেশ, ঘরবাড়ী, বৌ, প্রিয়া, বান্ধবী সব কিছু।'

তার পর আকাশের দিকে মুখ তুলে আবার খানিকক্ষণ ধরে হেসে বললেন, 'আমার সব খবর তো দিয়ে দিলুম—এখন আপনার খবর দিন।'

দিলুম।

বললেন, 'বলি গানটান জানেন তো?'

'না।'

সমুদ্রের উপর দিয়ে দূর এডেন পর্যন্ত অট্টহাসির শব্দ ছড়িয়ে দিয়ে বললেন, 'বাপ! যা হোক মিথ্যে বলতে পারেন দেখছি!'

'মিথ্যে আবার বললুম কোথায়?'

'ওই যে বললেন গান জানি না? চালাকী! আপনার চোখ দুটো বলছে গান জানেন আর ঢাকবার চেষ্টা! আমার চোখে ধুলো দিতে পারবেন না ভায়া, আমার চোখে ধুলো দিতে পারবেন না। সুতরাং ও চেষ্টাটি করবেন না। আমি শফিক শাবান সারা জীবন ভুল করে চলেছি, কিন্তু লোক চিনতে কখনো ভুল করিনি। তা সে যাক গে। কোন মুল্লুকে থানা গাড়তে হঠাৎ এশিয়ায় এশিয়াবাসী হয়েছেন সে খবর দিলেন না তো?'

'লণ্ডন। আপনি?'

হাসির ঝড় বইয়ে দিয়ে বললেন, 'Whither goest thou I also go. বাইবেলে রুথের গল্প পড়েছেন তো? এই প্রথম চলেছেন?'

বললুম 'হুঁ।'

'দেশবিদেশে ঘুরে বেড়াচ্ছি ও লণ্ডনে আমিও এই প্রথম চলেছি।' তারপর একটু থেমে বললেন, 'পড়াশোনা করতে চলেছেন বোধ হয়?'

'বাপ! পড়াশোনা! ওটি তো ভালো ছেলেদের একচেটে ব্যাপার! জানেন না বুঝি, ইস্কুল পালানোয় আমার চেয়ে ওস্তাদ ছেলে কেউ কোনোদিন জন্মায়নি? তাই সবায়ের কাছ থেকে সার্টিফিকেট পেয়েছি বয়ে যাওয়া খারাপ ছেলে! আমি যাচ্ছি দেশ দেখতে!'

অথচ এই আমাকেই খুব ছোটবেলায় মেথুসেলার মতো বুড়ো এক ব্রাহ্মণ জ্যোতিষী আমার হাত দেখে বলেছিল, 'তুমি পাশ করিতে করিতে করিতে করিতে গবর্ণমেণ্টের উচ্চপদ লাভ করিবে!'

শফিক শাবান আমার মুখের দিকে চেয়ে কী যেন দেখতে দেখতে গম্ভীর হয়ে বললেন, 'বয়ে না গেলে মানুষ হবেন কী করে—বড় হবেন কী করে? সত্যিকার বয়ে যাওয়া ভারি কঠিন কাজ। বয়ে না গেলে

দেখবেন কী করে, শিখবেন কী করে? ভালো ছেলে হয়ে কোমর বেঁধে পরীক্ষা পাশ করে? মোটেই না! ওতে দারোয়ান হওয়া যায়। তাই জগতের যত মহাপুরুষ সব খারাপ ছেলে হয়ে—একদম বয়ে গিয়েই মহামানুষ হয়ে গিয়েছেন। আর ভালো ছেলেরা বুক ফুলিয়ে পরীক্ষা পাশ করে চিরকাল কেরাণী হয়ে মরেছে। আমার হাতে ক্ষমতা থাকলে সব প্রথম আমি কী করতুম জানেন? স্কুল, কলেজ, ইউনিভার্সিটি নামে ওই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছদ্মবেশে অশিক্ষার প্রতিষ্ঠানগুলোকে, মানুষকে গোরু বানাবার ওই গোয়ালঘরগুলোকে ডিনামাইট দিয়ে উড়িয়ে দিতুম। বক্তৃতা ঝাড়লুম? মোটেই না! উপদেশ দিলুম? তাও মনে করবেন না। শুনুন'—সঙ্গে সঙ্গে বাঁশিতে সুর ধরলেন! চোখেমুখে কৌতুকের হাসি নাচছে।

বাঁশি কখনো এমন করে বাজাতে আমি শুনিনি। কী গানের সুর আমার পক্ষে বোঝা দুঃসাধ্য,—কিন্তু মনে হল সমুদ্রের উন্মাদ ঢেউগুলো পর্যন্ত যেন সেই করুণ সুরে সুরে খানিকক্ষণের জন্যে ঘুমিয়ে পড়েছে। বুঝতে পারলুম বাঁশি শুধু তাঁর হাতেই নেই, তাঁর হৃদয়টাই একটা সোনার বাঁশি।

শেষ হলে লোভীর মতো বললুম, 'আর একটা।'

আবার শুরু করলেন। কিন্তু বেশীক্ষণ চালাতে পারলেন না। হঠাৎ থেমে গিয়ে কিছুক্ষণ গম্ভীর হয়ে দাঁড়িয়ে থেকে কিচ্ছু না বলে মাতালের মতো টলতে টলতে চলে গেলেন ডেকের আর একদিকে—যেখানে চাঁদোয়া খাটিয়ে নীল, লাল, বেগ্নী, সবুজ সব হেলানো চেয়ার সারি সারি পাতা আছে। তারই একটা চেয়ারে চোখ বন্ধ করে টান হয়ে শুয়ে পড়লেন।

বুঝতে পারলুম সী সিক্নেসের ভূতে ধরেছে।

দেশবিদেশের নানান রঙের চিড়িয়া—বেশীর ভাগই ইয়োরোপীয়ান—সমস্ত ডেক জুড়ে ততক্ষণে মেলা বসিয়ে দিয়েছে। গোল মুখ, লম্বা মুখ,

ভোঁতা মুখ; কালো চামড়া, সাদা চামড়া, গোলাপি চামড়া, হলদে চামড়া; নীল চোখ, কালো চোখ, বেড়াল চোখ, হরিণ চোখ; পশমি চুল, রেশমি চুল, সোনালী চুল, লাল চুল, রূপালী চুল; টিকি, দাড়ি, টুপি, পাগড়ি, ঘোমটা—সব নমুনা হাজির।

কেউ কেউ তাস, পাশা, দাবা আর রিং খেলছে। কেউ ডেক কোয়িট্স, শাফ্ল বোর্ড, স্কোয়াশ র‍্যাকেট্স এবং ডেকের আরো নানান রকম খেলা খেলছে। কেউ কেউ সুইমিং পুলে ঝাঁপাঝাঁপি করছে। কেউ ও পাশের বারে বসে রঙীন বোতল গেলাস নিয়ে রঙীন স্বপ্ন দেখছে। সমুদ্রের এই একঘেঁয়ে নির্বাসিত জীবনে এদিকে সেদিকে কোথাও কোথাও জোড়ায় জোড়ায় বেঁচে থাকার চরম আনন্দে মেতে উঠেছে। কেউ কেউ হন্যে হয়ে এত বেশী মেতে উঠেছে যে, হঠাৎ মনে হয় ঈভ্ আর এ্যাডাম মিথ্যে, ডারউইন সাহেবই ঠিক!

বিশেষ করে কতকগুলো মার্কিন মেয়ে-পুরুষ মিলে এই হাজার জোড়া চোখের সামনেই যা করছে তাতে চতুষ্পদেরাও লজ্জায় মুখ লুকোবে।

কোনো কোনো বুড়োবুড়ীও পুরনো বোতলে নতুন মদ ঢেলেছে। সইলে হয়!

॥ পাঁচ ॥

কাল থেকেই শরীরটা ভালো নেই। আমার ঘাড়েও বোধ হয় সী সিকনেসের ভূত চেপেছে। তাই সকালবেলায় কোনো রকমে ডাইনিং হলে গিয়ে চা'টি খেয়ে কেবিনে ফিরে এসেই কম্বলের তলায় ঢুকেছিলুম।

দীনা ড্রেসিং টেবিলের আয়নাটা মুছতে মুছতে বলল, 'জাহাজ যেন আর এগোচ্ছেই না—না? এ্যাদ্দিনে আজ মোটে এ্যাডেন পৌঁছবে। জেনোয়া পৌঁছতে এখনো এগারো বারো দিন বাকী।'

দীনা আমাদের ষ্টুয়ার্ডেস।

সে যে 'ইতালিয়ানা' এই গর্বের তার আর অন্ত নেই। প্রথম দিনই আমি তাকে শুধিয়েছিলুম কোন্ দেশের মেয়ে। সে বিছানা গুছোতে গুছোতে সগর্বে ঘাড় বাঁকিয়ে বলেছিল, 'ইতালিয়ানা।' কথায় ভারি সুন্দর একটা সুর আছে। সেটা আমি আমাদের দেশ ছাড়া আর সব দেশের মেয়েদের মুখেই শুনেছি—ভারি চমৎকার একটা সুর দিয়ে কথা বলে।

বয়েস বোধ হয় উনিশ কুড়ির বেশী নয়। মাথায় এক গাদা কোঁকড়ানো সোনালী চুল। ছোট্ট মুখখানি একেবারে নিটোল রসালো একখানি আঙুরের মত। আর সেই জীবন-চঞ্চল ছোট্ট মুখখানি ছেয়ে ছেলেমানুষী একেবারে উপচে পড়ছে। কালো কালো সরল চোখ দুটি অবিকল বাঙালী মেয়েদের মত। আর সে দুটি কালো চোখ খরগোসের চোখের মতই যেমন ভীতু তেমনি দুষ্টুমিতে ভরা। কালো মেয়ের কালো হরিণ-চোখ অনেক দেখেছি, কিন্তু সাদা মেয়ের কালো হরিণ-চোখ এই প্রথম দেখলুম। দুটি রাঙা ঠোঁটে গোলাপের পাপড়িতে শিশিরের মত মধুর একটুখানি হাসি সব সময় লেগেই আছে।

সকালে দেখি তার ফ্রক থেকে পায়ের জুতো পর্যন্ত সব সাদা। আবার রাত্রে দেখি সব কালো। এই বোধ হয় জাহাজের নিয়ম। অর্থাৎ তার ওই ছোট্ট, চঞ্চল দেহটি ঘিরেও যেন দিন আর রাত্রির খেলা চলেছে। তাই সকালের সাথে সাথে সেও সাদা হয়ে যায়, আবার রাত্রির সাথে সাথে হয়ে যায় কালো। এই কালোর আবরণে তার গোলাপি মুখখানি আরো সুন্দর, আরো রহস্যময় হয়ে ওঠে।

বললুম, 'জেনোয়া পৌঁছবার জন্যে এত তাড়া কেন?'

অবাক হয়ে আমার মুখের দিকে চেয়ে বলল, 'বা রে! জেনোয়া আমার দেশ। জেনোয়ায় আমার মা থাকেন। কদ্দিন পরে মা'র সঙ্গে দেখা হবে বলে! জেনোয়ায় পৌঁছে সাত দিনের জন্যে আমরা ছুটি পাব।'

এ জাহাজ জেনোয়া পর্যন্তই যাবে। তার পর জেনোয়া থেকে আমাদের লণ্ডন যেতে হবে রেলে।

বলল, 'হংকং-এ মায়ের চিঠি পেয়েছিলুম, তার পর আর কোনো চিঠি পাইনি। শেষ চিঠিতে মা লিখেছিলেন শরীর ভালো নেই। কেমন আছেন কে জানে! এর আগে আপনি আর কখনো জেনোয়ায় গেছেন?'

'না।'

'আহা! অমন জায়গা আর হয় না। জাহাজে কাজ করি তাই অনেক দেশ আমি দেখেছি, কিন্তু জেনোয়ার মত,—ইটালীর মত অমন দেশ আর একটিও দেখলুম না। আগে নিজের দেশকে ভালো লাগত না, কিন্তু বাইরে বেরিয়ে দেখলুম ইটালীর চেয়ে সুন্দর কোনো দেশই নেই। নিজের দেশকে চিনতে হয় বিদেশে গিয়ে।—বিদেশে না গেলে নিজের দেশকে ভালোবাসতেই শেখা যায় না।'

দেখলুম বয়েস অল্প, সব ব্যাপারেই ছেলেমানুষী উছলে পড়ে, কিন্তু বড় বড় কথাও বলতে পারে। বিদেশে না গেলে আপন দেশকে ভালোবাসতেই শেখা যায় না—এ কথাটা তার মুখে শুনতে ভারি ভালো লাগল।

পর্দাগুলো ঠিক করতে করতে সোনালী চুল ত্বলিয়ে বলল, 'সমুদ্রের জীবন আমার খুব বেশী দিনের নয়, কিন্তু এরি মধ্যে আর ভালো লাগে না। তবু উপায় নেই, কাজ করতেই হবে। তাই সমুদ্রে সমুদ্রে যতদিন ঘুরি জাহাজ কতদিনে জেনোয়া পৌঁছবে সেই আশায় তৃষার্ত পাখির মত দূরের দিকে চেয়ে থাকি। দিন যেন আর কাটতেই চায় না, সময় যেন আমার উপর আড়ি করে এক পা এক পা করে এগোয়। জেনোয়ার আপেল যে খায়নি সে আবার আপেল খেয়েছে না কী! জেনোয়ার আঙুর যে খায়নি তার জীবনই বৃথা। জেনোয়ার গোলাপ, করবী, রডোডেনড্রন যে দেখেনি সে ফুলই দেখেনি। জেনোয়ার মানুষের মত অমন মানুষ আপনি কোথায় পাবেন!'

হাসি পেলো। কিন্তু চুপ করে রইলুম।

সে বলেই চলল, 'জেনোয়ার বসন্ত! আহা! কদ্দিন দেখিনি! অমন রঙীন বসন্ত আর কোথাও আমার চোখে পড়ল না। জেনোয়ার শরতের মত অমন সোনালী শরৎ তুনিয়ার আর কোন্ দেশে আসে! জেনোয়ার শীত! আঃ! সে কী মধুর, কী আরামের! সে সব ছেড়ে এই সমুদ্রে যখন ঘুরছি মনে হয়, মাথা কুটে মরতে ইচ্ছে করে। আপনি থাকবেন না কিছুদিন জেনোয়ায়?'

'না, যেদিন পৌঁছব সেই দিনই রেল ধরব।'

'ও মা! সে কী! থাকবেন না!' বলে এমন অবাক হয়ে আমার দিকে তাকিয়ে রইল যে, মনে হল এমন আশ্চর্য কথা সে আর জীবনে শোনেনি!

তার পর বলল, 'জেনোয়া দেখবেন না তো দেখবেন কী? ইটালিয়ান জাহাজে তাহলে না এলেই পারতেন।'

তার পর পাছে আমি কী মনে করি—কারণ সে ষ্টুয়ার্ডেস আর আমি যাত্রী—তাই বোধ হয় তাড়াতাড়ি নিজেকে সামলে নিয়ে হঠাৎ ছেলেমানুষের মত হেসে উঠে বলল, 'ও, হ্যাঁ, কী বলছিলুম যেন?

তার পরে শুনুন। মা আমাকে কিছুতেই জাহাজে চাকরী নিতে দেবেন না, আমিও নাছোড়বান্দা। শেষে মাকে লুকিয়ে ফাঁকি দিয়ে জাহাজে চাকরি নিয়ে পালিয়ে এসেছি। কিন্তু এখন দুঃখ হয়; তখন বুঝতুম না। ভাবতুম সমুদ্রে সমুদ্রে ঘুরে বেড়াতে বেশ ভালো লাগবে। তখন বুঝতে পারতুম না মাকে ছেড়ে থাকতে এত কষ্ট হবে। মা আমার বুড়ো হয়ে গেছেন—কেউ দেখবার নেই মাকে।' একটা ভারি নিঃশ্বাস ফেলল।

এমন সময় বাঁশি বাজাতে বাজাতে এসে পড়লেন শফিব শাবান। আমাকে শুয়ে থাকতে দেখে বললেন 'কী, একেবারে ধরাশায়ী? সী সিক্‌নেস না কী?'

বললুম, 'ঠিক বুঝছি না। বিছানায় শুয়ে থাকলে বেশ ভালো থাকছি, কিন্তু উঠলেই খাবাপ লাগছে।'

'পষ্ট সী সিকনেস। সমুদ্রের ঘাড়ে সোয়ার হয়েছেন কী ও ভূতও আপনার ঘাড়ে সিন্দবাদের ভূতের মত সোয়াব হবেই হবে—কিছুতেই রেহাই নেই।'

দীনা বলল, 'শুধু আর আজকের দিনটা। কাল থেকে সব ঠিক হয়ে যাবে। কাল আমবা বেড সী'তে পড়ব। রেড সী বেশ শান্ত। আরব সাগরেব মত এমন বুনো নয়। তবে রেড সী আরব সাগরের চেয়ে বেশী ভয়ের। কাবণ প্রায়ই দেখা যায় রেড সী'র মাঝে মাঝে বড় বড় পাহাড় খাড়া মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে—অবশ্য লাইট হাউস আছে।'

তার পর চোখ ঘুরিয়ে খুব তম্বি করে বলল, 'সী সিক্‌নেস ধরেছে যখন, রিমাইন্দ্‌, নো ওযাতাব, নো তি নো কফি, নো লিকুইদ—ওন্‌লি দ্রাই ফুদ্‌স্‌ এন্দ ফ্রুত্‌'—তাব পরেই অদৃশ্য।

শাবান বললেন, 'ইটালিয়ান মেয়েগুলো ভারি সুন্দরী হয়। ইটালীতে বহুবার আমি গেছি, দেশবিদেশে বহু ইটালিয়ান মেয়ে আমার চোখে পড়েছে, কিন্তু একটাও ইটালিয়ান মেয়েকে আমি খারাপ দেখলুম না।'

বললুম, 'কোনো ইটালিয়ান মেয়েকে বিয়ে করে ফেলুন না?'

হা হা করে জাহাজ কাঁপিয়ে হেসে উঠে বললেন, 'বাঙালীদের মুখে বিয়ের কথা ছাড়া কিচ্ছু নেই! When milk is cheap why keep a cow?' আবার সেই প্রচণ্ড অট্টহাসি শুরু করলেন।

সামুয়েল বাটলারের চ্যালা না কী! ভাবলুম শুধোই, কিন্তু হাসির তোড়ে আর শুধোব কী!

অনেকক্ষণ ধরে বাঁশি শুনিয়ে চলে গেলেন। সব সুরই আরবী সুর।

সন্ধ্যের দিকে বিছানা ছেড়ে কোনো রকমে টলতে টলতে ডেকে গেলুম। জাহাজ আর একটু পরেই এডেন পৌঁছবে। এডেন দেখবার জন্যে যাত্রীরা সব ভীড় করে উৎসুক নয়নে ডেকের রেলিং ধরে চেয়ে আছেন।

আমাকে দেখতে পেয়ে শফিক শাবান এগিয়ে এসে শুধোলেন, 'এডেনে নামছেন তো?'

বললুম, 'না, শরীর ভালো লাগছে না। আপনি?'

'নিশ্চয়ই! আমি একজন ইয়াঙ্কি নাবিককে জানি; ভীষণ রসিক লোক; প্রত্যেক বন্দরে বন্দরে তার একজন করে বৌ ছিল! আমি হচ্ছি সেই নাবিকের মত—প্রতি বন্দরে আমার যদিও এক-জন করে বৌ নেই বটে, কিন্তু বন্দরগুলোই হচ্ছে আমার বৌ। তাই আমি প্রত্যেক বন্দরেই নামি!'

এমন সময় যাত্রীদের মধ্যে একটা গুঞ্জন উঠল—'এডেন।'

আমি চারিদিকে চেয়ে একটু দূরেই সমুদ্রের মাঝখানে একটা প্রকাণ্ড নীল পাহাড় ছাড়া কিছুই দেখতে পেলুম না।

শাবান বললেন, 'ওই পাহাড়টাই হচ্ছে এডেন।'

ক্রমশঃ সেই পাহাড়টার ভাঁজে ভাঁজে ছবির মত সাজানো ঘর-বাড়ী, ঢেউ খেলানো রাস্তা সব চোখে পড়ল। ঘরে ঘরে, পথে পথে রঙবেরঙের আলো জ্বলে উঠে পাহাড়টাকে রঙে রঙে রঙিয়ে দিল।

শাবানরা সব দল বেঁধে নেমে গেলেন এডেনে। আমি কেবিনে ফিরে এসে কম্বল মুড়ি দিলুম।

ঘুমিয়ে পড়েছিলুম। এক সময় ঘুম ভেঙে গেল। কত রাত কে জানে। মনে হল যাত্রীরা এখনো সব এডেন থেকে ফিরে আসেনি। আমার বিছানার পাশেই আছে কাঁচের গোল জানালা। চেয়ে দেখলুম রাত্রির অন্ধকারে সমস্ত এডেন রঙীন আলোয় ঝলমল করছে। আমার সামনেই যেন ওই অন্ধকার কালো সমুদ্রের উপর হাজারো রঙীন মণিমুক্তো খচিত একটা প্রকাণ্ড শাঁখ কাৎ হয়ে পড়ে আছে। তাব পর দিলুম মাথার কাছের কলিং বেলটা টিপে।

একটু পরেই দরজায টক্ টক্ শব্দ হ'ল এবং একটা সুব ভেসে এলো—'কাম ইন?' দীনার গলা। ভালো ইংরেজী জানে না, তাই ডাকলেই দবজাব বাইবে থেকে শুধু ওই টুকু বলে 'কাম ইন?' কখনো বলে, 'ইউ কলি' ?'

বললুম, 'ইয়েস, কাম ইন।'

রাত্রিব সাথে সাথে ওবো গোলাপি দেহ ঘিবে বাত্রি ঘনিযে উঠেছে। ওই কালো পোশাকেব অবগুণ্ঠনে সে নিজেব চাবিদিকে কী রকম একটা দুবত্ব ঘনিযে নিযেছে। চোখ দুটো ঘুমে ঢুলছে। কাছে এসে শুধোলো, 'কেন ?'

বললুম, 'আমাব শবীব ভালো নেই। তাই সন্ধ্যেয ডাইনিং হলে গিযে খেতে পাবিনি। খিদে পেযেছে। কিছু খাবাব যদি এখানে এনে—

হঠাৎ তাব উজ্জ্বল মুখটা নিভে গেল। বলল, 'এত বাতে। আমাকে আগে বলেননি কেন ? এখন দশটা বাজছে। কিচেন নিশ্চয়ই অনেকক্ষণ হল বন্ধ হযে গেছে।'

বললুম 'ঘুমিযে পড়েছিলুম।'

ভীষণ ভাবনা করে বলল, 'কী হবে তাহলে! এখন তো আর কোনো উপায নেই।' তাবপর ভ্রূ কুঁচকে কী ভাবল খানিকক্ষণ।

ভেবে বলল, 'আচ্ছা দাঁড়ান, চীফ ষ্টুয়ার্ডকে বলে দেখি যদি কিছু করতে পারি। কী আনব?'

বললুম, 'নো ওয়াতার, নো তি, নো কফি, নো লিকুইদ—ওনলি দ্রাই ফুদ্‌স্‌ এন্দ ফ্রুত।'

লজ্জায় তার গোলাপি গালদুটো লাল হয়ে উঠল। তার পরেই সোনালী চুল উড়িয়ে, কানের নীল পাথরের দুল দুলিয়ে, মৃদু হাসির রঙীন পাপড়ি খসিয়ে, সরল চোখের চপল চাহনীর মুক্তো ঝরিয়ে এক নিমেষে পালিয়ে গেল।

একটু পরেই ফিরে এলো প্লেটে এক গাদা সবুজ আপেল, কমলা আর রুটি মাখন নিয়ে। তখনো তার দুই গালে লজ্জার সেই আবির লেগেই আছে। টেবিলে রাখতে রাখতে বলল, 'নো ওয়াতার নো তি, নো কফি, নো লিকুইদ—ওনলি দ্রাই ফুদ্‌স্‌ এন্দ ফ্রুত।'

।। ছয় ।।

লিওনার্দো এক তাড়া তাস এলোমেলো চালাচালি করতে করতে বলল, 'মিস্তার ইভানে, প্লে কার্দ ?'

এতক্ষণ বিছানায় শুয়ে শুয়ে একের পর এক সিগারেট পোড়াতে পোড়াতে নিজের মনে তাসগুলো নিয়ে পেসেন্স খেলছিল। যে টুকু সময় কেবিনে থাকে ওই ওর কাজ

ডেকে কিম্বা লাউঞ্জেও দেখেছি সবাই যখন নানান ধান্দায় সময় কাটাচ্ছে; ও এক কোণে বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে এন্তার সিগারেট খেতে খেতে তাস খেলায় মত্ত।

উৎসাহিত হয়ে উঠে বসে বলল, 'খেলবেন তো বলুন, তাহলে আর একজনকে ডেকে আনি।'

আমি বললুম, 'আমি ভালো তাস খেলতে জানি না। তা ছাড়া লাঞ্চের সময় হয়ে এসেছে।'

'তাস জানেন না তো তবে জানেন কী—'বলে সে আমার সম্বন্ধে সব আশা ভরসায় জলাঞ্জলী দিয়ে ফের বিছানায় শুয়ে পড়ে পেসেন্স খেলা শুরু করল।

দিগ্‌বিদিক জ্ঞানহারা হয়ে দোতলায় ডাইনিং হলে যাচ্ছিলুম, সিঁড়ির মুখেই দেখা শফিক শাবানের সঙ্গে। বললেন, 'এমন ঘোড়ায় চড়ে চলেছেন কোথায় ?'

বললুম, 'ডাইনিং হলে। বারোটা বাজতে আর মোটে আধ মিনিট বাকী আছে। জানেন তো এক মিনিট এদিক ওদিক হলেই শুনতে হবে, ভেরি সরি স্যার, ইউ কামিং লেত, নো লাঞ্চ তু দে, রিমাইন্দ দিনার এ্যাত সিক্স থাতি, নো লেত্। আপনি ?'

বললেন, 'কোথায় আবার ? আপনারি মত তীর্থে গিয়ে পুণ্য করতে চলেছি।'

থতমত খেয়ে গিয়ে বললুম, 'তার মানে?'

ভুঁড়ি উল্টে দাঁড়িয়ে হো হো করে হাসতে হাসতে বললেন, "বুঝলেন না? ডাইনিং হলে! অমন তীর্থের জায়গাটি আর হয় না!'

'আপনার তো জানতুম সেকেণ্ড ব্যাচে লান্চ?'

'তাই তো ছিল। কিন্তু আজ সকালে চীফ ষ্টুয়ার্ডের কী মর্জি হল কে জানে, আমার সময়টা কাঁ্যাচ করে বদলে দিলেন। সে সব যাই হোক—আপনি কিন্তু ভাববেন না আসল কাজটি আপনি রোজই এড়িয়ে যাচ্ছেন বলে আমি লক্ষ্য করছি না। আজ আর ছাড়ছিনি! লান্চটি চব-চষ্য-লেহ্য-পেয় করেই কিন্তু শুরু করতে হবে।'

'কী?'

'গান। আজকে না শুনেই ছাড়ছিনি।'

বললুম, 'টেকোর কাছে কক্ষনো চিরুণী চাইতে নেই। আপনি টেকোর কাছে কেন খামকা চিরুণী চাইছেন বুঝছি না।'

'কে বলে আপনি টেকো? পষ্ট দেখতে পাচ্ছি চুল গিজগিজ করছে। সব বাঙালীই গান জানে।'

'আপনি বললেই হবে?'

'আচ্ছা, লান্চটা খাই, তার পর সত্যিমিথ্যের বিচার হবে! চলুন।'

ডাইনিং হলে পনের নম্বর টেবিলটি হচ্ছে আমার। এই টেবিলে আমরা তিনজন লান্চ আর ডিনার খেতে বসি। অপর দুজনের মধ্যে একজন চীনে। আর একজন ফৈজাবাদের লোক। আসলে বিহারী, কিন্তু অনেকদিন ফৈজাবাদে থেকে এখন ফৈজাবাদী হয়ে গিয়েছে।

টেবিলের উপর তিন কোণে তিনটি বড় খাম রাখা থাকে। তাতে আমাদের নাম ঠিকানা অর্থাৎ কেবিন নম্বর লেখা আছে। আর তার মধ্যে আছে ন্যাপকিন। নাম ঠিকানা মিলিয়ে আমরা যে যার কোণটিতে বসি।

চীনে শর্মা দিনে রাতে খেতে বসেই কোন দিকে না চেয়ে বাহ্য-জ্ঞানশূন্য হয়ে দু'হাতে করে অতি সুশ্রী যে চতুষ্পদ জীবটির শ্রাদ্ধ করে সেটি মুসলমানেরও হারাম, হিন্দুরও।

আর নাদুসনুদুস ফৈজাবাদী বন্ধুটি চালায় মুরগি রোষ্ট। বেচারী নেহাত নিরীহ ভালোমানুষ। মাথার খোলে মগজের ভাগটা একটু বাড়ন্ত। বিলেত চলেছে ফার্সী সাহিত্যে ডক্টরেট করতে। নিজের মতলবে নয়, বন্ধুদের পরামর্শে ও উৎসাহে! পরশুরামের নন্দদুলাল আর কী! বাপ অজস্র টাকা রেখে গেছেন, ছেলে চলেছেন সদ্ব্যবহার করতে!

ফারসী সাহিত্যে ডক্টরেট করতে চলেছে শুনে তার সঙ্গে সাদী, রুমী, হাফেজ, নিজামি, ফেরদৌস, ওমর খৈয়াম, আনোয়ারী সম্বন্ধে কথা বলতে গিয়ে দেখেছি থতমত খেয়ে যায়,—কেবলই এ কথা সে কথা পেড়ে ঘাস দিয়ে ব্যাং ঢাকতে চেষ্টা করে।

তা সে যাকগে ও সব কথা।

মাংস চাইলে পাচ্ছে চীনেম্যান যেটি গোগ্রাসে ভক্ষণ করে সেইটি দিয়ে দেয়, আর মুরগি এই আনাড়ি হাতে ছুরি কাঁটায় সামলাতে পারব না বলে আমি সব সময় নিরামিষ খাই। তাই আমার ওয়েটারের ধারণা হয়ে গেছে আমি বোধ হয় ঘোরতর ভেজিটে-রিয়ান—ধর্মভীরু মানুষ!

মাঝ-বয়সী, বেঁটে-খাটো, মোটা-সোটা মানুষ। সামনের একটি দাঁত সোনায় বাঁধানো। আর একটি দাঁত আধখানা ভাঙা। কপালের রেখাগুলো কেন যে এরি মধ্যে এত গভীর হয়ে গেছে বোঝা মুশকিল। নাম ভিঞ্চি। ইটালিয়ান।

আমাকে দেখলেই একটা হাত তুলে এক গাল হেসে ভাঙা ভাঙা ইংরেজীতে বলবে, 'এ্যাল্লো স্যার, গুদ নাইত (অথবা গুদ আপতার নুন্—সময় বিশেষে), আউ আর ইউ? ইউ ভেজিতেরিয়ান?

ওয়াত ড্রিং? ভাজিয়া, (ভাজি) পুরীয়া, (পুরী) পাপাত্ (পাঁপড়), দাল রাইস, ভেজিতেবল্ রাইস? পোত্যতো রাইস্? ওয়াত ড্রিং?'

এ একেবারে বাঁধা গৎ।

তার পর আমার উত্তরের অপেক্ষা না করেই ভেজিটেবল রাইস নিয়ে আসবে। কোন্‌টার পরে কী খাই ওর মুখস্থ হয়ে গিয়েছে। তাই ভেজিটেব্‌লে রাইসের পর আর শুধোয় না। ঠিক পর পর কেক, আইসক্রীম আর ফল নিয়ে আসে।

শুধু কোনোদিন বলে, 'তু দে তেক্ দাব্‌ল্ আইসক্রীম স্যার, ভের্‌রি দিল্লীসস্ আইসক্রীম তু দে স্যার।'

আর একটি কারণে এই ওয়েটারটিকে আমার মনে থাকবে। এরা দুপুরে রাত্রে যে মেনু বিলি করে তাতে প্রত্যেকদিন একটা করে নতুন নতুন ইটালিয়ান মাষ্টারপিস ছবি থাকে। একদিন আমি তার কাছ থেকে একটা চেয়ে নিয়েছিলুম। সে বলেছিল, 'ইউ তেক্, এভ্‌রি দে ইউ তেক্, অল ইউ তেক্, আই গিভ্ ইউ।' দুপুরে রাত্রে রোজ সে ঠিক মনে করে একটা করে ছবি আমাকে দেয়।

শূয়োরের গন্ধে চীনেম্যান তখন সবেমাত্র হন্যে হয়ে উঠেছে আর ফৈজাবাদী আনাড়ী হাতে ছুরি-কাঁটায় মুরাগ রোস্টের সাথে তুমুল লড়াই চালিয়ে তাকে একটু বাগে এনেছে অথচ আমার বরাদ্দ ভেজিটেব্‌ল্ রাইস কাকের ঠোকরে উড়ে গেছে। এমন সময় ওয়েটার এসে সুখবর দিল, 'তেক দাব্‌ল্ তোর্তা স্যার--তু দেজ্ তোর্তা ভের্‌রি নাইস তোর্তা স্যার।'

তোর্তা হচ্ছে পেস্ট্রি কেক। বাংলায় 'ফুল কেক।' তা ফুল তো ফুলই! প্লেটের উপর ঠিক যেন দুটি রঙীন ফুল সাজিয়ে রাখা আছে।

রূপ দেখব না, চর্বিত চবণ করে জাবর কাটব তাই ভাবছি এমন সময় ফৈজাবাদী ভায়া চমকে দিয়ে খুব অবাক হয়ে বলল

'আচ্ছা ইমাম সাব, ষ্টুয়ার্ডনে বোলা কী জাহাজ আভি রেড সী'সে চল্ রহা। ও ঠিক বাত হ্যায়? আভি হামলোক সচ্ রেড সী'কা অন্দর হ্যায়?' ওর সবেই অমনি অবাক ভাব।

বললুম, 'তবে নয়তো কেয়া আরব সমুন্দর মে হ্যায়? আরব দরিয়া তো কেত্তা দূর মে ফেঁক আয়া।'

'তো রেড সী তো রেড নেহি হ্যায়? ইস্ দরিয়া কো তো রেড হোনা চাহিয়ে—যব নাম হ্যায় রেড সী? মুঝে মালুম থা কী রেড সী একদম খুন কা তরে লাল হ্যায়!'

মনে মনে বললুম, তোমার মাথা! মুখে বললুম, 'আরে নেই, নেই, ও খালি নামেই রেড হ্যায়, সত্যি সত্যি রেড নেই হ্যায়।'

খুব সমঝদারের মত চোখ ঘুরিয়ে মাথা দুলিয়ে বলল, 'ও।' তার পর আবার খানিক চুপ করে থেকে বলল, 'ইমাম সাব, আপকো পাস এক এ্যাডভাইস মাংতে হে—বলিয়েগা?'

'কেন নেই বোলেগা? বলিয়ে না কেয়া এ্যাডভাইস?'

'কাল সামকো জাহাজকো জো এ্যালারম্ বাজা থা আপকো পাতা হ্যায় না?'

'হ্যাঁ তো—হ্যায়।'

'তো মেরা কামরেকোভি এ্যালারম্ বাজা। লেকিন ম্যায়নে নেহি সমঝা কিস্ লিয়ে বাজতা—আওর নিন্‌ভি আতা থা, ওই লিয়ে ম্যায় রেড জ্যাকেট পেহেন্‌কে ডেক্‌পে ভি নেই গয়া, বিস্তারাপেই রহ্ গয়া। ফের যব এ্যালারম বাজা তো ম্যায়নে বিস্তারাসে উঠকে কেবিনকা দরওয়াজা খুলকে এক দফে খালি ঝাঁকি মারকে দেখা কেয়া হোতা। উস্ ওয়াখত্, ও জো জাহাজকো জো মোটা এ্যায়সা নাউয়া হ্যায় না, উ হামকো রেড আঁখে দেখাকে আংরেজী পে বোলা জো, সব প্যাসিঞ্জার যব্ রেড জ্যাকেট পেহেনকে ডেকপে যাতা তব্ তুম্ এ্যায়সাই খাড়া হ্যায়? ওই

লিয়ে কাল সে মেরা দেমাগ ঠিক নেই হ্যায়। রাত পে নিন্ভি নেই হুয়া, খালি সোঁচতেঁহে কেয়া চীফ ষ্টুয়ার্ডকো পাস এক কমপ্লেন করেগা—কেয়া উ সালা নাউয়া হামকো রেড আঁখে দেখায়গা কেঁও? আপহি বাতাইয়ে ইমাম সাব, উ তো রিয়েলিই এ্যায়সা কুছ ডেন্‌জার নেহি হুয়া? উ তো সির্‌ফ্ খালি এক ট্রায়েল থা কী আগার এ্যায়সা কুছ্ খাত্‌ড়া হোয়—যায়সা কী জাহাজপে আগই লাগে, কেয়া জাহাজ ডুবতা হ্যায় তো প্যাসিঞ্জার লোগ ক্যায়সে বিহেভ্ করে। তো আপহি বাতাইয়ে ইমাম সাব, উ সালেকো লাল জ্যাকেট পেহেনকে ম্যায় নেই গয়া তো মেরা এ্যায়সা কোন্ কসুর হুয়া জো উ সালা নাউয়া হোকে হাম্‌কো রেড আঁখে দেখায়গা? হাম ঠিক এক কমপ্লেন করকে চীফ ষ্টুয়ার্ডকো পাস এক দর্‌খাস্ত্ পেশ করেগা। উ সালা নাউয়া উস্ রোজ মেরা বাল্ কাটকে চার সোও লীরা লে লিয়া। উ সালকো হাম কভ্‌ভি নেই ছোড়েগা। আপকো কেয়া এ্যাডভাইস হ্যায়?'

এমন সময় কানের কাছে শুনি 'খাওয়া হল?'

পিছনে চেয়ে দেখি শফিক শাবান। বললেন, 'যাবেন না?'

'কোথায়?'

'সেখানে?'

'কোথায়?'

'সেই যে সেদিন বলেছিলুম?'

'মনে পড়ছে না তো!'

'তবে আসুন'—বলে জোর করে আমার হাত ধরে টেনে তুললেন।

টেকোর কাছে চিকণী চাওয়ার ঝোঁকটা তাঁর কেটেছে দেখে হাঁফ ছেড়ে বাঁচলুম।

ফৈজাবাদীকে বললুম, 'জারা চিন্তা কর্‌কে আপকো এ্যাডভাইস দেগা।'

ডাইনিং হল পার করে, ডেকের উপরে এনে, বারের পাশ দিয়ে, সুইমিং পুলের ধার ঘেঁসে, লাউঞ্জের বুক চিরে, পিছল সিঁড়ি ভেঙে, প্রার্থনা-ঘরের মাঝ দিয়ে, কত সরু গলির ঘুবনো গোলক ধাঁধার পথ দেখিয়ে তাঁর সেই 'সেখানে' নিয়ে যেতে যেতে এক সময় সমুদ্রের দিকে চেয়ে হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ে বললেন, 'আচ্ছা বলুন তো দেখি, কবিরা সমুদ্রে নৌকো ভাসানো নিয়ে এত কবিতা লিখেছেন কী করে! নৌকো তো দূরের কথা, এত বড় জাহাজটাই এর ঢেউএর ডানার ঝাপটে অনবরত হাবুডুবু খাচ্ছে আর নৌকো যে মুহূর্তে কোথায় তলিয়ে যাবে সেটা কী তাঁরা এত বড় ভাবুক হয়ে একবার ভেবে দেখেন নি?'

বললুম 'সেইজন্যেই তো কবিদের কথা এখনো বিশ্বাস করতে নেই। প্লেটো কী আর সাধে তাঁর আদর্শ রাষ্ট্রের পাকা খাতা থেকে কবিদের নাম লাল কালি দিয়ে ঘ্যাচ করে কেটে দিয়েছিলেন। অনেক কবি ঝড়বৃষ্টির রাতে অভিসারের কথা কত কবিত্ব করেই না লিখেছেন। অথচ ভেবে দেখেননি যে, বৃষ্টির দিনে ছাতার দরকার, ঝড়ের বাতাসে হাতের প্রদীপ নিভে যাবে, পথঘাট কাদায় পচে উঠবে, কুঞ্জবনে সাপখোপের ভয় থাকবে। চারদিক ভেবে দেখতে গেলে আর কাব্য হয় না—বুঝলেন না?'

এক দৃষ্টে সমুদ্রের দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে গম্ভীর হয়ে শুধু বললেন, 'হুঁ।' তারপর বললেন, 'চলুন।'

তারো পরে আবো গম্ভীর হয়ে বললেন, 'এই রেড সী'র নামও নিশ্চয়ই কোনো কবি রেখেছিল। নইলে এত নীল সাগরের নাম হঠাৎ রেড সী হয়ে যাবে কেন! সে পাগল নিশ্চয়ই একে লাল দেখেছিল! কবি, শিল্পী—এরা সব পাগল, বুঝলেন না? এরা সব কিছুকেই নতুন রঙে, নতুন রূপে দেখতে পায়!' আমার দিকে চেয়ে অদ্ভুত এক রকম ভাবে হেসে উঠলেন।

তাঁর দুই চোখে কী রকম একটা ক্ষ্যাপাটে দৃষ্টি ঘনিয়ে উঠেছে। মনে হল তিনিও বোধ হয় তাঁর শিল্পীর চোখ দিয়ে আজ হঠাৎ এই নীল সমুদ্রকে লাল দেখতে শুরু করেছেন।

তিনি তাঁর আট আঙুলের আংটির পাথরে রং খেলাতে খেলাতে সোনালী-ক'লো বাঁশিতে রঙীন সুর বাজাতে বাজাতে আমাকে নিয়ে চললেন।

জাহাজের যে এত সিঁড়ি, এত অচেনা পথ, এত অজানা দিক আছে আমার ধারণাও ছিল না। কিন্তু তিনি যেন এ রাজ্যের লিভিংষ্টোন, এর নাড়ীনক্ষত্র তাঁর নখদর্পণে।

॥ সাত ॥

এক সময় হঠাৎ বাঁশি থামিয়ে একটা কেবিনের সামনে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে দরজায় ঠক ঠক শব্দ করলেন। শুধোলুম. 'কে থাকেন এই কেবিনে?'

বললেন, 'সেই যে এক রুশ পরিবারের কথা বলেছিলুম—তাঁরা। লাল রুশ থেকে এঁরা আমদানি হয়েছেন, গায়ের রংও লাল, তাই বলে কিন্তু মনে এঁরা মোটেই লাল নন।'

'তার মানে।'

'মানে এঁরা মার্ক্সকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে এখনো খৃষ্টের ভক্ত। শুধু ভক্ত বললে ভুল হবে—গোঁড়া ভক্ত। বিশেষ করে মাদাম। সেইজন্যে লাল-কর্তারা ওঁদেরকে দেশ থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে। এখন থাকেন ইটালীতে।' বলে তিনি ফের নক্ করলেন।

এইবার ভিতর থেকে মেয়েলী গলায় একটা সুর ভেসে এলো. 'ইয়েস, কাম ইন।'

ভিতরে গিয়ে দেখলুম গিন্নী আছেন, কর্তা নেই। আর গোলগাল, মোটাসোটা বাচ্চাটা তাঁর কোলে এক গাদা শিউলি ফুলের মত পড়ে পড়ে ঘুমোচ্ছে—র‍্যাফেলের ম্যাডোনার চেয়েও সুন্দর ছবি। বিছানার উপর বসে তিনি উল বুনছেন। আর ঠোঁট দুটি মৃদু মৃদু কাঁপছে। বোধহয় বুনতে বুনতে এক মনে কিছু প্রার্থনা করছেন।

সুন্দর চেহারা। রেশমী সোনালী চুল। রং যদিও মাখেননি তবু মনে হল গালে আর ঠোঁটে কে যেন গোলাপের পাপড়ি থেকে গোলাপি আর জবার পাপড়ি থেকে রক্ত তুলে মাখিয়ে দিয়েছে।

গলায় সরু একটি হার। তার লকেটটা ক্রুশ। সামনেই বহু দামী সংস্করণের একটা বাইবেল খোলা।

সোনিয়াকে দেখে মনে পড়ল এঁদের তো আমি বহুবার ডাইনিং হলে আর ডেকে দেখেছি। এঁরা যে রুশ তা জানতুম না। এঁর একটা জিনিষ আমি সব সময়ই অবাক হয়ে লক্ষ্য করে দেখেছি—জাহাজের আর পাঁচজন দিশী বিলিতি মেম সাহেবের মত ইনি কখনো কোনো কস্‌মেটিকের উৎকট রং মেখে সং সাজেন না। তাদের মত কোনো বিশ্রী ভাবভঙ্গীও এঁর মধ্যে কোনোদিন চোখে পড়েনি। যে ফ্রকটি পরেন সেটিও অত্যন্ত সাদাসিধে। আর সব মেয়েদের দেখতে পাই তারা এ বেলা ও বেলা নতুন নতুন ময়ূরের পাখা ন্যাজে গুঁজে নতুন রঙের ময়ূর হচ্ছে—অবশ্য বেশীর ভাগই ময়ূরের পেখম ন্যাজে গোঁজা কাক—কিন্তু তাঁকে দেখেছি একই ফ্রক দিনের পর দিন পরে আছেন। পোশাক সম্বন্ধে সম্পূর্ণ উদাসীন। পয়সা হয়তো এঁদের অনেক আছে, কিন্তু জাহাজের আর পাঁচজন পয়সাওয়ালার মত সর্বাঙ্গে তার নামাবলি জড়িয়ে লোক দেখাবার বেহায়া চেষ্টা নেই। বাচ্চাটাকেও সব সময়ই হয় তাঁর কোলে নয় তাঁর স্বামীর কোলে দেখেছি। কোল ছাড়া কখনো তাকে দেখিনি। আর দেখেছি সমুদ্রের মাঝখানে জাহাজের বন্দীখানায় এই নির্বাসিত জীবনে ছেলেমেয়ে, বুড়োবুড়ী সবাই যখন রাত্রিদিন ডেকে, বারে, লাউঞ্জে নব নব রসের নেশায় একেবারে নির্লজ্জ, উন্মত্ত, তখন তাঁরা ডেকের এক নির্জন প্রান্তে রেলিঙের ধার ঘেঁষে নীল, লাল দুটি হেলানো চেয়ার পেতে স্বামী স্ত্রী দু'জনে পাশাপাশি বসে মৃদু মৃদু স্বরে গল্প করছেন।

অর্থাৎ ডেকে, ডাইনিং হলে যেখানেই তাঁদের দেখেছি তাঁরা সবার থেকে আলাদা হয়ে চোখে পড়েছেন। তাঁদের ওই সাদাসিধে স্নিগ্ধ ভাবটা দেখে সবসময়ই দূর থেকে মুগ্ধ হয়েছি।

এতদিন দূর থেকে যাঁদের দেখে এত ভালো লেগেছে আজ তাঁদেরই অত্যন্ত কাছে এসে পড়ে আরো ভালো লাগল। কিন্তু ঘরে প্রথম পা দিয়েই হকচকিয়ে গেলুম।

আমাদের ঘরে ঢুকতে দেখে সোনিয়া একবার মাত্র মুখ তুলে চেয়েই চোখ নামিয়ে নিয়ে গম্ভীর হয়ে যেমন উল বুনছিলেন তেমনি উল বুনতে রইলেন। আর আরো জোরে জোরে বিড়বিড় করতে লাগলেন।

শাবানের দিকে আড়চোখে চেয়ে দেখি তিনিও একটু অবাক হয়ে গেছেন। থতমত করতে করতে শাবান একবার আমার সঙ্গে তাঁর পরিচয় করিয়ে দেবার চেষ্টা করলেন, তবু তিনি কোনো রকম আমল দিলেন না। এক মনে উল বুনে চললেন। রূপালী কাঁটা আর নীল উলের মাঝখানে তাঁর গোলাপি আঙুলগুলি চমৎকার ভাবে খেলা করছে।

হঠাৎ দেখি তাঁর সরু নাকের ডগা রাগে থরথর করে কাঁপছে। নীল চোখে নীল আগুন দপদপ করছে। সঙ্গে সঙ্গে শুরু হল বিস্ফোরণ। বললেন, 'আপনার সঙ্গে পরিচয় হয়ে খুশী হলুম। শফিক শাবানের মুখে আপনার কথা অনেক শুনেছি। কিন্তু বলতে পারেন, আপনারা আমার এমন সর্বনাশ করতে চান কেন? আমি আপনাদের কী করেছি?' রাগে ফুলতে ফুলতে ক্রুদ্ধা নাগিনীর মত ফণা তুলে সোনিয়া আমাদেব দিকে দীপ্ত চোখ মেলে চেয়ে রইলেন।

শফিক শাবান খাবি খেতে খেতে বললেন, 'আমরা—মানে—মানে—আমরা আপনার—মানে—কোনো সর্বনাশই করতে চাইনি——'

সোনিয়া রাগে কাঁপতে কাঁপতে উল, কাঁটা বিছানায ফেলে দিয়ে বাচ্চাটাকে কোলে নিয়ে দাঁড়িয়ে বললেন, 'চাননি?'

শাবান ভয়ে একটু পিছিয়ে গিয়ে বললেন, 'না, না, চেয়েছি, চেয়েছি, অন্যায় হয়ে গেছে।'

আশ্চর্য্য! সঙ্গে সঙ্গে জ্বলন্ত সোনিয়া নিভে একেবারে ছাই। হঠাৎ যেন তাঁর সম্বিত ফিরে এলো। রাঙা হাসিতে রাঙা মুখ আরো রাঙিয়ে বললেন, 'বসুন, আপনারা দাঁড়িয়ে আছেন কেন?'

তারপরেই বিছানায় বসে উল, কাঁটা তুলে নিয়ে ফের গম্ভীর হয়ে

গিয়ে বললেন, 'আচ্ছা মঁশিয়ো শাবান, আপনারাই বলুন তো মানুষের সর্বনাশ করাটা কী কখনো ভদ্দর লোকের কাজ?'

শাবান অবাক হয়ে তাঁর মুখের দিকে চেয়ে থেকে বললেন, 'নিশ্চয়ই না।'

সোনিয়ার চোখ দুটো আবার দপদপ করে জ্বলতে নিভতে লাগল। বললেন, 'তবে—তবে আপনারা আমার এমন সর্বনাশ করতে চাই-ছেন কেন? দ্রিমিদভের মাথায় আপনারা ও সব বুদ্ধি ঢোকাচ্ছেন কেন?'

শফিক শাবান বিস্ময়ে থ হয়ে গিয়ে বললেন, 'কী বুদ্ধি? আমি তো আপনার কথা কিছুই বুঝতে পারছি না!'

সোনিয়া বললেন, 'দ্রিমিদিভ আজকাল প্রায়ই বলছে সে বুদ্ধিষ্ট হয়ে যাবে। কখনো বলছে কম্যুনিষ্ট হয়ে যাবে। কখনো বলছে ইণ্ডিয়ায় চলে গিয়ে হিন্দু হয়ে যাবে। কখনো বলছে মক্কায় গিয়ে ইসলাম ধর্মে দীক্ষা নেবে। আবার কখনো বলছে—'

শাবান বললেন, 'কী হল, আটকে গেলেন কেন?'

উত্তেজনায় কাঁপতে কাঁপতে সোনিয়া বললেন, 'কখনো বলছে—

শফিক শাবান বললেন, 'আটকে যাচ্ছেন কেন? কী বলছেন?'

সোনিয়া এইবার মরিয়া হয়ে বলে ফেললেন, 'কখনো বলছে স্যাডিস্ট হয়ে যাবে।'

আমি আর শাবান এক সঙ্গে বলে উঠলুম, 'এ্যাঁ!'

সোনিয়া বললেন, 'আর কেবলই বাইবেল নিয়ে দিনরাত ঠাট্টা করছে।'

শাবান বললেন, 'তাই না কী? আবার বাইবেল নিয়েও ঠাট্টা করছেন?'

'হ্যাঁ। তাই তো বুনতে বুনতেও বসে বসে যীসাসের কাছে প্রার্থনা করছিলুম, হে প্রভু তুমি ওর সুমতি দাও। ক'দিন ধরে দিনরাত এই বলে কেঁদে কেঁদে কেবলই যীসাসের কাছে প্রার্থনা করছি আগে তো ও এ সব কথা কখনো বলত না। এই জাহাজে চেপে অব্দিই

মাথায় ভূত চেপেছে। এ সব কী কম সর্বনেশে কথা! আজ সকালে খুব করে চেপে ধরতে বলল আপনারাই না কী ওর মাথায় এ সব ভূত চাপিয়েছেন। সে ভালোমানুষ, তাই বলে কী এমন করে ধ্বংসের পথে নিয়ে যেতে হয়? এই কী বন্ধুর কাজ?'

শফিক শাবান ককিয়ে উঠে বললেন, 'আপনি বিশ্বাস করুন, আমি তাঁকে কোনোদিন এ সব পরামর্শ দিইনি। তিমি আপনার কাছে মিছে করে আমার নামে লাগিয়েছেন'।

সোনিয়ার তুই চোখে দারুন সন্দেহ ঘনিয়ে উঠল। বললেন, 'বলেননি! তবে দ্রিমিদভ আজকাল আমার কাছে মিছে কথাও বলতে শুরু করেছে!' তার পর আবার গম্ভীর হয়ে গিয়ে উল বুনতে বুনতে এক মনে কী সব বিড়বিড় করতে লাগলেন।

এমন সময় গোদের ওপর বিষ-ফোঁড়া উঠল। দ্রিমিদভ এলেন ফিরে।

দ্রিমিদভ একটু লাজুক ধরনের মানুষ। লজ্জায় লাল হয়ে মুখটি একটু নীচু করে আমাদের সামনে বসলেন।

শাবান আমার সঙ্গে তাঁর পরিচয় করিযে দিলেন।

সঙ্গে সঙ্গে দ্রিমিদভের দিকে কটমট করে চেয়ে সোনিয়া বললেন, 'তুমি আজকাল আমার কাছে মিথ্যেও বলতে শুরু করেছ? সকালে বললে মঁশিয়ো শাবানরা তোমাকে ওই সব শয়তানের পরামর্শ দিচ্ছেন, তোমার কোনো দোষ নেই?'

লাজুক দ্রিমিদভ লজ্জায় টকটকে লাল হয়ে বললেন, 'গিন্নী তুমি ঠাট্টা বোঝ না।'

সোনিয়া মারমুখো হয়ে বললেন, 'ঠাট্টা! ধর্ম নিয়ে ঠাট্টা! প্রভু যীসাস আর মা মেরীকে নিয়ে ঠাট্টা! লোকের নামে মিছে করে লাগানো ঠাট্টা! তোমার এ্যাদ্দুর অধঃপতন হয়েছে! এ রকম অধঃপতন তো নাস্তিক আর কম্যুনিষ্টদের হয়! তুমি না খৃষ্টান? জানো না ওতে পাপ হয়?'

ড্রিমিদভ বললেন, 'আহা, তুমি অত চটছ কেন? আর কক্ষনো ও সব কথা বলব না। তোমাকে চটাবার জন্যেই একটু ঠাট্টা করি। ঠাট্টা করে শুধু মুখে ও সব কথা বললে পাপ হয় না, মন থেকে বললে তবেই পাপ হয়। আমি কী আর সত্যি সত্যিই মন থেকে বলি না কী! তা ছাড়া, শফিক শাবানকে আমি জানি, আমরা পরম বন্ধু—উনি রাগ করবেন না জানি বলেই ওঁকে নিয়েও তোমার কাছে একটু ঠাট্টা করে সব দোষ ওঁর ঘাড়ে চাপিয়েছিলুম। খৃষ্ট ধর্মের মত এত বড় ধর্ম আর আছে না কী! সে ধর্ম ছেড়ে বুদ্ধিষ্ট, কম্যুনিষ্ট কিম্বা ন্যুডিষ্ট অমনি হলেই হ'ল! আমার কী মাথা খারাপ হয়েছে না কী!'

সঙ্গে সঙ্গে সোনিয়ার মুখ খুশীতে তম্‌তম্‌ করে উঠল। এক গাল লাল হাসি হেসে বললেন, 'তাই বল! তাই তো বলি ড্রিমিদভ তো আমার তেমন লোক নয়! সে আজকাল এ রকম সব শয়তানের কথা বলছে কেন! যীসাস আমার প্রার্থনা শুনেছেন। লোকের কাছে তুমি আমাকে এত অপ্রস্তুতে ফেল!'

তার পর আমাদের দিকে চেয়ে বললেন, 'আপনাদেরকে তখন অন্যায় করে যা তা বলে ফেলেছি বলে কিছু মনে করবেন না। আমি বড় লজ্জিত। এই ড্রিমিদভের কাণ্ডজ্ঞানহীনতার জন্যেই—'

আমরা বললুম, 'না, না, আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। আপনি কী বলেছেন আমাদের মনেও নেই।'

তার পর আরো ভালো করে আলাপ পরিচয় হল। চার জনে গল্পগুজব, হাসি তামাশা চলতে লাগল:

কথায় কথায় জানতে পারলুম বেহালায় ড্রিমিদভ হাত পাকাচ্ছেন। বুঝলুম শাবানের সঙ্গে তাই এঁদের এত মিলেছে। পায়রার সঙ্গে পায়রার মেলে, বাজের সঙ্গে বাজের।

আমি ইংল্যাণ্ডে যাচ্ছি শুনে ড্রিমিদভ বললেন, 'আমরাও অনেক—

দিন ইংল্যাণ্ডে ছিলুম। ইটালী ছেড়ে আমরাও আবার ইংল্যাণ্ডে চলে যাব ভাবছি। যাই বলুন, রাজনীতির কথা বাদ দিন, কিন্তু ইংরেজ জাতের সঙ্গে আর কোনো জাতের তুলনা চলে না। দেশটার হয় তো তেমন কোনো সৌন্দর্য নেই, কিন্তু ইংরেজের মত অমন খাঁটি মানুষ পৃথিবীর আর কোনো দেশে পাবেন না। আর সব দেশের লোক মেকী—ভুয়ো! ইংরেজ ক্রমশ গরীব হয়ে পড়ছে, এইবার ও'দেরও হয়তো অধঃপতন ঘটবে। কারণ দারিদ্র্যই সব সর্বনাশের মূল। কিন্তু তা সত্ত্বেও ইংল্যাণ্ড এখনো পৃথিবীর সেরা দেশ। ও রকম চূড়ান্ত স্বাধিনতাই বা আর কোন্ দেশে আছে বলুন! ইংল্যাণ্ড দেশ নয়, একটা তীর্থস্থান।'

এমন সময় ধীরে ধীরে দরজা খুলে গেল। এলেন পাকা, লম্বা চুল দাড়ীওয়ালা সন্ন্যাসী ধরনের এক বুড়ো। হাতে এক বেহালা।

জাহাজের ডেকে যখন সবাই তাস, পাশা, দাবা, রিং এবং ডেকের আরো নানান রকম খেলায় মত্ত, বারে যখন কেউ কেউ অমৃতের নেশায় হৈ হট্টোগোলে ব্যস্ত, তখন মাঝে মাঝে এই বুড়োকে আমি কোনো এক নির্জন কোনে বসে আপন মনে মৃদু সুরে বেহালা বাজাতে দেখেছি। তাঁর বেহালার সুর শুনে শুনে অজানা বেদনায় মন কত দিন উদাস হয়ে গেছে আর বুড়োর সম্বন্ধে কত কী ভেবেছি। দূর আকাশের দিকে চেয়ে দেখেছি নীল-বসনা, চির-অভিসারিণী সন্ধ্যাও দীপ হাতে ধীরে ধীরে আকাশ পথে পার হয়ে যেতে যেতে সেই সকরুণ সুর শুনে ক্ষণিকের জন্যে থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছে। তারও দুই করুণ চোখে ঘনিয়ে উঠেছে ঘন বিষাদ,—কতদিন তার কালো চোখের অশ্রু শিশির হয়ে ঝরে পড়েছে আমার গায়ে।

দ্রিমিদভ শুধোলেন, 'কী মিষ্টার জনসন বাজানো হল।' কোনো জবাব নেই।

দ্রিমিদভের হাতে বেহালাটি ফিরিয়ে দিয়ে বুড়ো যেমন নীরবে

এসেছিলেন তেমনি নীরবেই চলে গেলেন।

আমি শুধোলুম, 'বুড়ো কে?'

দ্রিমিদভ বললেন, 'জাহাজেই আলাপ, ইংল্যাণ্ডের লোক, চলেছেন সুইটজারল্যাণ্ড। মাঝে মাঝে বেহালা বাজাবার সখ হলে আমার কাছে থেকে চেয়ে নিয়ে যান।'

বললুম, 'পাগল না কী?'

সোনিয়ার ছুই চোখ আহত পাখির মত করুণ হয়ে উঠল। বললেন, 'পাগল? মোটেই না।'

শাবান শুধোলেন, 'তা হলে ও রকম কেন?'

সোনিয়া বললেন, 'তা হলে তিরিশ বছর আগের এক কাহিনী আপনাদেরকে বলতে হয়।'

আমি আর শাবান ছুজনেই উৎসুক হয়ে বললুম, 'বলুন না?'

সোনিয়া স্বামীকে বললেন, 'তুমি বল।'

লাজুক দ্রিমিদভ বললেন, 'না, তুমি বল।'

সোনিয়া বললেন, 'এ সময় মেয়েদের গল্প বলতে নেই গো নেই। নইলে বলতুম, তোমাকে সাধতুম না। নাও শুরু কর

দ্রিমিদভ যা বললেন তা সংক্ষেপে এই যে, সে আজ প্রায় তিরিশ বছর আগের কথা, জনসন আটলান্টিক সাগরের এক লাইট হাউসে কাজ করতেন। সে এক ভীষণ ঝড়ের রাত্রি। সমুদ্রেও ভয়ঙ্কর তুফান উঠেছে। লাইট হাউসের আলোও হঠাৎ গেছে খারাপ হয়ে। অথচ সেই রাত্রে তখনই একটা জাহাজ সেখান থেকে পার হয়ে যাবে। চারিদিকে বড় বড় পাহাড় খাড়া মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে। কী করবেন কিছুই ভেবে না পেয়ে জনসন পাগলের মত লাইট হাউসময় ছুটোছুটি করতে করতে কখনো ছুই হাতে করে মাথার চুল ছিঁড়তে লাগলেন। কখনো প্রাণপণে চীৎকার করতে লাগলেন। তার পর কখন অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেছেন আর তাঁর খেয়াল নেই। পরদিন

সকালে জ্ঞান ফিরে এলে জানতে পারলেন পাহাড়ে ধাক্কা লেগে সেই জাহাজ কাল রাত্রে চুরমার হয়ে গেছে, একটি যাত্রীও বেঁচে নেই। আর তারো দুদিন পরে খবর পেলেন সেই জাহাজে ছিল তাঁর এক মাত্র মেয়ে এলিজাবেথ। সেও সকলের সাথে মারা গেছে। মেয়ের শোকে সেই অব্দি উনি ও রকম আধ-পাগলের মতন হয়ে গেছেন। কেবল ঘুরে ঘুরে বেড়ান, কোথাও তিষ্ঠোতে পারেন না।

মানুষ আসলে সব জায়গায় এক, শুধু রং আলাদা—কেউ সাদা, কেউ কালো।

॥ আট ॥

গল্প শুনে কেবিনে ফিরে আসতেই দীনা একেবারে খুশীর ঝর্ণায় স্নান করতে করতে বলল, 'আজ মাঝ রাতেই আমরা সুয়েজ পৌঁছচ্ছি। আর শুধু বাকী থাকবে পোর্ট সঈদ আর নেপ্‌ল্‌স্‌—ব্যাস, তার পরেই জেনোয়া! কী মজা!' ছোট্ট মেয়ের মত হাততালি দিয়ে উঠল।

যতক্ষণ রইল তার মুখে শুধু জেনোয়ার কথা, মায়ের কথা, আর তার গোলাপ, করবী, আপেল, আঙুরের বাগানের কথা। তারি সাথে সাথে তার মুখখানিও হাসির রঙে, খুশীর আভায় গোলাপ করবী হয়ে উঠল। আর সে সব বর্ণনার ছবিও হৃদয়ের রঙে রসে রঙিয়ে রসিয়ে এমন করে সামনে মেলে ধরল যেন একখানি উৎকৃষ্ট কাশানি কার্পেট।

বিকালের দিকে লিওনার্দোকে একটা জরুরী কাজে দরকার পড়ল। তাই ছুটলুম ডেকে। কিন্তু জাহাজে চেপে অব্দি যা দেখিনি আজ তাই দেখে বড় অবাক লাগল। দেখলুম ডেকের সেই কোনটিতে তাদেব তাসের আড্ডায তার বন্ধুরা তাস খেলছে, কিন্তু লিওনার্দো সেখানে নেই। তাদের শুধোলুম, 'লিওনার্দো কোথায়?'

তারা বলল, 'জানি না। সে আজ আসেনি। আমরাও খুঁজে পাইনি।'

আশ্চয্য! তাস ছাড়া যে কিচ্ছু জানে না, চব্বিশ ঘণ্টা যাকে ডেকের ওই কোণটিতে তাসের আড্ডায় মত্ত দেখা যেত সে আজ আসরে নেই! তাস ছেড়ে হঠাৎ গেল কোথায়!

শাবানকে শুধোলুম। তিনিও বললেন, 'আমি তো তাকে কোথাও দেখিনি।'

কী মুশকিল! অথচ তাকে আমার এক্ষুনি বিশেষ দরকার। তার

সন্ধানে এই প্রকাণ্ড জাহাজের গোলক-ধাঁধায় উপরে নীচেয় ঘুরে ঘুরে বেড়াতে লাগলুম। লোকটা কী জাহাজ থেকেই ভোজবাজীর মত উধাও হয়ে গেল না কী!

ঘুরতে ঘুরতে হঠাৎ প্রার্থনা-ঘরের কাছে এসে কাঁচের দরজার সামনে থমকে দাঁড়ালুম। ভিতরে লিওনার্দো আর একটি মেয়ে অল্টারের সামনে পাশাপাশি পাথরের মূর্তির মতো বসে এক মনে প্রার্থনা করছে। হাতে বাইবেল। মেয়েটির মাথায় রঙীন রুমাল বাঁধা।

এ দৃশ্য দেখতে পাব বলে কল্পনাও করিনি।

মেয়েটিকে আমি চিনি। জাহাজে চেপে অব্দি তাকে প্রায়ই সাঁতারের কাপড় পরে ডেকের মাঝখানে সুইমিং পুলে জল-কুমারীদের মতো ঝাঁপাঝাঁপি করতে দেখেছি। কখনো দেখেছি সুইমিং পুলের ধারে মস্ত রঙীন ছাতার তলায় শুয়ে শুয়ে সান-বাথ করছে।

সুইমিং পুলে খেলা করতে করতে তার বান্ধবীদের তাকে নাম ধরে ডাকতেও শুনেছি—অরোরা।

সবার চোখের আড়ালে আড়ালে লিওনার্দো আর অরোরা সব ব্যবধান কাটিয়ে কেমন করে এত কাছে এসে পড়ল জানি না—কিন্তু এতদিন যাকে দেখে জলকুমারী, মীনকুমারী বলে মনে হয়েছে, আজ গীর্জের মধ্যে সেই অরোরাকে দেখে মনে হল অরোরা তো অরোরাই! যেন মূর্তিমতী জ্যোতির্ময়ী উষা।

পাছে তারা দেখে ফেলে তাই তাড়াতাড়ি ফিরে এলুম ডেকে।

ফিরে আসতেই সোনিয়ার ভাষায় এক 'জার্মেনিয়া' পাদ্রির চোখে পড়ে গেলুম। অনেকদিন পুনায় ছিলেন। পুনায় থাকতে এক সংস্কৃতের পণ্ডিতের কাছে বাংলা শিখেছেন। দেখেই বললেন, 'ওই দূরে চেয়ে দেখুন ধোঁয়ার মতো দেখা যাচ্ছে সিনাই পর্বতমালা। আরবরা ওই সমস্ত পর্বতশ্রেণীকেই বলে সিনাই পর্বত। ওই যে চূড়াটি দেখছেন ওর নাম মাউন্ট অফ মোজেস। আর ওর পাশের

ওই চূড়াটির নাম মাউণ্ট অফ সেণ্ট ক্যাথেরিন। চোখে দেখা গে
এ কথা মনে রাখবেন, ওই বিশাল পর্বতশ্রেণী এখান থেকে অ
তিরিশ মাইল দূরে।' সঙ্গে সঙ্গে আমার চোখে তিনি তাঁর দুরবিন
লাগিয়ে দিলেন।

ও সব পাহাড়ে তিনি বহুবার গেছেন। পুরনো ধর্মগ্রন্থগুলো মিলিয়ে মিলিয়ে ও পাহাড়কে তিনি তন্ন তন্ন করে দেখেছেন, তাই ও পাহাড়ের তিনি পাকা জহুরী।

দুরবিনের দরকার ছিল না, খালি চোখেই দেখা যাচ্ছিল সুদূর ওপারে অস্তসূর্যের রক্তচ্ছটা পড়ে বিশাল ধোঁয়াটে সিনাই পর্বতের মাউণ্ট অফ মোজেস আর মাউণ্ট অফ সেণ্ট ক্যাথেরিনের চূড়া আগুনের মত জ্বলছে।

যেন কোন্ মন্ত্র বলে অতীতের ঘন যবনিকা সরিয়ে ফেলে ফিরে এসেছে হাজার হাজার বছর আগের সেই এক মহাদিন—যেদিন মোজেস চলেছিলেন আপন মনে পথ ধরে আর যিনি সকল জ্যোতির জ্যোতি সেই আলোকের আলো আগুন হয়ে ওই পাহাড়ের শিখরে জ্বলে উঠে মোজেসকে দিয়েছিলেন পরম আহ্বান—দিয়েছিলেন বিদ্রোহের মন্ত্রে দীক্ষা।

তার পর পাহাড়ে পর্বতে, আকাশে, সমুদ্রে দারুণ রক্তশিখায় ধু ধু আগুন লাগিয়ে দিয়ে রুদ্র সূর্য টুপ্ করে খসে পড়ে ডুবে গেল লোহিত সাগরের রহস্যময় অতলে।

হঠাৎ কানে এলো বাঁশির সুর। এ কার বাঁশি সে আমার অজানা নয়, তবু আকাশে পাতালে প্রলয় অগ্নিকাণ্ড বেধে গেছে দেখে মনে হল সারা রোমে সর্বনাশা আগুন লাগিয়ে দিয়ে পাগলা নীরো যেন মনের আনন্দে বাজনা বাজাচ্ছে।

তার পর সিনাই পর্বতের আগুন নিভিয়ে, জ্বলন্ত আকাশকে সোনায় সোনায় সোনালী করে, লাল সমুদ্রে শীতল নীল ছায়া

ল, ক্লান্ত আমার চোখদুটিতে স্নিগ্ধ হাত বুলিয়ে নামল ধীরে
সন্ধ্যা
ধ্যা আরো রহস্যের আরো বিষাদের অবগুণ্ঠনে মুখ ঢেকে।

এক ঝাঁক উজ্জ্বল পাখি সার বেঁধে দূর সাগরের ওপার থেকে উড়ে এসে সিনাই পর্বত পার হয়ে চলে গেল। কী এক ধরণের নাম-না-জানা পাখি ঢেউয়ের মাথায় বসে মনের আনন্দে দোল খাচ্ছে। একে একে যাত্রীরা সবাই এসে জড় হল জাহাজের ডেকে। যেন কোন্ এক হিংস্র দানবের ভয়ে জনপ্রাণী সব যে যেখানে পারে লুকিয়ে লুকিয়ে সারাদিন অপেক্ষা করছিল, এখন সন্ধ্যার সাথে সাথে ওপারের পিরামিডের দেশ থেকে আকাশ ছেয়ে গম্ভীর সুরে ভেসে এলো কোন এক জ্যোতির্ময় মানবের অভয়মন্ত্র—তাই সবাই নির্ভয়ে বেরিয়ে পড়েছে।

শুনি জাহাজের এক নির্জন প্রান্তে বেদনায় আকাশ রাঙিয়ে শাবানের বাঁশি তখনো কাঁদছে। সে কাঁদনের সুরে যেন বারবার বাজছে, 'ওরে আয়, আমায় নিয়ে যাবি কে রে দিনের শেষের শেষ খেয়ায়।'

॥ নয় ॥

সকালবেলায় চোখ মেলেই দেখি শফিক শাবান। মাথায় সন্ত কেনা লাল চকচকে তার্বুশ্।

আজ ভালো করে চেয়ে দেখলুম অনবরত বিয়ার খেয়ে খেয়ে এই ক'দিনেই আরো বেশী ফুলে ঢোল হয়েছেন। এইবার যেন ফেটে যাবেন বলে মনে হয়।

বললেন, 'আসুন।'

'কোথায়?'

লাল তারবুশের কালো ল্যাজ দুলিয়ে বললেন, 'আরে আসুন না। দেখবেন সব কত রঙবেরঙের জিনিষ। জাহাজের ডেকে মিশরের মেলা বসে গেছে। কার্পেট এসেছে, রঙীন চামড়ার ব্যাগ এসেছে, তসবি, জায়নামাজ এসেছে, ঝিনুকের কাজ করা বাজনার বাক্সো, প্লেট এসেছে, উটের চামড়ার এ্যালবাম, রংবেরঙের কুশন, পিরামিডের নকল করা কত রকম কাঠের মূর্তি, মিশরের সব রঙীন ছবি এসেছে, তারবুশ—'

বাধা দিয়ে বললুম, 'হয়েছে, হয়েছে, আর শুনলে—'

'জোর বেচাকেনা চলেছে। ডেক একেবারে সরগরম। দেখতে চান তো তাড়াতাড়ি আসুন। পরে গেলে আর দেখতে পাবেন না। জিনিষপত্র সব লুট হয়ে যাচ্ছে।'

ডেকে গিয়ে চক্ষু স্থির।

দেখলুম তিনি যে ফিরিস্তি দিয়েছিলেন বাড়িয়ে তো বলেনইনি, বরং কম করেই বলেছিলেন। জাহাজের বর্ণহীন ডেকের পট জুড়ে কোন এক পাগলা শিল্পী যেন হাজার রঙের তুলি দিয়ে রাতারাতি এক মস্ত রঙীন মীনাবাজারের ছবি এঁকে দিয়েছেন।

তখন বুঝলুম কাল অনেক রাত্তিরে জাহাজ যখন সুয়েজ বন্দরে পৌঁছেছিল কেন সেই রাতের আলো-আধারে আমাদের জাহাজের চারিপাশে বিরাট বিরাট পালতোলা নৌকো আসতে দেখেছিলুম।

এরা সব নৌকো থেকে দড়ির মই বেয়ে জাহাজের ডেকে উঠে সারা রাত ধরে দোকান সাজিয়েছে।

শাবান যা যা বলেছিলেন তা তো আছেই—তা ছাড়াও এত রঙের, এত রকমের জিনিষ দোকানে দোকানে সাজানো যে, তার বর্ণনা দেওয়া আমার কর্ম নয়।

ওই জিনিষগুলোর সাথে তাল দিয়ে যাত্রীরাও যেন আজ সব আরো রঙীন হয়ে উঠেছেন।

কতকগুলো ইয়োরোপীয়ান ছেলে-বুড়োও লাল তারবুশ মাথায় পরে ঘুরছে।

শাবান কানে কানে বলে দিলেন, 'মনে রাখবেন দোকানদাররা দুনিয়ার সব যায়গায় এক। দাম হাঁকবে চার পাউণ্ড, দরদস্তুর করতে পারলে দেবে শেষে পাঁচ শিলিঙে। এখানেও তাই। আমার কাছ থেকে ঝানু হয়ে নিন। কুশনটা যদি আপনার পছন্দ হয়, ওই রামধনুর রং খেলা ঝিনুকের কাজ করা বাজনার বাক্সো কিম্বা প্লেট দেখে যদি লোভে পড়ে থাকেন তবে ভালো করে শুনে নিন কত দাম হেঁকেছে। যদি বলে তিন পাউণ্ড আপনিও ভদ্রতা করবেন না। পৃথিবীর আর যেখানে ভদ্রতা করেন করুন, এই জাহাজের ডেকে ভদ্রতা কিম্বা লজ্জা করেছেন কী মরেছেন। ওই তেলচিটে স্যুট পরা, জয়ঢাকের মত ভুঁড়িওয়ালা, হলদে-চোখো, বেঁটে, কালো দোকানদারটা যাহা আপনাকে তিন পাউণ্ডের গুলি ছুঁড়ে মারবে আপনিও যদি সঙ্গে সঙ্গে ওকে একখানা দশ শিলিঙের গুলি ঝেড়ে না দেন তো বাক্সো আপনার হাতে আসবে ঠিকই, জাহাজ থেকে লাফিয়ে নৌকোয় চেপে থিব্‌স্‌, মেম্ফিস, সাক্কারা, কিম্বা মনসুরা

দুপুরে ডাকাতি হয়ে গিয়ে কুপোকাতও হয়ে যাবেন তা বলে রাখছি। আর যদি সাথে সাথে দশ শিলিঙের একখানা গুলি ঝেড়ে দেন তবে কুপোকাতও হবেন না, বাক্সোও আপনার হস্তগত হবে। ভয় পাবেন না, জেনে রেখে দিন, জাহাজের ডেকে দোকানদারদের কাছ থেকে জিনিষ কেনা একরকম ছোটখাটো লড়াই। তার জন্যে তৈরী থাকুন। অই, অই শুনুন, দরাদরির একটা নমুনা--আপনার বন্ধু রায় কী ভাবে একখানা এ্যালবাম কিনছেন। আমাকে আর 'পাখিপড়া' করে শেখাতে হবে না।'

চেয়ে দেখি একটু দূরেই রায় এক দোকানীর সঙ্গে দরাদরি করছে। কানে এলো রায় শুধোচ্ছে,

'হাউ মাচ ?'

'হুইচ কইন ? ইংলিশ, ইতালিয়ান অর ঈজিপশিয়ান ?'

'ইংলিশ।'

'তু পাউন।'

'ফাইব শিলিং।'

'ওয়ান পাউন নাইনতিন শিলিন।'

'নো। ফাইব শিলিং।'

'নো মিস্তার ; গি. ওয়ান পাউন ফিপ্‌তিন শিলিন।'

'নো। উই এ্যাণ্ড ঈজিপ্ট ফ্রেণ্ড।'

'ফ্রেন্দ্‌ অল রাইত। হু নত্‌ এদমিত ? হু আই ? হ্যাব আই নত্‌ এদমিত্‌ ? ইফ ইউ ফ্রেন্দ, দেন দোস্ত কিল মি ফ্রেন্দ। গত্‌ তু ওয়াইফ, তোয়েনতি চাইল্‌দ। সেব দেম। গিব্‌ ওয়ান পাউন থার্তিন শিলিং ওন্‌লি।'

'নো মানি। টেক সিক্স শিলিং।'

'ইজ ইত বিজনেস ? নো বিজনেস! পুওর বিজনেস। কোল্‌দ বিজনেস।'

'নো হত বিজনেস। ভেরি কোল্দ বিজনেস। দিস্ প্রেজেন্তে-শন মিস্তার—গিব্ তু সুইত হার্ত। তেক্ এ্যাত ফ্যান্সি প্রাইস।'

রায় বুকে হাত দিয়ে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বলল, 'নো সুইট হার্ট! নো মানি! টেক সিক্স শিলিং।'

এইবার দোকানদারের মেজাজ চড়ল। তিরিক্ষি হয়ে বলল, 'এবার বত্ এনিথিন মিস্তার?'

রায় চটে উঠে বলল, 'আই ক্যান বাই ইভন্ ইউ—ডু ইউ নো?'

ঝুনো হাজরা তাড়াতাড়ি বলল, 'এই রায়, করছ কী? চোটো না।'

দোকানদার বলল, 'আই ক্যান সেল ইভন্ ইউ, তু ইউ নো?'

রায় আস্তিন গুটোতে শুরু করল। দোকানীও।

ঝুনো হাজরা তাড়াতাড়ি মাঝখানে পড়ে দু'জনকেই শান্ত করে সাত শিলিঙে রফা করে দিয়ে হাত মিলিয়ে দিল।

দোকানদারটা একগাদা পেতলে বাঁধানো দাঁত বার করে হাসতে হাসতে বলল, 'ইফ ইউ হ্যাব নত্ সুইত হার্ত মিস্তার, নাউ ইউ উইল গেত এ সুইত হার্ত। আই প্রে!'

শফিক শাবান বললেন, 'শিখলেন তো? তার পর শুনুন। কোনো কোনো মক্কেল আবার আরো ঘুঘু। আপনার চেহারা, দরাদরির ধরণ দেখেই বুঝে নেবে আপনি জাহাজে ঘুরে ঘুরে ঝানু হয়েছেন, না, এই প্রথম যাত্রী। এদের ফাঁদে পড়েছেন কী একেবারে জবাই করে ছেড়ে দেবে। দরাদরির ফাঁকে হঠাৎ আপনাকে একবার একটু নির্জনে ডেকে নিয়ে গিয়ে কানে কানে বলবে, ইতিজ ওনলি ফর ইউ মিস্তার, আই গিভ্ ইউ দিস কুশন এত্ সেবেন পাউন। দোন্ত তেল্ আদার, ইউ এগ্জেক্তলি

লুক লাইক মাই দেদ ব্রাদার। আসল দাম বোধহয় এক পাউণ্ড!'

বেচারী ফৈজাবাদী দেখলুম চোখের সামনে এই ইঁদুর কলে পড়ল আর একেবারে ক্যাঁচ হয়ে গেল!

শাফিক শাবান কানে কানে বলে দিলেন, 'যে তাকে জবাই করবে ভেড়া শুধু তাকেই বিশ্বাস করে!'

হঠাৎ ভীড়ের মাঝে একটু দূরেই চোখে পড়ল সোনিয়া একেবারে কোমর বেঁধে এক দোকানদারের উপর মারমুখো হয়ে উঠেছেন। দোকানদারটা ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গিয়ে চোখদুটি ছানাবড়া করে তাঁর অগ্নিমূর্তির দিকে চেয়ে আছে।

সোনিয়ার হাতে, কাঁধে, বগলে কোথাও আর তিল ধারণের জায়গা নেই। এ্যালবামে, কুশনে, ব্যাগে, মালায়, খেলনায়, ছোট্ট কার্পেটে, পিকচার-পোষ্টকার্ডে, ঝিনুক বসানো রঙীন প্লেটে একেবারে ঢাকা পড়ে গেছেন—অর্থাৎ দু'চোখে যা পড়েছে তাতেই ছোঁ মেরেছেন। আর দোকানদারটাকে চুপ করে থাকতে দেখে বুঝলুম সে নিশ্চয়ই আচ্ছা করে তাঁর মাথায় কাঁঠাল ভেঙেছে, তাই চুপচাপ আছে। কোথায় ঘোড়ায় চাপাতে হয় আর কোথায় ঘোড়া থেকে নামতে হয় সেটা এই ডেকের কাপ্তানরা খুব ভালো করেই জানে।

ড্রিমিদভ ছেলে কোলে করে ওই দিকে ডেকে রেলিং ধরে উদাস হয়ে সমুদ্রের দিকে চেয়ে চেয়ে সিগারেট টানছেন। ভাবখানা সোনিয়াকে যেন তিনি চেনেনই না—সোনিয়া আমার কে যে তার পাগলামীতে আমি কান দোব বা লজ্জা পাব!

শফিক শাবান চুপিচুপি বললেন, 'এই রে, পাগলী ক্ষেপেছে! চলুন তো গিয়ে দেখি কী ব্যাপার?'

গিয়ে শুনলুম দোকানদারের অপরাধ হচ্ছে এই যে, সব

জিনিষপত্র পছন্দ করে কেনার পর সে উটের চামড়ার একটা কভার বার করে দেখিয়ে সোনিয়াকে বলে 'তেক্ মাদাম, দিস বাইবেল-কভার, সি দি পিকচার,—হোলি মাদার মেরী এন্দ হোলি যীসাস লদ্, ওনলি ওয়ান পাউন।'

বাইবেল-কভার শুনে সোনিয়া সেটি তার হাত থেকে লুফে নেন। কিন্তু নিয়ে তার উপরে আঁকা সেই মেরী আর যীসাসের ছবিখানা দেখে তাঁর মাথায় নরকের আগুন জ্বলে উঠেছে।

কভার খানা সামনে মেলে ধরে ফরিয়াদ করলেন, 'আপনারাই বিচার করুন—এই কী যীসাস? এই কী মেরী? মেরী হবেন দেবীর মত জ্যোতির্ময়ী, যীসাস হবেন দেবশিশুর মত জ্যোতির্ময়! সে জায়গায় ওই বজ্জাত দোকানদার দেখুন, এখানে মেরকে করেছে চাষী মেয়ের মত, যীসাসকে করেছে রাখাল ছেলের মত। এ সব দুশমনি—আমি কী বুঝি না! নিজে খৃষ্টান নয়, তাই এই নচ্ছার দোকানদার ইচ্ছে করে মেরী আর যীসাসকে এ রকম বিশ্রী করে এঁকেছে। মেরী আর যীসাসকে নিয়ে খেলা!'

মনে মনে বললুম, ভাগ্যি তিনি গঁগার 'ইয়োলো ক্রাইষ্ট' দেখেননি! তা'হলে গঁগারও চোদ্দ পুরুষ উদ্ধার করে ছাড়তেন!

শফিক শাবান তাঁকে অনেক বোঝাতে চেষ্টা করলেন যে, আসলে দোকানদার ছবিটা আঁকেনি, কভারটা তৈরী হয়েছে অন্য জায়গায়, দোকানদার যাত্রীদের কাছে বিক্রী করার জন্যে তাদের কাছ থেকে কিনে নিয়ে এসেছে। সুতরাং দোকানদারের কোনো দোষ নেই।

কিন্তু হিতে বিপরীত হল। নেভাতে গিয়ে আরো জ্বলে উঠলেন। কখনো বললেন, 'আপনি কী আমায় পাগল বোঝাচ্ছেন? আমি বুঝি না!' কখনো বললেন, 'আপনিও ও'দের দলে?' অর্থাৎ এত্ তু ব্রুতাস!

শেষে শফিক শাবান নিরুপায় হয়ে দোকানদারটাকে চোখ টিপে চটেমটে তার ঘাড় ধরে বললেন, 'তবে রে হতভাগা! তোর এত বড় আস্পর্দা যে হজরত ঈসা আর বিবি মরিয়মকে এ রকম বিশ্রী করে আঁকতে সাহস করেছিস? ঈসা আর মরিয়মের সাথে দুশমনি! তুই যে দোজখেও জায়গা পাবি না। দাঁড়া বজ্জাত, দেশে ফিরে তোকে আমি জেলে পাঠিয়ে তবে ছাড়ব।'

সোনিয়া মহা খুশী। চোখেমুখে সব আগুন আলো হয়ে উঠল। রাঙা ঠোঁট থেকে এক গাদা হাসির মুক্তো ছড়িয়ে পড়ল। কভারটা দোকানীকে ফিরিয়ে দিতে দিতে হেসে গড়িয়ে পড়ে শাবানকে বললেন, 'বড় ভালো লোক আপনি সাধে কী আর আপনাকে এত সুনজরে দেখি।'

তার পর দোকানীকে ধমক দিয়ে বললেন, 'এই হতভাগা, শোন্, আর কক্ষনো মেরী আর যীসাসকে নিয়ে এ রকম কাজ করিস না, বুঝলি? শুনলি তো উনি কী বললেন? নরকেও জায়গা হবে না। দুশমনি করবি কর অন্য লোকের সাথে কর। মেরী আর যীসাসের সাথে দুশমনি!'

চেয়ে দেখি জ্ঞানের বড়ি খেয়ে দোকানদারের চোখদুটো দু'দিকে ছিটকে গিয়ে এমনি ট্যারা হয়ে গেছে যে, বেচারীকে বিয়ের দিনে গাধার আস্তাবলের দিকে চাইতে বললে তবে তার বৌয়ের সঙ্গে চোখ মিলবে!

এমন সময় জাহাজের শিখর থেকে মাইকে করে ঘোষণা হ'ল, 'আতুচ্চে, আতুচ্চে প্লিজ—'

আতুচ্চে হয়ে শুনলুম, জাহাজ আর দশ মিনিট পরেই সুয়েজ বন্দর ছেড়ে যাবে।

সঙ্গে সঙ্গে জিনিষপত্র গুটিয়ে দোকানদাররা সব ডেক থেকে ভোজবাজির মত অদৃশ্য! জিনিষপত্র সব ঝুড়িতে ভরে দড়ি বেঁধে

নীচের নৌকোয় নামিয়ে দিয়ে নিজেরা দড়ির মই বেয়ে নেমে গেল।

বছরের পর বছর এই করে করে এ সব এ'দের কাছে ম্যাজিকের মতোই হয়ে গেছে।

দু'একটা ছোটোখাটো দোকানী ডেকেই রয়ে গেল। শফিক শাবান আবার একটি জ্ঞানের গুলি খাওয়ালেন। দোকানীদের দেখিয়ে বললেন, 'এরা সব সন্ধ্যেয় নামবে পোর্ট সঈদে। জানেন তো পোর্ট সঈদ বড় রসালো জায়গা? অপ্সরাদের স্বর্গ চারিদিকে। এরা সব আসলে দোকানীর ছদ্মবেশে সেই সব স্বর্গের দালাল। এ'দের কাছে সে সব মেয়েদের ফটোও থাকে। এরা অনেক সাবধানে সেই সব মেয়েদের ছবি দেখিয়ে যাত্রীদের লোভে ফেলে তার পর জাহাজ পোর্ট সঈদে থামলে তাদের সেই সব স্বর্গে নিয়ে যায়। অনেক যাত্রী অবশ্য নিজে যেচে এ'দের ফাঁদে পড়ে। জানেন তো কত রকম চরিত্রের লোক একটা জাহাজে থাকে।'

জাহাজ ধীরে, গম্ভীরে সুয়েজে পড়ল।

দুই পারে ধু ধু মরু প্রচণ্ড রোদে একেবারে বিশ্বজোড়া তৃষ্ণা মেলে হা হা করে জ্বলছে। সেদিকে তাকায় কার সাধ্য! চোখ আপনা আপনি বন্ধ হয়ে আসে। শ্রাবণের বর্ষণ মুখর নিশিথে, কালবৈশাখীর সন্ধ্যায় নটরাজের প্রলয়নাচন অনেক দেখেছি। আজ তিনি সেই দারুণ নাচের ছন্দে মেতে ওঠেননি বটে, কিন্তু তাঁর অগ্নিজটা আকাশ পাতাল ছেয়ে ছড়িয়ে পড়ে বিশ্বজুড়ে প্রলয় আগুন লেগে গেছে। শুধু এর মাঝে সবুজ সুয়েজ তার ভিজে আঁচলখানি আমাদের চোখে, মাথায়, কপালে বারবার বুলিয়ে বুলিয়ে সেই প্রচণ্ড দাহ থেকে বাঁচিয়ে রাখছে।

পাঞ্জাবের পথে, পাঞ্জাব থেকে করাচীর পথে, আরব সাগরে, লোহিত সাগরে ধরিত্রীর রুদ্রমূর্তি অনেক দেখেছি, কিন্তু এইখানে এসে যেন তিনি তাঁর রুদ্রতম মূর্তি দেখালেন। আমরা চোখ বন্ধ করে ফেললুম।

শফিক শাবান বললেন, 'এই যে সুয়েজ দেখছেন—একজন নয়, দু'জন নয়, এক লক্ষ্য কুড়ি হাজার মিশরবাসী এই সুয়েজের জন্যে প্রাণ দিয়েছে। তাদের কথা কে'ই বা জানে! ইতিহাসে তাদের কথা লেখা নেই, নাম হয়েছে লেসেপ্সের। তার নাম লোকের মুখে মুখে। এই যে সুয়েজের জল তলতল, ছলছল করে বয়ে চলেছে—এ জল নয়, আসলে এ কী জানেন? আসলে এ সেই এক লক্ষ্য কুড়ি হাজার মিশর বাসীর রক্তের ধারা। পাছে লোকে তাদের চিনতে পারে তাই লেসেপ্স যেন এর লাল রং ঢেকে দিয়ে সবুজ করে দিয়েছে। কোনো এক গভীর রাত্রে এ'র তীরে বসে কান পেতে শুনলে, শুনতে পাবেন এর এই বোবা ভাষা যেন গুমরে গুমরে কেঁদে কেঁদে সেই কথা সবাইকে বলে দিতে চাইছে। আমি শুনেছি। অনেক রাত আমি এই সুয়েজের পারে বসে কাটিয়েছি।'

আরো কী বলতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু চালাতে পারলেন না। ওপার থেকে মরুভূমির উপর দিয়ে আগুনের হল্কা এসে আমাদের যেন ঝলসে দিল। আমরা টলতে টলতে ডেকের ও পারে চাঁদোয়ার তলায় গিয়ে হেলানো চেয়ারে চোখ বন্ধ করে শুয়ে পড়লুম।

॥ দশ ॥

কেবিনে ফিরে আসার পথে চোখে পড়ল দীনা তার ছোট্ট ঘরটির সামনে দরজা ধরে আনমনে দাঁড়িয়ে আছে। তার চোখদুটি ভিজে। চুল উস্কোখুস্কো। মুখখানি বিষাদের নীল ছায়ায় সন্ধ্যার মত থমথম করছে। অভিমানী মেয়ে যেন মায়ের কাছে বকুনি খেয়ে রাগ করে ঠোঁট ফুলিয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

শুধোলুম, 'কী হয়েছে?'

বলল, 'আজ সকালে আমার এক বন্ধুর চিঠিতে মায়ের খবর পেয়েছি। তাঁর অবস্থা ভালো নয়। ডাক্তার জবাব দিয়ে দিয়েছে।'

ব্যস্ত হয়ে শুধোলুম, 'কী হয়েছে?'

অশ্রুখচিত, কথায় ভরা সরল চোখদুটি আমার চোখের দিকে মেলে নীরবে আমার হাতে একখানি খাম দিল।

বললুম, 'আমি তো ইটালিয়ান জানি না। তা ছাড়া অন্যের চিঠি আমি পড়বই বা কেন?'

নীরবে খামটি ফিরিয়ে নিয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল, কোনো জবাব দিল না।

মনে পড়ল এডেনে যখন জাহাজ থেমেছিল এক বুড়ী মেমকে পার্সারস্ অফিসের দরজা ধরে কাঁদতে দেখেছিলুম। তাঁর হাতে ছিল এক টেলিগ্রাম। নিশ্চয়ই কোনো খারাপ খবর পেয়েছিলেন।

মিথ্যে কেঁদে উতলা হয়ে কোনো লাভ নেই, কারণ, 'কে সেরা

সেরা'—অর্থাৎ যা হ'বার তা হবেই। কিন্তু এ কথা কে তাকে বোঝাবে, কে'ই বা তা বোঝে! তবুও তাকে মিথ্যে অনেক সানন্তনা দিয়ে কেবিনের দিকে পা বাড়ালুম।

সে সেই দরজা ধরে ঠিক তেমনি করেই একখানি শিশির ভেজা পদ্মের মত দাঁড়িয়ে রইল।

একটু দূরে এগিয়ে এসে একবার পিছন ফিরে দেখলুম মা যেমন করে অভিমানী আদুরে মেয়ের মাথায়, গালে, থুতনিতে হাত দিয়ে আদর করেন সোনিয়া ঠিক তেমনি করে দীনাকে আদর করছেন আর সানত্বনা দিচ্ছেন।

সোনিয়ার মুখে সেই ক্ষনিকের জন্যে মাতৃত্বের যে বেদনাময় গম্ভীর অপরূপ রূপ চোখে পড়ল তার ছবি আঁকতে পারি সে রকম কোনো যাদু আমার কলমে নেই। দুটি চোখ একেবারে মুগ্ধ হয়ে গেল।

শফিক শাবান জ্ঞানের আঙুর খাইয়ে আগেই জ্ঞানচক্ষু খুলে দিয়েছিলেন, সন্ধ্যার দিকে সেই চোখ নিয়ে ডেকে যেতেই দেখি এক নির্জন কোনে দাঁড়িয়ে আছে ফৈজাবাদী ভায়া আর তার পিছনে লেগেছে এক দোকানী। একেবারে ছাপমারা চেহারা। দেখলেই বোঝা যায় কোন জাতের জীব। কারন, যে দেবদেবীদের আমরা পূজো করি তার ছাপ আমাদের মুখে পড়ে যায়। তার উপর আমার তখন তৃতীয় নেত্র ধক্‌ধক্ করছে! আমাকে দেখেই লোকটা চট করে সরে গেল।

ফৈজাবাদীকে জিগেস করে জানতে পারলুম, 'পহেলে উ সালা কোড্‌পে কেয়া সব্ বাতায়া হম নেহি সম্‌ঝা। উসকে বাদ সালা পাকিটসে এক লাড়কিকো ফোটু নিকালকে বোলা ও ফোটু এক টার্কিস গার্লকো হ্যায়—আগার ম্যায় যানে চাহ্‌তা তো উ সালা

হামকো পোর্ট সঈদমে ও লাড়কিকো পাস লে যানে স্যাকতা !'

পোর্ট সঈদ তখনো দশ মাইল।

শুধোলুম, 'যাতা হ্যায় না কী ?'

ছহাই গালে চাঁটি মেরে, নাক মলে, কান মলে, জিভ কেটে বলল, 'আরে, তোবা তোবা। সালাকো আভি মিলেগা তো এক চপ্পল লাগাকে দরিয়ামে ফেঁক দেঙ্গে। ঘরপে মেরা বিবিকো ফেঁককে আয়া, আগার ও স্থনেগি ইয়ে বাত তো কেয়া বোলেগি বলিয়ে তো ইমাম সাব ?'

দেখতে পেলুম বিবির কথা বলতে বলতে চোখ ছলছলিয়ে উঠেছে। একটু চুপ করে থেকে বলল, 'ইমাম সাব মেরা বিবিকা এ্যায়সি লাড়কি আজকালকা জামানামে ম্যায়নে নেহি দেখা। এ্যায়সি সিম্‌পিল হ্যায়, এ্যায়সা হামকো বিলিভ করতি, আওর এ্যায়সি হামকো পিয়ার করতি জো কেয়া বোলেগা ! আপই বাতাইয়ে ইমাম সাব, উ সালেকো বাতপে ভুলকে মেরা পিয়ারী বিবিকো পাস ম্যায় ট্রেটর হুঙ্গা ? সালা বদ্‌বখত্‌ কাঁহাকা ! মারেগা খিঁচকে এক ঝাপড়। ম্যায়নে এক বাত সোচতা হুঁ ইমাম সাব, আপ জরা এ্যাডভাইস দিজিয়েগা ?'

'আবার কেয়া এ্যাডভাইস ?'

'ম্যায় সোঁচতা হুঁকেয়া ইংলণ্ডপে পৌঁছকেই মেরা বিবিকো ভি লে আউঙ্গা। বিবিকো ছোড়কে ম্যায় এ্যায়সা হো গিয়া ইমাম সাব, কী, মালুম হোতা হাম নেই বাচেগা। বাতপে নিন্‌ভি নেই হোতা—খালি উসিকো বাত সোঁচতে সোচতে সুবে সাদেক হো যাতা। উসকো মেরা পাস নেই দেখনে সে কোই কামপে মেরা 'নিস্‌পিরেশনই নেই মিলতা। মালুম হোতা কেয়া উসকো ছোড়কে ম্যায়নে দেমাগ ঠাণ্ডি করকে ডক্টরেট ভি নেই করনে স্যাকেগা। আপকো কেয়া এ্যাডভাইস হ্যায় ? লে আয়গা ?'

বললুম, 'আলবৎ লে আইয়ে। ইংল্যাণ্ডে পৌঁছেই বিবিকো খত্ ছোড় দেনা কী জলদি চলে আও। আমারো মত ওই হ্যায় যে বিবিকো ছোড়কে আপ ডক্টরেট করনে নেই স্যাকিয়েগা। বিবিকো ছোড়কে যখন কোনো কামে 'নিস্‌পিরেশনই নেই মিলতা—'

মহা খুশী হয়ে কেঁদে ফেলে বলল, 'হাঁ ইমাম সাব, ইংলণ্ড পে পৌঁছকেই ম্যায উসকো খত্—নেই ইমাম সাব, খত্ নেই, এক টিলিগিরাফ ছোড় দেগা, কী, আও, তুম হাওয়াই জাহাজপে উড়কে মেরা পাস চলা আও। দেখিয়েগা ইমাম সাব, মেরা বিবিকো ফোট দেখিয়ে গা?'

বললুম, 'কায় নেই? জরুর দেখেগা।'

'তো কেবিনপে চলিয়ে'

চেয়ে দেখি ডেকের অপর প্রান্তে এক পাল আমেরিকান যাত্রীর সঙ্গে সেই দোকানীর ছদ্মবেশী পোর্ট সঈদের কয়েকজন দালালের কী সব ফিসফাস, দরাদরি, ছবি দেখাদেখি চলেছে!

একে মার্কিন তাতে আবার পোর্ট সঈদ্!

ফৈজাবাদীর সঙ্গে চললুম তার বিবির ফোট দেখতে।

ততক্ষণে বেশ অন্ধকার হয়ে এসেছে। নীচেয় নামতে হলে লাউঞ্জের ভিতর থেকে সিঁড়ি পাওয়া যায়।

লাউঞ্জে পা দিতেই শুনি এক বজ্রহুঙ্কার, 'কে র‍্যা?'

সঙ্গে সঙ্গে ফৈজাবাদী উধাও।

থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে লাউঞ্জের আবছা আলো আঁধারে অবাক হয়ে দেখলুম লাইট হাউসের পাগলা বুড়ো জনসন।

লম্বা চুলদাড়ীর জঙ্গলের মাঝখানে চোখ দুটো অঙ্গারের মত ধকধক করছে। গায়ে লম্বা আলখেল্লার মত কী।

যেন বাইবেলের ওল্ড টেষ্টামেন্টের পাতা থেকে হঠাৎ জীবন্ত হয়ে উঠে এসেছেন কোনো এক ক্রুদ্ধ প্রফেট।

কাঁপতে কাঁপতে হঠাৎ খপ্ করে আমার একটা হাত ধরে ফেলে বললেন, 'বলতে পারিস ভাগ্য কী? জীবন কী? মৃত্যু কী? কেন এ সব আছে? আমি কে? তুই কে? কাল যে ছিল আজ সে কেন নেই? কোথায় গেল? কোথায় যাত্রা শেষ? কর্ণধার কই? ভাগ্য? ঠিক বলেছিস,—সব মিথ্যে, সব ফাঁকি, সব—সব। সত্যি শুধু ভাগ্য—অন্ধ ভাগ্য! যেখানে ইচ্ছে আমাদের কান ধরে টেনে নিয়ে চলেছে। উপায় নেই, এ'র ফাঁদ থেকে বাঁচার উপায় নেই। কোথায় চলেছি, কী হবে কিছুই জানি না। তাই আমরা শুধু হাজার স্বপ্ন দেখি আর এই ভাগ্য আড়ালে বসে সব উল্টেপাল্টে দেয়। একে যে স্বীকার করে না সে পাগল—সে একটা মস্ত পাগল! পাঁচ হাজার বছর— বুঝলি, পাঁচ হাজার বছর ধরে আমি ভাগ্যের হাতে মানুষের এই পুতুলনাচ দেখে চলেছি। কিছু থাকবে ভেবেছিস? কিচ্ছু না। যা ছিল সব গেছে, যা আছে তাও থাকবে না। এই সর্বনাশা অন্ধ ভাগ্য সব জ্বালিয়ে পুড়িয়ে শেষ করে দেবে। পাঁচ হাজার বছর ধরে আমি সন্ন্যাসী হয়ে ঘুরে চলেছি—কখনো রাত কাটিয়েছি রাজার প্রাসাদে, কখনো পান্থশালায়, কখনো চাষার কুটিরে; দেখেছি সব মিথ্যে, পাঁচ হাজার বছর ধরে দেখেছি সব মিথ্যে— শুধু একটি জিনিষ সত্যি—মানুষ অন্ধ ভাগ্যের হাতের পুতুল—সে আমাদের খেলনা করে যেমন ইচ্ছে খেলছে। যেখানে গেছি শুধু এই একটি জিনিষ চোখে পড়েছে—চাষার কুটিরে, রাজার প্রাসাদে, পান্থশালায়। শুধু একদিন, বহু হাজার বছর আগে শুধু একদিন তাকে দেখেছি—সেই একদিন গভীর চাঁদনি রাতে ইউফ্রেটিস থেকে নীলনদীর পথে সোনালী মরুভূমিতে তাকে দেখেছি! শুধোলুম, কে তুমি? ঘোমটায় মুখ ঢাকা ছিল। বলল, আমি সেই চির রহস্যময়ী, যাকে তুমি হাজার বছর ধরে খুঁজেছ। শুধোলুম,

ওরা কোথায়? ঘোমটার ভিতর থেকে উত্তর দিল, ওরা নেই। এক ছেলে মরেছে ক্রুসে, এক ছেলে বেরিয়ে গেছে পাগল হয়ে, আর এক ছেলে এখনো জন্মায়নি—শুধু জীবন পাবার জন্যে আমার মধ্যে কাঁদছে। চিৎকার করে বললুম, দাও, দাও, ওগো রহস্যময়ী, হাতে আমার আলো তুলে দাও, পাঁচ হাজার বছর অন্ধকারে আমি পথ ঘুরে মরছি। বলল, আলো নাই, আলো নাই, আছে শুধু অনন্ত অন্ধকার আর জীবনব্যাপী অজানা অভিসার!'

তার পর হঠাৎ থেমে গিয়ে জ্বলন্ত দৃষ্টে আমার মুখের দিকে খানিকক্ষণ চেয়ে থেকে হা হা করে হেসে কুটি কুটি হয়ে যেতে যেতে বললেন, 'ভয় পেয়েছে! হা, হা, হা! এটা ভয় পেয়েছে রে! ভীতু কোথাকার! পালা, পালা, শিগ্রী পালা'—হাসতে হাসতে নিজেই পালিয়ে গেলেন।

পাগলা সন্ন্যাসী যেন হেসে কুটি কুটি হয়ে যেতে যেতে আপন গুহায় ফিরে গেলেন—যেখানে তাঁর যুগযুগান্তের ধ্যানের আসন পাতা আছে।

হত বুদ্ধির মত দাঁড়িয়ে ছিলুম, এমন সময় শুনি 'বুড়ো আজ আপনাকে ধরেছিলেন বুঝি?' দ্রিমিদভ। বললেন, 'অনেকক্ষণ থেকেই দেখছিলুম। এমনি দিনের পর দিন কথাটথা বলেন না, যেন পাথরের মূর্তি। তার পর হঠাৎ একদিন কাউকে পাকড়াও করে ওই সব আবোল তাবোল বকেন। অন্তত আমি তো সেই হংকং থেকেই তা'ই দেখছি। কী মনে হল--পাগল?

ধীরে ধীরে মাথা নেড়ে বললুম, 'না।'

দ্রিমিদভ বললেন, 'ঠিক বলেছেন। বুড়োর সব কথা একদম হেসে উড়িয়ে দেওয়া যায় না।'

দেখতে পেলুম ফৈজাবাদী সিঁড়ির দরজা থেকে ভয়ে ভয়ে উঁকি দিয়ে দেখছে।

বুড়ো নেই দেখে বুক ফুলিয়ে এগিয়ে এসে বলল, 'বুড্ডা কোন হ্যায়, ইমাম সাব? পয়ছানতেঁহেঁ?'

বললুম, 'হাঁ।'

'বিলকুল দেমাগ গড়বড় হ্যায়। বাপরে বাপ! এ্যায়সা গর্জন কিয়া যো মালুম হুয়া য্যায়সা কী, শের-বব্বর হ্যায়! আভি সামনে মিলেগা তো চুটিয়া পাকাড়কে বুড্ডেকো দরিয়াপে ফেঁক দেঙ্গে। চলিয়ে ইমাম সাব, বিবিকা ফোটু—'

একটু খিঁচিয়ে বললুম, 'যাতা হ্যায় রে বাবা, যাতা হ্যায়।'

ত্রিমিদভ বোধহয় বুঝলেন। বললেন, 'আচ্ছা আপনি যান।'

এমন সময় কানে এলো, 'আতুচ্চে আতুচ্চে. প্লিজ—'

আতুচ্চে হয়ে শুনলুম ঘোষণা করছে, 'জাহাজ পোর্ট সঈদে পৌঁছলো। পোর্ট সঈদে জাহাজ সারা রাত থাকাব কথা ছিল, কিন্তু তা থাকবে না। রাত বারোটার সময়ই ছেড়ে যাবে। সুতরাং যাত্রীরা শুনে রাখুন, যাঁরা পোর্ট সঈদ দেখতে নামবেন, তাঁদেরকে এগারোটার আগেই জাহাজে ফিরে আসতে হবে।'

তখন ঘড়ীতে সাতটা।

বন্দর পোর্ট সঈদের জন্যে এই দীর্ঘ পথ যারা হন্যে হয়ে ছিল সেই সব রসিক যাত্রীরা খবরটা শুনে নিশ্চয়ই 'রেগে আগুন তেলে বেগুন' হলেন।

মোটে চার ঘণ্টা মেয়াদের জন্যে কে ক্যাপ্টেনের উপর মারমুখো হ'ল, কারা আস্তিন গুটোলো সে সবের সন্ধান না করেই ফৈজাবাদীর সঙ্গে চললুম বিবির 'ফোটু' দেখতে।

কে একজন পাশ থেকে যেতে যেতে বলল, 'এত পোর্ট থাকতে বেছে বেছে পোর্ট সঈদেই সময়ের মেয়াদ ক্যাঁচ করে কাঁচি ছাঁট ছেঁটে দিলে, বাবা? সারা রাত থাকলে কী তোমাদের বাইবেল অশুদ্ধ হয়ে যেত?'

আর একজন তেলোক্তে খুঁষি মেরে উত্তর দিল, 'দুশমনি, বুঝলেন না, সেরেফ দুশমনি।'

পোর্ট সঈদে পৌঁছতেই রাতের আলো আঁধারে আবার দোকানীরা সব জাহাজের চারিপাশে নৌকো ভিড়িয়ে দিল। অল্প সময় জাহাজ বন্দরে থাকবে বলে এখানকার দোকানীরা সুয়েজের মত দড়ির মই বেয়ে উপরে উঠে না এসে নৌকো থেকে জাহাজের ডেকের উপরে হুক বাঁধা মোটা মোটা দড়ি ছুঁড়ে দিল। সে দড়ির নীচেয বাঁধা আছে ঝুড়ি। ডেকের রেলিঙে দাঁড়িয়ে নীচের নৌকো'র স্বল্প আলোয় দেখে যদি কোনো জিনিষ পছন্দ হয় তবে দোকানী সেটি সেই ঝুড়িতে ভরে দেবে, যাত্রীরা টেনে উপরে তুলবেন। তার পর আবার সেই ঝুড়িতে করেই পয়সাও নীচেয় নামিয়ে দেবেন।

অনেকেই দল বেধে পোর্ট সঈদে নেমে গেলেন। লক্ষ্য করে দেখলুম তাঁদেব মধ্যে বেশীব ভাগই ইয়াঙ্কি! আমরা যারা জাহাজে রইলুম সবাই ভীড করে এসে দাঁড়ালুম ডেকেব রেলিঙে। নীচেয় নৌকোর দোকানীদেব সঙ্গে উপরেব যাত্রীদেব চেঁচামেচি করে মজাদার দরাদরি গালাগালিব গুলি ছোঁড়াছুড়ি শুরু হ'ল। আলো আঁধারে নৌকো থেকে ডেকে, ডেক থেকে নৌকোয দড়ি বাঁধা ঝুড়ি ওঠা-নামা করতে লাগল। ঝানুরা দোকানীদের গলা কাটল। দোকানীরা কাঁচাদের মাথা মুড়লো।

যে সব দোকানীর ভাগ্যে খদ্দেব জুটল না তারা উদাসীন যাত্রীদের টনক নড়াবার জন্যে উপরে ডেকের দিকে চেয়ে চেয়ে নৌকোয় দাঁড়িয়ে যত রকম ভাবে পারা যায় ভাঙা ভাঙা বিভিন্ন বিচিত্র ভাষায় বৃথা চিৎকার লাফালাফি করে যেন নিজেদের মাথার চুল ছিঁড়তে লাগল।

বিনা টিকিটে মজা দেখতে দেখতে চার ঘণ্টা সময় কখন পেরিয়ে গিয়েছে হুঁশ ছিল না, চমক ভাঙ্গল 'অতুচ্চে, আতুচ্চে প্লিজ' শুনে।

জাহাজ পোর্ট সঈদ ছেড়ে চলল।

দূরের দিকে চেয়ে দেখলুম একদিকে রাত্রির অন্ধকারে হাজার রঙের আলোয় আলোয় মায়াময়ী, মোহময়ী হয়ে উঠে বন্দর পোর্ট সঈদ যেন তার রং মাখা অপ্সরাদের মতই জাহাজের যাত্রীদের ভুলিয়ে ডাকছে, এস, এস আমার এখানে এস।

আর একদিকে বহু দূরে অসিম আঁধার সাগরের মাঝখানে মধ্যে মধ্যে একেকটা জাহাজ রঙীন আলোর মালা জড়িয়ে ভাসমান স্বপ্নরাজ্যের মত যেন নিরুদ্দেশে ভেসে চলেছে।

সমুদ্রের হুহু হাওয়ায় ভয়নক শীত করতে লাগল। গায়ে গরম কাপড় ছিল না। তা ছাড়া রাতও অনেক হয়েছে। তাড়াতাড়ি ডেক থেকে কেবিনে ফিরে আসছিলুম। হঠাৎ কানে এলো মেয়েলী গলার খিলখিল হাসির শব্দ। আবছা দেখতে পেলম এত রাতেও ডেকের এক প্রান্তে—ও দিকটায় আলো-আঁধারে—পাশাপাশি জড়াজড়ি করে বসে আছে লিওনার্দো আর অরোরা।

॥ এগার ॥

শাবান একদিন বলেছিলেন, সব সাগরের রাণী হলো ভূমধ্য-সাগর।

তাই সুয়েজ পেরিয়ে ভূমধ্যসাগরে পড়ে যাচাই করে দেখলুম একেবারে বর্ণে বর্ণে সত্যি। তাঁর বর্ণনা মাফিক যেমন নীল, তেমনি শান্ত, তেমনি অসীম। সব সাগরের শুধু রাণীই নয়—মহারাণীও।

এর এই আশ্চর্য নীলের সঙ্গে তুলনা দিতে পারি এমন কোনো জিনিষ আমার জানা নেই। এমন কী এ রকম অনুপম অপরূপ নীলের কল্পনা করা যায় বলেও আমি জানতুম না। এ নীল ময়ূরের পাখার চেয়েও নীল! নীলপাখীর পালকের চেয়েও বেশমী নীল। এ'র নীল যেন তুলিতে করে তুলে অপূর্ব ছবি আঁকা যাবে।

জাহাজের ডেকে বসে এই এ কূল ও কূল দু'কূলহারা ঘুমন্ত নীল সাগরের একটানা গম্ভীর ভুবনভুলানো কলতান শুনে মনে হয় নতুন মা যেন তার শিশুকে দোলনায় দোল দিতে দিতে গুণ গুণ করে ঘুম-পাড়ানি গান গাইছেন। সে গান শুনে চোখের পাতায় একটু স্বপ্ন ভরা ঘুমের নেশা লাগে।

দিগদিগন্ত জুড়ে ছোট ছোট নীল ঢেউগুলো মাথায় রূপালি ফেনার মুকুট পরে তালে তালে অপূর্ব নাচ নাচছে ডেকে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মুগ্ধ হয়ে তাই দেখছি, এমন সময় ফৈজাবাদী খুশীতে উড়তে উড়তে এসে বলল, 'ইমাম সাব, আপ ইঁহা. আওর হম তামাম জাহাজ আপকো ঢুঁড়তা হ্যায়।'

বললুম, 'কী হুয়া, এতনা খুশী যে ?'

'ওই বোলনে লিয়েই তো আপকো পাস আয়া। আপকো কেবিনসে থোড়া সামনে বাঢ়কে ডাঁয়না হাঁথ জো রুম মে 'বেগোনা' লিখা হ্যায়, আপ দেখা না ?'

'হ্যাঁ। ও তো ইস্‌তিরি ঘর হ্যায়।'

'হাঁ। হম আজ ও ঘরমে পহ্‌লে গিয়া—হামারা কোট ইস্‌তিরি করনেকো লিয়ে। তো কেয়া হুয়া জানতেঁহে ? হম তো কভি আপনা হাঁথসে ইস্‌তিরি উস্‌তিরি নেহি কিয়া; ওই লিয়ে উল্টাবল্টা ইস্‌তিরি হোতা থা। তো ম্যাডাম সোনিয়া ভি ও ঘরমে থি। উ'ও আপনা বাচ্চেকো কাপড়া আওর আপনা ফ্রক ইস্‌তিরি করতি থি। হম কোট ইস্‌তিরি করনে নেই স্যাকতা দেখ্‌কে ম্যাডাম সোনিয়া হাসকে আংরেজীমে বোলা, আপ নেই স্যাকিযেগা, হামকো দিজিযে, হম কর দেতা। বোলকে দেখিয়ে ইমাম সাব, ম্যাডাম কাৎসা বেহ্‌তের ইস্‌তিরি কর দিয়া। হম তো তাজ্জব ইমাম সাব! ম্যাডাম হামকো জানতি ভি নেই! হম লোগকো দেস্‌কা আওরাত আওর বাহারকা আওরত্‌মে কেত্‌না ফারক্‌ দেখিয়ে ইমাম সাব।'

সোনিয়া ও'র কোটটা ইসতিরি করে দিয়েছেন তাই খুশীতে যেন নাচছে। খুশী হ'বারই কথা। তখনো ও'র সরল চোখ-দুটোয় কৃতজ্ঞতা উচ্ছ্বসিত হয়ে আছে।

অচেনা লোক হলেও ও'র আনাড়ি হাতের ইসতিরি দেখে ভারি কৌতুক বোধ করে বিদেশিনী সোনিয়া নিজের হাতে যত্ন করে ও'র কোটটা ইসতিরি করে দিয়েছেন এটা ভাবতে সত্যিই ভারি ভালো লাগল।

আমাদের দেশের কোনো ছেলে বা মেয়ের কাছে এতখানি ভদ্রতা আশাও করা যায় না। বিদেশীদের কথাই আলাদা।

ফৈজাবাদী বলল, 'চলিয়ে ইমাম সাব, ডাইনিং হলপে চলিয়ে। বারা বাজতা হ্যায়।'

খাবার টেবিলে বসে ক'দিন থেকেই আর চীনে সঙ্গীটির চাঁদমুখ দেখতে পাই না, তাই এক টানা মন্ত্রোচ্চারণের মত 'এ্যাল্লো স্যার, আউ আর ইউ? ওয়াত ড্রিং? ভাজিয়া, পুরীয়া, পাপাত্, ভেজিতেব্ল্ রাইস, দাল রাইস'—বলতে বলতে আমার পেতলে-বাঁধানো আর আধখানা দাতওয়ালা ওয়েটার আসতেই তাকে জিগেস করে জানতে পারলুম, 'চীনিম্যান দিস্এম্বার্কো পোর্তো সুয়েজ।'

তাই বল। চীনিম্যান দিস্এম্বার্কো পোর্তো সুয়েজ! আমি তো ভেবেছিলুম ভূমধ্য সাগর হয়তো চীনেকে এ্যায়সা কবি করে তুলেছে যে, সে তার এক কাঁধে ঝোলানো ছোট্ট ট্রাঞ্জিস্টার আর এক কাঁধে ঝোলানো ক্যামেরা টান মেরে খাটের তলায় ফেলে দিয়ে কেবিনের গোল কাঁচের জানালার সমনে দিন রাত কাগজকলম নিয়ে বসে আছে। কেউ তাকে সেখান থেকে টেনে তুলতে পারছে না।

তাই খাবার টেবিলে এখন শুধু আমি আর ফৈজাবাদী দুই মানিকজোড়।

এ্যাদ্দিন শুধোব শুধোব করে শুধোইনি, কিন্তু আজি মরিয়া হয়ে ওয়েটারকে শুধিয়ে ফেললুম, 'তোমার আধখানা দাত ভাঙলো কী করে?'

একটু লজ্জা পেয়ে লাল হয়ে বলল, 'ওয়াইপ ব্রোক স্যার।'

'এ্যাঁ! বৌ ভেঙে দিয়েছে! বল কী হে?'

'ইয়েস স্যার। ইউ দু নত্ নো হার! বাই দিস সি ব্রোক স্যার।' বলে ঘুঁষি পাকিয়ে দেখালো।

'কেন?'

'ইউ দু নত্ নো হাব, স্যাব। ফাযাব স্যার, বিযেল ফাযাব! অঁলওযেস আই গো হোম আপতাব মেনি দে সেলিং, সি সেজ মি, তেল মি ভিঙ্কি, দু ইউ থিঙ্ক ইতিজ আই হু ম্যাবিদ এ ফুল লাইক ইউ? অলযেস আই সে, নো মাই দিযাব, ইতিজ আই হু ম্যাবিদ ইউ। ওযান দে সি আস্কদ মি দি সেম থিং এন্দ আই সেদ ব্রেভলি, ইযেস, ইতিজ ইউ হু ম্যাবিদ মি মাই মোস্ত্ দিসওবিদিযেন্ত্ ওযাইপ, নত্ আই। আই ভিঙ্কি, সন্ অফ সোলজাব ফাদাব ফিযাব নত্ তু তেল ক্রুথ। এন্দ সি ব্রোক মাই তুথ, স্যাব'

যেন সাক্ষাৎ সক্রেটিস আব জানথিযাপ্পা, এ্যান্ড্রোক্লিস আর মিগাযেবা।

যত বেগুনে স্বামীদেব কপালেই যত আগুনে স্ত্রী জোটে দেখি। আগুনে স্বামী আর আগুনে স্ত্রী এক সাথে খুব কম দেখেছি।

ফৈজাবাদী এ সবে কান দিল না। দেখলুম সামনে মুবগিবোষ্ট নিযে উদাসীন হযে বসে আছে আব চোখদুটো একটু ছলছল কবছে বুঝলুম বিবহশোকে লাবেজান।

শুধোলুম, 'কী হুযা? খানা নেই?'

বলল, 'কেযা খাযগা। ইমাম সাব, মেবা বিবি জো বোষ্ট পাকাতি থি, উসকা পাস ই সব সিবফ্ বদ্দি মাল হ্যায, খানে নেই স্যাকতা।' তাবপব উটেব মত মুখ কবে খনিকক্ষণ বসে থেকে বলল, 'ইমাম সাব, আপকো পাস—'

'এক এ্যাডভাইস মাংতেঁহৈ—এই তো হ্যায?

অবাক হযে বলল, 'আবে বাপবে বাপ, ক্যাযসে পাকডেঁহেঁ আপ?'

বললুম, 'ও সুনকে আব কাজ নেই হ্যায়। আমাকে দেখকে

এত্তা ভক্তি যে আপকো কায় হুয়া সে তো হাম বুঝতে নেই পারতা। কেয়া এ্যাডভাইস, বলিয়ে?'

'উস্ রোজ জো আপকো বাতায়া কেয়া উ সালা নাউয়াকো নামপে কমপ্লেন করকে চীফ স্টুয়ার্ডকো পাস এক দরখাস্ত্ পেশ করে গা, ইয়াদ হ্যায়-য়?'

'হ্যাঁ তো—হ্যায় তো।'

'তো দরখাস্ত্ ম্যায়নে এক কিয়া। মগর চীফ স্টুয়ার্ডনে কেয়া বাতায়া জানতেঁহেঁ? বাতায়া উ সালা নাউয়া রেড আঁখে দেখাকে ঠিকই কিয়া, মেরাই কসুর হ্যায়।'

'হাঁ? এ্যায়সা বাতা দিয়া? চ্চ! চ্চ!'

'আপই বাতাইয়ে ইমাম সাব, ইয়ে কোই জাস্টিস্ হ্যায়?'

'কভিভ নেহি।'

'ওই লিয়ে সোঁচতেহেঁ কেয়া ইংলণ্ডপে পৌছকেই ই সালা জাহাজ কাঁপনিকো নামপে এক কেস করেগা। করেগা ইয়ে নেই করেগা সোঁচতে সোঁচতে রাতপে নিন্‌ভি নেই হোতা, আওর হজম ভি বিলকুল গড়বড় হো গিয়া। আপকো কেয়া এ্যাডভাইস হ্যায়?'

কী বিপদ! একদিকে কেসের ভাবনা, অন্যদিকে বিবির শোক—দুই মিলে গিয়ে না ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে লোকটা শেষে মরবে না কী! বেশ সুখেশান্তিতে বিবির সঙ্গে তাঁত বুনে তুই খাচ্ছিলি বাপু, কেন বন্ধুদের পাল্লায় পড়ে এঁড়ে গোরু কিনে কাল করতে গেলি!

বললুম, 'মেরা ভি এ্যাডভাইস ওই হ্যায়—লড় যাও।'

মহা খুশী।

এমন সময় ওয়েটার তোর্তা আর আপেল নিয়ে এসে বলল, 'রিমাইন্দ স্যার, ক্যাপ্তেন গিব ফেয়ারওয়েল দিনার তু নাইত।

ফরগেত্ নত্। তু নাইত্স্ মেনু-পিকচার ওয়ানদাফু স্যার, থ্রি দিফারেন্ত্। নত্ ওরি, আই ভিক্ষি গিব ইউ,—ইউ তেক্, অল ইউ তেক। এনাদার তোর্তা স্যার? অলরাইত স্যার। আই ব্রিং।'

শফিক শাবান খাপ্পা হয়ে এসে বললেন, 'আপনি এখনো বসে বসে সাত্বিক-ভোজন ভোজন করে আপনার ওই চিংড়ী-শরীরে নাদুসনুদুস ভুঁড়ি ফোলাচ্ছেন? ওদিকে ষ্ট্রম্বলি যে পার হয়ে যাবে।'

ধড়মড় করে উঠে দাঁড়িয়ে বললুম, 'চলুন—চলুন।'

জাহাজ ভারি মজার জায়গা। রথ দেখাও হচ্ছে, কলাও বেচা হচ্ছে।

ফৈজাবাদী বলল, 'ষ্ট্রম্বলী কেয়া হ্যায় ইমাম সাব?'

'ষ্ট্রম্বলী আগ্নেয়গিরীকা নাম নেই শুনা? ভলক্যানো— ভলক্যানো, ষ্ট্রম্বলী ভলক্যানো।'

'আগ্ নিকাল্তা?'

'হাঁ-হাঁ।'

বিশাল শফিক শাবান পুতুলের মত আমাকে টেনে নিয়ে চললেন। পিছু পিছু ফৈজাবাদীও আসতে লাগল।

ডেকে যাবার জন্যে সিঁড়ি ভেঙে যেই লাউঞ্জে পা বাড়িয়েছি অমনি দরজার আড়াল থেকে ঠিক সাপের মতই একটা হাত বেরিয়ে এসে খপ্ করে আমার গলা ধরে ফেলল, আর কিছু বোঝবার আগেই সঙ্গে সঙ্গে আড়াল থেকে বেরিয়ে এলেন লাইট হাউসের পাগলা বুড়ো জনসন।

সে কী হা হা করে হাসি! গলা ধরে বলেন, 'ধরে ফেলেছি। ধরে ফেলেছি। বোকাটা ধরা পড়ে গেছে! সেই থেকে ওৎ পেতে বসে আছি!'

তার পরেই হঠাৎ গম্ভীর হয়ে গিয়ে আমার চোখে জ্বলন্ত চোখ

রেখে দারুন উত্তেজনায় কাঁপতে কাঁপতে বললেন, 'আলো চাই? ভুল! আলো নাই। পাঁচ হাজার বছর আলো খুঁজেছি.—পাইনি! নাই. নাই, আলো নাই, আছে শুধু অনন্ত অন্ধকার আর জীবনব্যাপী অজানা অভিসার। যারা আলোর সন্ধান দিয়েছে তারা মস্ত চোর, মহা মিথ্যেবাদী—সব ভুয়ো, সব মিথ্যে, সব ফাঁকি—সত্যি শুধু আলো নাই, আলো নাই। আছে শুধু অনন্ত অন্ধকার আর সারা জীবনব্যাপী অজানা অভিসার।' বলেই অদৃশ্য!

দেখি ফৈজাবাদী নাই, কখন উধাও হয়েছে টেরও পাইনি। বোধহয় সাথে সাথেই ন্যাজ গুটিয়েছে। শফিক শাবান হক্‌চকিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। তাঁর পাশে ব্রিমিদভ, কোলে ছেলে। কখন জুটেছেন জানতে পারিনি।

ষ্ট্রম্বলী দেখবার জন্যে ডেকে তৎক্ষণে যাত্রীদের ভীড় জমে গিয়েছে।

আকাশে মেঘ আছে. কিন্তু মেঘমল্লার নেই। ফৈজাবাদীও এসে জুটল।

দূর থেকে ষ্ট্রম্বলীকে দেখে মনে হল তপস্বী ঋষি যেন মাথায় ধোঁয়ার জটা বেঁধে যুগযুগান্তর ব্যাপী কঠোর ধ্যানে পদ্মাসনে বসে আছেন।

হঠাৎ মেঘ কেটে গিয়ে রোদ পড়ে ষ্ট্রম্বলীর কালো গা চক-চকিয়ে উঠে রং খেলতে লাগল।

জাহাজ ক্রমশ কাছে গিয়ে পড়ল। অবাক হয়ে চেয়ে দেখলুম সেই আগ্নেয়-পাহাড়ের পদতল ছেয়ে সুন্দর সুন্দর ছোট ছোট বাড়ী একেবারে ছবির মতন সাজানো। অথচ মাথার উপরে জ্বালামুখ দিয়ে ধোঁয়া বেরিয়ে আকাশ কালো করে তুলেছে। আর মাঝে মাঝে

সেই কালো ধোঁয়ার সঙ্গে স্ফুলিঙ্গের ফুলঝুরি বেরিয়ে কালোয় ফুল ফুটিয়ে দিচ্ছে।

দেখলুম ষ্ট্রম্বলীর বাসিন্দারা সব পাহাড়ের ধার ঘেঁষে সবুজ নৌকোয় করে মাছ ধরছে।

দূর থেকে যাকে ধ্যানী সন্ন্যাসী বলে মনে হয়েছিল কাছ থেকে তাকেই ওই ধোঁয়ায় আর স্ফুলিঙ্গে আর ওই অদ্ভুৎ আলোছায়ায় মনে হল যেন দারুন চকচকে রঙীন আঁশওয়ালা এক ভয়ঙ্কর প্রকাণ্ড ড্র্যাগন আকাশ থেকে চন্দ্র সূর্য ছিনিয়ে আনবার জন্যে বিশাল পাখা মেলে ল্যাজে ভব দিয়ে আকাশে মাথা তুলে খাড়া দাঁড়িয়ে পড়েছে,—তবু নাগাল পাচ্ছে না বলে নিষ্ফল ক্রোধে তার হিংস্র চোখ থেকে, লক্‌লকে জিভ থেকে, নিঃশ্বাস দিয়ে আগুন বেরচ্ছে।

রায়ের সঙ্গে চোখোচোখী হতেই বলল, 'আর শুনেছেন ?'

বললুম 'কী ?'

'রাতে যে আজ ফেয়ারওয়েল ডিনারের পর ডেকে গানের জলসা হবে !'

'তাই না কী ? শুনিনি তো।'

'হ্যাঁ। যাত্রীরা যাঁরা গানবাজনা জানেন তাঁরা সবাই নিজের নিজের দেশের গানবাজনা শোনাবেন।'

শুনে শাফিক শাবান মহা খুশী।

রায় বলল, 'আপনি কিছু শোনাবেন তো ?'

শাবান বললেন, 'নিশ্চয়ই।' সঙ্গে সঙ্গে পকেট থেকে তাঁর সোনালী-কালো বাঁশিটি বার করে বললেন, 'মিশরের রঙীন অমৃত এই রঙীন গেলাসে করে আপনাদের বিলি করব।'

তার পর দ্রিমিদভকে ঠেলা দিয়ে বললেন, 'আপনার ব্যায়লায় আমরা ডন, ভল্‌গা, দানিয়ুবের কিছু শুনতে পাব তো, না, রাতে বাজালে মাদাম রাগ করবেন ?'

লাজুক ত্রিমিদভ লাল হয়ে বললেন, 'না, রাগ করবে কেন? আমার বৌ আর যাই হোক, অবুঝ নয়।'

আমরা সবাই চোখ চাওয়াচাওয়ি করলুম।

পরের বৌ'কে যে যতই কালো, খাঁদা, ট্যারা বলুক, নিজের বৌয়ের নাকটি আর কে'ই বা বলে ঠিক যেন বড়ির মত!

রায় বলল, 'জয়ার সঙ্গে আপনার আলাপ হয়েছে?

বললুম, 'না তো জয়া কে?'

'একটি বাঙালী মেয়ে। চলেছেন প্যারিস। তিনি সেতারে ক্ল্যাসিকাল রাগরাগিনী শোনাবেন। সেতারে তাঁর পাকা হাত। আপনার সঙ্গে পরিচয় হয়নি? ডাইনিং হলে একটি মেয়ে আপনার চোখে পড়েনি? বার্মিজ মেয়েদের মতন মাথার মাঝখানে উঁচু খোঁপা বেঁধে আসেন? দিনে পরেন বাসন্তী রঙের শাড়ী আর রাতে ঘন নীল? ও একেবারে বাঁধাধরা সাজ সজ্জা? আপনার সামনের টেবিলেই বসেন?'

জয়ার ছবিটা চোখের সামনে ভেসে উঠল। আমার টেবিলের ঠিক সামনের টেবিলটাতেই বাংলাদেশের এক কালো মেয়ে দিনে সোনার বসন আর রাতে নীল পরে, চুল উল্টে মাথার ঠিক মাঝখানে উঁচু খোঁপা বেঁধে পুষ্পিত রজনীগন্ধার ডাঁটার মত সগর্বে ঘাড় খানি তুলে বসে থাকে,— এ মেয়ে বারবার আমাকে মনে করিয়ে দিয়েছে শ্রাবণ আকাশের স্নিগ্ধশ্যাম মেঘের কথা।

বললুম, 'পেরেছি, পেরেছি, চিনতে পেরেছি।'

রায় বলল 'পারবেনই তো। মেয়েটির মধ্যে কী আছে কে জানে, চোখে না পড়ে উপায় নেই। জাহাজশুদ্ধ সবায়ের চোখে পড়েছেন। অথচ কী আশ্চর্য, মেশেন না কারো সঙ্গে। এমন কী কেবিনের হুজরো ছেড়ে বাইরেও আসতে কেউ কখনো

দেখেনি। শুধু সকালে, দুপুরে, বিকেলে, রাতে চারবার যা ওই ডাইনিং হলে আসেন। বড় আশ্চর্য মেয়ে!'

মনে হল ব্যাপার সুবিধের নয়। পষ্ট যেন দেখতে পেলুম রায়ের আধখানা মাথা সিংহীর মুখের মধ্যে!

ফৈজাবাদী এতক্ষণে মুখ খুলল, 'ক্যেয়া আপ লোগ বোলা ইমাম সাব, রাতপে গানাবাজানা হোগা?'

'হাঁ। আপ গান গায় গা?'

বুকে হাত দিয়ে রুমালে চোখ মুছে বলল, 'কেয়া গায়েগা ইমাম সাব, হাম কেয়া বাচকে হ্যায় জো গায়েগা! কুছ 'নিশপিরেশনই' নেই মিলতা! নেই তো গানা হম জানতেঁহেঁ। ইমাম সাব, বিবিকো ছোড়কে মালুম হোতা কেয়া ম্যায় মুর্দা হু—ক্যায়সে গায়েগা?'

তার পর আর একবার রুমালে চোখ মুছে বলল, 'হ্রিম্বলাকা আন্দর য্যায়সা আগ্ জ্বল রহা, ইমাম সাব, বিবিকো নেই দেখকে মেরা ভি দিলপে দিনরাত ওইসিই আগ্ জ্বল রহা। বাহাবসে আপকো নেই দেখনে মিলে গা।'

বললুম, 'খুব দেখতে পাতা, কোন্ বোলা নেই দেখতে পাত! বিবাহ নেই কিয়া বোলকে কী আর বিরহকা অগ্নি কেয়া হ্যায় নেই জানতা! বলি এত্তা বন্দরমে যে জাহাজ থামা তো বিবিকা কুছ খত্ উত্ নেই মিলা?'

নিঃশ্বাস ফেলে বলল, 'নেই!'

বললুম, 'ঘাবরাও মত্। খত্ উত্ মিলনেই সে সব ঠিক হয়ে যায়গা। দিলমে যেত্তা অগ্নি জ্বলতা সব বুত্ যায়গা।' এই পর্যন্ত বলে হঠাৎ দূরের দিকে চোখ পড়তেই চমকে উঠলুম।

ডেকের ওই প্রান্তে লিওনার্দোর বদলে আর একজন অচেনা

চকচকে ছোকরার সঙ্গে কোমর জড়াজড়ি করে ধরে সমুদ্রের দুরন্ত হাওয়ায় লাল চুল উড়িয়ে, রঙীন ফ্রক উড়িয়ে যেন নাচতে নাচতে চলেছে অরোরা!

এ কী!

শাবান তৎক্ষণে বাঁশির গুড়ুককে দম দিতে শুরু করে দিয়েছেন।

॥ বারো ॥

শাবানের হাত থেকে বাঁশি কেড়ে নিয়ে বললুম, 'আপনি মনের হরিষে সারাদিন ধরে যে বেটে মোম জ্বালাতে শুরু করেছেন, শেষে রাতে দেখবেন ঝুলি ফতুর হয়ে গেছে, আলো জ্বলবে না! জানেন না কী—যে জন দিবসে মনের হরষে জালায় মোমের বাতি, আশু গৃহে আর দেখিবে না তার নিশীথ প্রদীপ ভাতি?'

কী কাব্য!

শাবান হো হো করে হেসে উঠে বিরাট থাবা বাগিয়ে আমার হাত থেকে বাঁশিতে ছোঁ মেরে বললেন, 'ফতুর হবে না ভায়া, ফতুর হবে না। আমার ঝুলিতে গজ্‌গজ্‌ করে মোম গজায়। তাই আমি মনের হরিষে সারাদিন ধরে মোম জ্বালাই। দেখবেন, আজ রাতে যখন সুরের দেওয়ালী শুরু হবে তখন এই শফিক শাবানই সবার আগে রংবেরঙের মোম জ্বেলে দীপালী সাজাবে। দিনে যারা কৃপণের মত মোম জমিয়ে রেখেছে তারা পারবে না।' তার পরেই তাঁর রঙীন বাঁশিতে সুরের রং খেলাতে শুরু করে দিলেন।

আমি বললুম, 'আপনি মনের আনন্দে বাঁশি বাজান, আমি চললুম কেবিনে একটু 'সিয়েস্তা' করতে। আবার রাত জাগতে হবে তো।'

খপ করে আমার হাত ধরে ফেলে বললেন, 'আমি ঠিক চারটের সময় আপনার কেবিনে যাব, তৈরী হয়ে থাকবেন। পোর্ট সঈদ থেকে এক জোড়া উদ্ভট চিড়িয়া-চিড়িয়ানী জাহাজের এই চিড়িয়াখানায় আমদানি হয়েছে। আলাপ করিয়ে দোব, মজা পাবেন।'

বললুম, 'উদ্ভট মানে? তাদের তিনটে করে ঠ্যাং আর দুটো করে মুড়ো না কী?'

বললেন, 'না, না, তার চে'ও মজার। ঠ্যাং তাদের দুটো আর মুড়ো একটা করেই—তবে তার চে'ও অদ্ভুৎ। ন্যাজ তুলে না দেখলে বুঝবেন না কোন জাতের চিড়িয়া।'

'এঁ্যা! বলেন কী—ন্যাজ তুলে দেখব! মিস্‌রী-চিড়িয়া?'

শাবান হেসে উঠে বললেন, 'আরে না, না, খাস আপনার আপন দেশের।'

তৈরী হয়ে থাকব বলে চলে আসছিলুম, তিনি একটু চেঁচিয়ে বললেন 'একটা সম্মার্জনী হাতে নিতে ভুলবেন না।'

থতমত খেয়ে গিয়ে ঘুরে দাঁড়িয়ে বললুম, 'তার মানে?'

বললেন, 'নইলে উপযুক্ত সম্মান দেখাবেন কী করে?'

কিচ্ছু না বুঝে কেবিনে ফিরে এসে দেখতে পেলুম লিওনার্দো বালিশে মাথা গুঁজে শুয়ে আছে।

শুধোলুম, 'কী ব্যাপার, শরীর খারাপ না কী?'

ফোঁস ফোঁস করতে করতে উঠে বসে ভাঙা ভাঙা ইংরেজীতে চিৎকার করে উঠল, 'ত্রেতর, ত্রেতর, অল উইমেন ত্রেতর। মানি দে লাভ—নত্‌ ম্যান, নত্‌ ম্যান, ওনলি মানি। অরোরা আমাকে একেবারে পুড়িয়ে ছাই করে দিয়েছে। অরোরা আমার সব স্বপ্ন ভেঙে দিয়েছে। তাই শুয়ে পড়েছি।'

ভয়ে ভয়ে শুধোলুম, 'অরোরা কেন এমন করল?'

আবার চিৎকার করে উঠল, 'ত্রেতর, ত্রেতর, অল উইমেন ত্রেতর—অল উইমেন লায়ার। পুরুষের টাকা ছাড়া ও'রা আর কিচ্ছু চেনে না। ওই ফরাসী ছেলেটার কাছে টাকার গন্ধ পেতেই রাতারাতি আমাকে ছেড়ে দিল! সে ডক্টর, প্যারিসের এক কলেজের প্রফেসর, বড়লোকের ছেলে,—আমি একজন অখ্যাত

গরীব আর্টিষ্ট, আমি তার সঙ্গে প্রতিযোগিতায় পারব কেন? তাই রাতারাতি সে অরোরাকে আমার কাছ থেকে ছিনিয়ে নিতে পারল। দোষ তো তার নয়, দোষ অরোরার। ত্রেতর, ত্রেতর, অল উইমেন ত্রেতর, অল উইমেন লায়ার, নেভার বিলিভ উইমেন।' সঙ্গে সঙ্গে বিছানা থেকে লাফ দিয়ে নেমে যে ভাবে কেবিন থেকে ছুটে বেরিয়ে গেল তাতে ভয় পেয়ে গেলুম খুনটুন করে বসবে না তো!

কম্বলটি মুড়ি দিতেই চোখের পাতায় একটুখানি ঘুম, একটুখানি রেশমী স্বপ্ন ঘনিয়ে আসছিল, এমন সময় আমার দরজা খোলার শব্দে চমকে চেয়ে দেখি দীনা। আমার ফ্লাস্কে জল আছে কী না দেখতে এসেছে।

কিন্তু রোজ যে দীনাকে দেখি আজ সে দীনার সঙ্গে একেবারে আকাশ পাতাল তফাৎ।

কী জানি কেন তার সোনালী চুল উস্কোখুস্কো হয়ে মাথার চারিপাশে শিখার মত উড়ছে। শান্ত দুটি গভীর কালো চোখে এক রকম উদভ্রান্ত দৃষ্টি বিদ্যুতের মত ছুটে বেড়াচ্ছে।

উঠে বসে বললুম, 'আর কী, জেনোয়া তো এসে গেল। কাল নেপলী, তরশু জেনোয়া।'

এলো চুলের মাঝখানে ঘাড় বাঁকিয়ে সেই উদভ্রান্ত চোখে আমার দিকে চেয়ে বলল, 'তাতে এত খুশীর কী আছে?'

কী আশ্চর্য!

বললুম, 'বাঃ! খুশীর কিছু নেই? তুমিই না একদিন বলেছিলে জেনোয়ার শরতের মত অমন সোনালী শরৎ আর কোথায় আসে? জেনোয়ার সেই সোনার শরৎ নিশ্চয়ই এতদিনে এসে গেছে। আর তার চেয়েও বড় কথা তোমার মায়ের সঙ্গে দেখা হবে।'

একটুখানি গম্ভীর উত্তর দিল, 'হুঁ।' তার পর আরো গম্ভীর হয়ে কাজ সেরে চলে গেল।

ভাবলুম, বোধহয় বাড়ী থেকে আবার মায়ের কোনো খারাপ খবর পেয়েছে, তাই হয়তো—

কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ল, তা কী করে হবে? খারাপ খবর পেয়েছিল সুয়েজে। তার পর যদি খারাপ খবর পায়'ই তো পাবার কথা পোর্ট সঈদে। কিন্তু আজ দু'দিন হলো জাহাজ পোর্ট সঈদ ছেড়েছে। পোর্ট সঈদে যদি কোনো খারাপ খবর পেত তা'হলে নিশ্চয়ই আমাকে বলত। কারণ দীনা তার মায়ের সম্বন্ধে সব কথাই আমাকে বলে। আর না বললেও পোর্ট সঈদ থেকেই ও'কে গম্ভীর, ম্লান দেখতুম। কিন্তু এই দু'দিনই—এমন কী আজ সকালেও দীনাকে আমি হাসি খুশীতে উজ্জ্বল দেখেছি।

তাহলে?

পাহাড় থেকে একদল সুইডিশ যাত্রী এসেছে এই 'এশিয়া' জাহাজে। তাদের চুল দাড়ী, পোশাক, বোঁচকা'বুঁচকি দেখলেই বোঝা যায় তারা পাহাড় থেকে নেমে এসেছে। পাহাড়-জয়ের আনন্দ তাদের চোখে মুখে।

তবে কী ডাইনিং হলে ওঠানামার পথে মাঝে মাঝে দু'একটা চকিত-দৃশ্য দেখে জাহাজের সেই পাহাড়-বিজয়ী দলের যে রাজপুত্তুরের মত ছোকরা যাত্রীটার সঙ্গে তার কেমন যেন একটুখানি হাবুডুবু-খাওয়া সম্পর্ক গড়ে উঠেছে বলে মনে হয়েছে তারই কাছ থেকে কোনোরকম চোট খেয়েছে?

কানে এলো বাঁশির সুর শাবান আসছেন। এখুনি চারটে বেজে গেল! এতক্ষণ হকচকিয়ে বসে ছিলুম!

সে শাহেরজাদীও নেই, আলাদীনের প্রদীপও কোনো কালে ছিল না,—কিন্তু আজ তিন ঘণ্টা সময় যেন আলাদীনের মায়া কার্পেটে চড়ে তিন মিনিটে পেরিয়ে গিয়েছে।

শাবান এসেই বললেন, 'কই, আপনি তৈরী হয়ে নেই!

চারটে বেজে গেছে। আবার সাড়ে ছ'টার সময় তো ক্যাপ্টেনের ফেয়ারওয়েল ডিনার। এই বেলা চলুন।' তাড়াতাড়ি তৈরী হয়ে নিলুম।

সিঁড়ির মুখেই দেখা হয়ে গেল সিল্কের লাল সালোয়ার, কামিজ আর বেগুনী রঙের স্বচ্ছ ওড়না পরা এক মেয়ের সঙ্গে। চোখে চশমা, রং—বাংলায় যাকে বলে উজ্জ্বল শ্যাম ; থলথলে শরীর, বয়েস তিরিশের ও পারে তো বটেই, তবে রং দিয়ে পালিয়ে যাওয়া বয়েসের গলায় দড়ি বেঁধে হিড় হিড় করে নীচের দিকে টেনে এনে যেন সারা গায়ে লিখে রাখতে চেষ্টা করেছে 'বয়েস আমার বাড়ে না তেয়ো'; তা অমন সব মেয়েই করে!

প্রত্যেক মেয়েই সুন্দর হ'তে চায়, তাই এ মেয়েও যতরকম করে পারা যায় সাজবার চেষ্টার কার্পণ্য করেনি। কিন্তু কথা হচ্ছে ময়ূরের পাখা ন্যাজে গুঁজে কাক কতটুকুই বা ময়ূর হয়!

শাবানকে বললেন, 'আপনাকে আমি সেই থেকে খুঁজছি। আপনার ভাউচারগুলো পাঠিয়ে দিয়েছে, আমাদের ষ্টুয়ার্ডের কাছে আছে। সে আপনাকে খুঁজছিল।'

জাহাজের বার থেকে বা অন্য কোনো দোকান থেকে কোনো জিনিষ কিনলে তখনি দাম না দিলেও চলে। দোকানদার ভাউচার সই করিয়ে নেয়, তার পর জাহাজ শেষ বন্দরে পৌছনোর দু'তিনদিন আগে সেই সব ভাউচার তারা খামে ভরে যাত্রীদের কেবিনে কেবিনে পাঠিয়ে দেয়। যাত্রীরা যে যার হিসাব মত চীফ ষ্টুয়ার্ডের কাছে, নয় সেই ভাউচারে যার কাছে টাকা দেবার নির্দেশ থাকে তার কাছে টাকা দিয়ে আসেন।

শাবান বললেন, 'তাই না কী? আমিও ভাবছিলুম পাঠাচ্ছে না কেন। আমায় তাহলে ট্রাভেলার্স চেকগুলো ভাঙ্গাতে হবে।'

'এই বেলা তবে যান, পার্সারস অফিস এখনো খোলা আছে। কাল থেকে আর ট্রাভেলার্স চেক ভাঙ্গানো বা লীরার বদলে পাউণ্ড টাউণ্ড দেওয়া ও'রা বন্ধ করে দেবে।'

'বলেন কী! তবে তো আমায় এক্ষুনি ক্যাশ করে নিতে হবে, নইলে মুস্কিলে পড়ে যাব।'

তবে এখুনি যান। আজ শেষ দিন বলে পার্সারস্ অফিস ছ'টা পর্যন্ত খোলা থাকবে। হ্যাঁ—আর একটা কথা। টিপ্‌স্ এ'র কী করলেন? কত দেবেন ঠিক করেছেন?'

'এখনো কিছু ঠিক করিনি তো।'

'এরা কী ব্যবস্থা করেছে জানেন?

'না।'

'যে যা টিপ্‌স দেবে সব চীফ ষ্টুয়ার্ডের কাছে জমা দিতে হবে। তার পর চীফ ষ্টুয়ার্ড সেই টাকা সবাইকে সমান ভাগে ভাগ করে দেবেন। নইলে কেউ কম, কেউ বেশী পেয়ে যাবে—কেউ হয়তো পাবেই না। আজ সকাল থেকেই টিপ স্ নেওয়া শুরু হয়ে গেছে।'

আমি বললুম, 'এ বরং ভালো ব্যবস্থা।'

মেয়েটি বলল, 'ইটালিয়ানরা এ সব দিকে ভয়ানক হুঁশিয়ার।'

শুধোলুম, 'আচ্ছা, পোর্ট সঈদের পর ওরা শুনলুম ডাকটিকিট বিক্রী করাও বন্ধ করে দিয়েছে—সাত্য?'

বলল, 'হ্যাঁ। কারণ নেপল্‌স্ বন্দরেই না কী পোস্ট-অফিস আছে।'

মেয়েটি চলে গেলে আমি শাবানকে শুধোলুম, 'মেয়েটা কে?'

শাবান বললেন, 'আমার ঠিক পাশের কেবিনেরই যাত্রী। নামটা মিস্‌কী যেন ঠিক মনে নেই। পেশোয়ারের কোন্ এক স্কুলের টিচার। বিলেতে চলেছেন ওই মাস্টারীতেই কী একটা Higher training নিতে।

'কোন দেশের মেয়ে জানেন ?'

'পাঞ্জাবী। কেন ?'

'সেদিন রাত দশটার সময় ডেকে গিয়ে দেখি বারে এক গাদা ইয়াঙ্কি মাতাল হৈ হল্লা করতে করতে যা ইচ্ছে তাই বাঁদরামী করছে, তার মাঝে ওই মেয়েটা। হাতে গেলাস, মুখে সিগারেট। মদ টেনে টেনে এমনি অবস্থা হয়েছিল যে, নিজে সিগারেট ধরাতে পর্যন্ত পারছিল না। ও'র কাণ্ড দেখে একটা ইয়াঙ্কি শেষে হাসতে হাসতে, টলতে টলতে কাছে এসে নিজের লাইটারটা জ্বালিয়ে ও'র সিগারেটটা ধরিয়ে দিল। তার পর দু'জনের সে কী হাসি! সেইদিন থেকে আমি ভাবছি মেয়েটা কে, কোন দেশের কী বললেন মাষ্টারীতে Higher training নিতে চলেছে ? তা 'ট্রেনিং' খুব ভালোই হ'বে! যাদের পড়াবে তাদেরও আর ভাবনা থাকবে না!'

শাবান হেসে বললেন, 'চলুন, ট্রাভেলার্স চেকগুলো আগে ভাঙ্গিয়ে নি, তার পর মিএ্যাবিবির খাঁচায় যাওয়া যাবে।'

॥ তেরো ॥

আমরা যখন গেলুম মিঞাবিবি তখন ইংরেজীতে ঝগড়া করছিলেন। শাবান পরিচয় করিয়ে দিলেন।

মিঞাটি তালপাতার সেপাই। ফুঁ দিলেই উড়ে যাবেন বলে মনে হয়। সরু ছাড়ের মত শরীরে চক্‌চকে টাকওয়ালা প্রকাণ্ড বেলুনের মত এক মাথা। সে মাথার ভারে বেচারী টলমল করছেন।

বিবিটি আস্ত হস্তিনী। একটা রবারের মানুষকে যেন ঠেসে হাওয়া ভরে ফুলিয়ে তোলা হয়েছে। দশহাতি, বারোহাতি শাড়ী তো এঁর কাছে বঁদিপোতার গামছা! মনে হ'ল একটা পুরো থান লাগে!

জাহাজের ব্যাগেজ-রুমে একদিন গিয়ে ব্যাগেজ-মাষ্টারকে দেখে মনে হয়েছিল, হ্যাঁ, ব্যাগেজ-মাষ্টারই বটে! জাহাজ কোম্পানি বেছে বেছে এমন একটি কিং কং কোথা থেকে জোগাড় করেছে ভেবে অবাক লেগেছিল। বড় বড় বাক্সো-প্যাটরা নিয়ে যেন অনায়াসে লোফালুফি খেলছিল। কিন্তু এই বিবিটির কাছে তাঁকেও কল্পনায় মিলিয়ে বড় রোগা ছেলে বলে মনে হ'ল! সবচেয়ে মজার ব্যাপার এই বিশ মণ ওজনের প্রকাণ্ড শরীরের উপর মাথাটি যেন ছোট্ট একটি গোল বেগুন! চুল মেয়েদের মত ছাঁটা। গলাটা যেমন মোটা গলার স্বর কিন্তু ঠিক তেমনি তীক্ষ্ণ মিহি। নাকি ঢঙে কথা বলেন। ঘাড়ে-গর্দানে এক। থপথপে চলন। গায়ে নানান রকম গয়না। হাতে সিগারেট।

আলাপ সালাপের পর মিঞাটি বললেন, 'আমার আবার একটা দোষই বলুন আর গুণই বলুন—আমি বলি দোষ, আমার ওয়াইফ বলে গুণ—আমার 'মোটো' হচ্ছে, নলেজ ইজ পাওয়ার! নলেজ চাই—বই পড়ে, ট্রাভেল করে, যেমন করে হো'ক। বইয়ের নলেজ আমাদের শেষ হয়ে গেছে—আমি নিজে একজন ইকনমিক্সে গ্র্যাজুয়েট। আর আমার ওয়াইফ তো ফিলজফিটা একেবারে গুলে খেয়ে ছেড়ে দিয়েছে। ওর সমস্ত এডুকেশনটাই হয়েছে লণ্ডন ইউনিভার্সিটির করেসপনডেন্স কোর্সে। তাই এখন ট্রাভেল করে আমরা নলেজ কুড়িয়ে বেড়াচ্ছি। এত ট্রাভেল করে আমার ওয়াইফের শরীরটা একটু কাহিল হয়ে পড়েছে বটে, তার উপর এটা আবার ন' মাস চলেছে—কিন্তু তা হোক, আমি বলি শরীরের চেয়ে নলেজ বড়।'

মনে মনে বললুম, নলেজের চোদ্দ পুরুষের ভাগ্য!

বিবিটি এক মুখ ধোঁয়া ছেড়ে নাকি সুরে বললেন, 'কী surprising matter তা notice করেছ? পাঁচ বছর England এ থেকে Bengali যদিও ভুলতে বসেছি তবুও Bengalee দেখতেই কেমন chaste Bengali বলতে পারছি? একেই বলে mother tongue.'

মিঞা বললেন, 'হ্যাঁ, তা জানেন? বিয়ের পর আমরা আবার পাঁচ বছর বিলেতে ছিলুম। কী বলব, পাঁচ বছরেই বাংলা প্রায় ভুলে গেছি বললেই হয়। আমার ওয়াইফ তো এক রত্তিও বলতে পারে না। ও'র আবার সমস্ত এডুকেশনটাই ইংরেজীতে হয়েছে কী না।'

বিবি ফের এক মুখ ধোঁয়া ছেড়ে বললেন, 'Bengali ভুলে যাওয়াই better. বাব্বাঃ! যে জঘন্য language! ভাব express করাই যায় না। কোন্ পাপে যে Bengal এ

জন্মেছিলাম! Bengali না শিখতে পাওয়াই—fortune এ'র বাংলাটা যেন কী গো?'

মিঞা বলে দিলেন, 'সৌভাগ্য।'

বিবি বললেন, 'হ্যাঁ, হ্যাঁ, সৌভাগ্য!'

মিঞা বললেন, 'সত্যি, আমার ওয়াইফ ঠিক ইংলিশ মেয়েদের মত ইংরেজী বলে। ভারি চমৎকার রপ্ত করেছে ভাষাটা।'

পেটে বোমা মারলেও যাদের মুখ থেকে 'ক' বেরোবে না তাদের নিয়ে কোনো ভাবনা নেই, কিন্তু পেটে বোমা মারলে ওই 'ক' অক্ষরটুকুই যাদের মুখ দিয়ে বেরোয় তাদের নিয়েই যত মুস্কিল।

বুঝলুম শফিক শাবান কেন সম্মার্জনী নিতে বলেছিলেন।

এমন সব সোনার চাঁদ ছেলেমেয়ের সংখ্যা দিন দিন বেড়ে চলেছে বলেই আমাদের সমাজ—সমস্ত জাত ঠিক ফড়িঙের মতোই লাফ দিয়ে দিয়ে উন্নতির দিকে এগিয়ে চলেছে।

বিশ্ববিদ্যালয় মানেই বিশ্ব—অবিদ্যালয়। তাই তো ওখান থেকে রং মেখে সং সেজে যারাই বেরিয়ে আসে তারা সেই জীব—যারা লম্ফ দিয়ে গাছে ওঠে ল্যাজ নেই কিন্তু।

আরো নানানরকম কথার চচ্চড়ি ভাজতে ভাজতে মিঞা-বিবি দু'জনের মুখেই এমন সব ইংরেজী আর নলেজের ডিম ফুটতে লাগল যে, তাতে এ বিষয়ে আর সন্দেহই রইল না মিঞাটি একজন ইকনমিক্সে গ্র্যাজুয়েট, আর বিবিটি ফিলজফি এবং ইংলিশ ভাষাটা একেবারে গুলে খেয়ে ছেড়ে দিয়েছেন।

ইংরেজীর নমুনা শুনে একবার ভাবলুম শুধোই যে বিলেতে তাঁরা পাঁচ বছর ছিলেন সেটা ওয়েলেসলী ষ্ট্রীট, না, ইলিয়ট রোড, কিন্তু ইচ্ছে করেই মুখে চাবি এঁটে রাখলুম।

কথায় কথায় আরো খবর পেলুম যে, বাংলাটা বিবি নেহাত ভুলে গেছেন তাই,—নইলে এ্যাদ্দিন কী ভালো ভালো বিদেশী সাহিত্য সব অনুবাদ হয়ে যেত না? বাংলা ভাষায় বিবি অনুবাদের একটা বান এনে দিতেন।

বিবির কাঁশি শেষ হ'তেই মিঞার তবলা শুরু হ'ল—'আমার ওয়াইফ আবার বুঝেছেন, সত্যিই একজন মস্ত লিখিয়ে. ভারি পাকা হাত! এমন ইংরেজী লেখে কী বলব! আর সে সব কী ভয়ঙ্কর সাইকোলজির প্যাঁচ! আমি তো বুঝিই না! আমার আবার একটা দোষই বলুন, আর গুণই বলুন—আমি বলি দোষ, পাঁচজনে বলে গুণ— আমারো লক্ষ্য ওই সাহিত্য। এখন young age—age of activity. এ বয়েসে active হ'তে হবে। বসে বসে সাহিত্যের বয়েস এ নয়। এ বয়েসে চাই activity অর্থাৎ এক মনে চাকরি করে যেতে হবে। তার পর after retirement বুঝেছেন, খালি সাহিত্য আর সাহিত্য আর সাহিত্য। আমাদের দেশের সাহিত্যিকরা বুঝেছেন না. পাশ করে গ্র্যাজুয়েট হয় না. তাই নলেজ হয় না, আর age of activityতে active হয় না অর্থাৎ চাকরী করে না বলে টাকাও হয় না— তাই life এ ও'রা সাক্সেস্ফুল হয় না। চুলোয় হাঁড়ি চাড়িয়ে কী আর লেখা হয়! লাইফে আমরা কী চাই? সাকসেস চাই। আর সেই সাকসেস পেতে হলে আটঘাট বেঁটে, হাতের পাঁচ হাতে রেখে কাজে নামা চাই। নইলে স্রোতে গা ভাসিয়ে দিলুম তাতে কী আর হয়! সাকসেস অত সোজা নয়। আমি তাই এখন পাশটি করে নলেজটি কুড়িয়ে আর active হয়ে চাকরী করে আটঘাট বেঁধে রাখছি। তার পর যদি সাহিত্যে হাত দিই, আপনিই বলুন, সাকসেস আমার কেন আসবে না?'

খুব জোর দিয়ে বললুম 'নিশ্চয়ই!'

বিবির শেষ হলে মিঞা সিগারেট ধরালেন।

বিবি বললেন, 'নিজেই smoke করতে রইলে? gentlemen দের offer কর?

সিগারেট দিতে বলায় মিঞার মুখটি শুকিয়ে গেল। পকেট থেকে কেস্‌টি বার করে সামনে মেলে ধরে জোর করে টেনে টেনে হেসে হেসে বললেন, 'তা আপনারাও নিন না—হেঁ, হেঁ, এ আবার বড় দামী সিগারেট, এককেটির দাম আমাদের পয়সায় চার পাঁচ আনা পড়ে—রাশিয়ান সিগারেট—হেঁ, হেঁ, বেশী আবার নেইও দেখছি—জাহাজে আবার এ সিগারেট পাওয়াও যায় না—হেঁ, হেঁ, কই নিন? তু'জনে একটা নিয়ে আধখানা করে ছিঁড়ে খেয়ে দেখুন না, বেশ সুগন্ধ লাগবে এখন?'

কোনো রকমে হাসি চেপে বললুম, 'ধন্যবাদ, আমি খাই না।'

শাবানও তাঁর মনের অভিপ্রায় বুঝতে পেরে বললেন, 'অশেষ ধন্যবাদ, আমিও ঠিক আজ থেকেই সিগারেট খওয়া ছেড়ে দিয়েছি!'

মিঞা তাড়াতাড়ি কেসটি বন্ধ করে আগে পকেটে পুরে তার পর বললেন, 'খুব ভালো করেছেন। সিগারেট না খাওয়াই ভালো। শুনছি না কী ও'তে ক্যান্সার হয়।'

বিবি মিঞার দিকে চেয়ে কী একটু চোখের ইশারা করে বললেন, 'আচ্ছা ও'নাদের সেই জিনিষগুলো দেখালে হয় না? ওমা, কেমন chaste বাংলা এসে গেছে মুখে!'

ঢং দেখে সর্বাঙ্গ রী রী করে জ্বলতে লাগল।

মিঞা দেখলুম চোখের নিমেষে বুঝে গেলেন। বললেন, 'হ্যাঁ, হ্যাঁ, ঠিক কথা মনে করিয়েছ।'

তার পর গলা খাঁকারি দিয়ে বললেন, 'সে কিছুই নয়, বুঝলেন না, আপনারা নেহাত আপন লোক তাই বলছি, নইলে বলা চলে না—অবশ্য জিনিষ যে খারাপ তা নয়—খাস বিলিতি, আজকাল

ও সব আর পাওয়াই যায় না—তবে একটু পুরনো হয়ে গেছে, এই যা—বেশ সস্তায় দোব এখন—হয়েছে কী জানেন? আমার একটা ওভারকোট আছে, গায়ে বড় হয়, পরতে পারি না, খামোকা বাক্সোয় পড়ে আছে। আপনারা তো বিলেতেই যাচ্ছেন, শীতের দেশ, কাজে লাগবে। যদি নেন্ তো দিয়ে দোব। একটু পুরনো হয়ে গেছে, দু'এক জায়গা পোকায় কেটেছে—মিছে কথা বলব না—কিন্তু আমার ওয়াইফ এমন সুন্দর ভাবে Invisible mending করে দিয়েছে যে, বিলকুল বোঝা যায় না। নিন না, বেশ সস্তায় দোব এখন—এই ধরুন কেনা দামের অর্ধেক ধরে দেবেন?'

আমরা দু'জনেই বললুম, 'ওভারকোট আমাদের আছে। নইলে নিশ্চয়ই নিতুম।'

মিঞাবিবি দু'জনেই বলেন, 'ও। তাহলে তো কেনার কোনো কথাই ওঠে না।'

মিঞা একবার আড়চোখে আমার হাতের দিকে চেয়ে বললেন, 'মিঃ শাবানের হাতে ঘড়ী দেখছি, আপনার বোধহয় ঘড়ী নেই?'

বললুম, 'না। ইংল্যাণ্ডে কেনবার ইচ্ছে আছে।'

বললেন, 'আমার একটা পুরনো ঘড়ী আছে, বুঝলেন, স্প্রীংটা কেটে গেছে আর মিনিটের কাঁটাটা একটু ভেঙে গেছে, কিন্তু বড় দামী ঘড়ী—আসল ওমেগা। সারিয়ে নিলেই হবে। জানেন তো মরা হাতীরও লাখ টাকা দাম। ওমেগা হলো ঘড়ীর রাজা। যদি নেন্ তো বেশ সস্তায় দোব এখন। এই ধরুন, নামমাত্র একটা দাম ধরে দেবেন। আপনি বন্ধুলোক, আপনার সাথে তো আর দরাদরি নেই—আপনাকে আমার এমনিই দেওয়া উচিত ছিল, কিন্তু পাঁচজনের চোখে সেটা খারাপ দেখায় বলে নামমাত্র একটা দাম ধরে দিতে বলছি। দেখতে চান তো বলুন, দেখাতে পারি।'

বললুম' 'নিশ্চই নোব। হলোই বা একটু খোঁড়া। তাও আবার যখন নকল নয়, আসল! তবে আজ থাক, পরে দেখব।'

বললেন, 'এই তো গুণীলোকের কথা। জহুরী দেখে পাথর দেখাতে হয়। জিনিষের মর্ম যে বোঝে, যে একান্ত আপনার লোক হয় তাকেই এ সব কথা বলা চলে। যাকে তাকে তো আর সব কথা কথা বলা যায় না। তাহলে ঘড়ীটার কথা ভুলবেন না যেন?'

বললুম, 'নিশ্চয়ই না।'

বিবি বললেন, 'আপনি wise লোক, আপনার উপরেই ছেড়ে দিলুম—ওমা, কেমন chaste বাংলা এসে গেছে মুখে!—বিবেচনা করে যা দাম উচিত মনে করেন তাই দেবেন। মনে রাখবেন আসল ওমেগা—মরা হাতীর লাখ টাকা দাম—made in খাস switzerland. কথায় বলে জার্মানীর clock আর সুইটজারল্যাণ্ডের watch. হ্যাঁগা, আমার রুজ, লিপষ্টিকগুলো কোথায় রেখেছ, দাও তো। ফেয়ারওয়েল ডিনারের সময় হয়ে এসেছে, তৈরী হয়ে নিই। তুমিও তৈরী হয়ে নাও। গেট রেডি, কুইক।'

মিঞা বললেন, 'আমি তো Ready-ই আছি, শুধু মাথাটা আঁচড়ে নিলেই হ'ল। তোমার রুজ লিপষ্টীকগুলো ওই বাক্সোর মধ্যে রেখেছি বোধহয়। দাঁড়াও দেখছি।'

মাথাব যে তিনি কী আঁচড়াবেন সে তো মগজ আঁতিপাঁতি করেও ভেবে পেলুম না! চোখে দুরবিন লাগিয়েও তো মাথায় একগাছি চুলও চোখে পড়ল না!

বিবি বললেন 'তুমি বস, আমি দেখছি'—বলে থপথপ করে উঠে গিয়ে বহু কসরৎ করে আধবসা হয়ে খাটের নীচের থেকে বাক্সো টানতে যেতেই মিঞা একেবারে লাফিয়ে উঠে খানিকক্ষণ হাওয়ায় উড়ে ঘুরপাক খেয়ে টাল সামলে ককিয়ে উঠলেন, 'ওগো দাঁড়াও,

আমি টেনে দিচ্ছি, তুমি বাক্সোটাক্সো টানাটানি করো না, ট্রাভেল করে করে আর নলেজ কুড়িয়ে কুড়িয়ে তুমি আমার বড় কাহিল হয়ে গেছ।'

তার পর নিজে বাক্সোর কান ধরে টানাটানি করতে করতে বললেন, ট্রাভেলে আমার স্বাস্থ্যটা কিন্তু বেশ ইমপ্রুভ করেছে।'

ও'দিকে বাক্সো একচুল নড়ছে না! বহু ঝুলোঝুলি করার পর কোনোরকমে একটুখানি টেনে এনে ডালাটি একটু ফাঁক করে রুজ, লিপষ্টীক বার করে বিবিকে দিলেন।

আমরা বললুম, 'আমরাও এখন যাই, আমাদেরকেও Ready হতে হবে।'

মিঞা পকেট থেকে এক বাহারে চিকনী বার করে গম্ভীর হয়ে টাকে বোলাতে বোলাতে বললেন, 'আচ্ছা আসুন, তবে ঘড়ীটার কথা ভুলবেন না যেন।'

বললুম, 'আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, কিছুতেই ভুলব না। বিশেষ করে মরা হাতীরও যখন লাখ টাকা দাম।'

টেকোর কাছেও তা হলে চিরুনী থাকে।

॥ চোদ্দ ॥

কালো স্যুট চাপিয়ে, টাই উড়িয়ে, নাক ফুলিয়ে আকাশের দিকে মুখ উঁচু করে 'হাম কী হনুরে' ভাব করে লম্বা লম্বা বকের ঠ্যাং ফেলে ডাইনিং হলে ঢুকতে যেতেই কাঁচের দরজায় মাথা ঠুকে গেল।

দরজা বন্ধ, ঘড়ীতে তখনো সাড়ে ছ'টা বাজেনি।

কপালে হাত বুলোতে বুলোতে ডেকে গিয়ে চোখ একেবারে জুড়িয়ে গেল। এমন আকাশভরা সন্ধ্যার একখানি রঙীন ছবি যেন বহু তপস্যার পর হঠাৎ একদিন দেখা যায়।

চির-অভিসারিণী সন্ধ্যা আজ বহু যুগ পরে হঠাৎ যেন তার বরের সন্ধান পেয়েছে, তাই আজ এই শেষের লগ্নে কে যেন তাকে বহু যত্নে, বহু আদরে নব বধূর সাজে সাজিয়ে দিয়েছে—গায়ে রক্ত বসন, তাতে হাজার রঙের হীরামানিক জ্বলছে, মাথায় লাল টকটকে সিঁদুর, কপালে সন্ধ্যাতারার টিপ, লজ্জারক্ত গালে চন্দনের ফোঁটা, গলায় বাঁকা চাঁদের হার। আকাশের নীল আসনখানি আলো করে সলজ্জ নিমীলিত চোখে বসে আছে।

এমনি সন্ধ্যায় আমরা 'সুপারম্যানের' স্বপ্ন দেখি—সমস্ত অন্তর ছেয়ে কী এক অনাদিকালের অজানা বিরহ বেদনা ঘনিয়ে ওঠে।

ডেকের মাঝখানে সুইমিং পুল। তার পাশেই বার। জংলী রুচির চিহ্নওয়ালা রংচঙে বাহারি পোশাক পরা এক পাল আমেরিকান ছেলেমেয়ে সেখানে এন্তার মদ গিলছে, জুয়ো খেলছে, হল্লা করছে। আর তারি সাথে সাথে আরো নানানরকম বাঁদরামি করছে। আর এতদিন যা দেখিনি আজ তা'ই দেখলুম—লিওনার্দো পড়ে আছে বারে।

হঠাৎ কানে এলো কে গুণ গুণ করে গান ধরেছে, 'আমায় ভাসাইলি রে, আমায় ডুবাইলি রে।' সঙ্গে সঙ্গে নিস্তব্ধ সন্ধ্যা, বোবা সমুদ্র যেন কথা কয়ে উঠল। বুকের ভিতরটা হাহাকার করে উঠল।

মনেই হলো না যে গাইছে সে কোটপ্যাণ্টালুন পরা এক 'জেণ্টেলম্যান।' মনে হ'ল খাঁটি পদ্মার মাঝি—তার মাথায় বাবরী চুল, গলায় কালো সুতো, বাহুতে মাদুলি, কোমরে গামছা বাঁধা, বলিষ্ঠ দুই হাতে দাড়, কালো চকচকে গা দিয়ে ঘাম ঝরছে।

গান থেমে গেল, কিন্তু সমস্ত আকাশ ভরে রইল বিষাদে।

চোখের সামনে আকাশ, সমুদ্র, সন্ধ্যা সব ইন্দ্রোজালের মত মিলিয়ে গিয়ে ভেসে উঠল আমাদের মৃন্ময়ী মায়ের করুণ ছবি—রুক্ষচুল এলিয়ে, শ্যামা গায়ে ছিন্ন বসন জড়িয়ে, কোলে অস্থিজর্জ্জ উলঙ্গ শিশু নিয়ে অশ্রুসজল হতাশ নয়নে চেয়ে নদীকূলে দীর্ঘদিন, দীর্ঘ যামিনী জেগে বসে আছেন।

'ইমাম সাহেব'

কে? চমকে উঠলুম। দেখি রায়। পাশে জয়া। যেন নব বর বধূ। ও'রা বেশ চকচক ঝকঝক করছে।

বার্ণার্ড শ'র Life force এ'র খেলা আর কী! দুই প্রান্ত থেকে ঘূর্ণী স্রোতে ভাসিয়ে এনে দুটো জীবনকে এক করে মিলিয়ে দিতে চাইছে।

ভাবলুম, নিটশের জরথুস্ত্র জরথুস্ত্র ভাব করে বলি, Creative thirst, arrow of longing for the superman—say my brother is this thy will to marriage?

ততক্ষণে ডেক ছেয়ে ঝোলানো রঙীন আলোর মালাগুলো জ্বলে উঠেছে।

সেই আলোয় দেখলুম জয়ার মাথার মাঝখানে চূড়ার মত করে

চুল উল্টে বাঁধা মস্ত খোঁপা, দুই কানে নীল পাথরের দুল, গলায় নীল মালা, কপালে নীল টিপ, লতানো লতানো দুটি কালো হাতে নীল চুড়ি, গায়ে নীল শাড়ী নীল ব্লাউজ, স্নিগ্ধ-গর্বিত ঝলমলে কালো মুখে মোনালিসার হাসির মত একটুখানি গম্ভীর রহস্যময় হাসির আভা। রায় ঠিকই বলেছিল, মেয়েটির মধ্যে কী আছে কে জানে. হাজার লোকের মধ্যেও সে চোখে পড়বেই। অথচ এঁকে রূপসী বলা চলে না। রংও ফর্সা নয়, শ্রাবনের মেঘের মত উজ্জ্বল কালো।

রায় বলল, 'ডাইনিং হলে যাবেন না।' সাড়ে ছ'টা বেজে গেছে

'এঁ্যা! বলেন কী—সাড়ে ছ'টা বেজে গেছে? চলুন, চলুন। আচ্ছা, আপনি শুনেছেন এখুনি কে গাইছিল, আমায় ভাসাইলি রে, আমায় ডুবাইলি রে?'

প্রশ্ন শুনে কালো মেয়ের কালো মুখ ভরে মৃদু হাসির যে গোলাপ ফুটে উঠল তার ছবি আঁকতে পারি এমন কোনো রং তুলি আমার হাতে নেই।

রায় ভীষণ লজ্জা পেয়ে বলল, 'কেন বলুন তো? আমিই গাইছিলুম।'

'আপনি? বড় ভালো লাগছিল।'

রায় বলল 'আর লজ্জা দেবেন না। আমার আবার গান! চলুন।'

আশ্চর্য! রায় জয়ার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিল না। জয়াও একটিও কথা বলল না।

তা ও সব গায়ে মাখলুম না। কারন, রায় অমন সবসময়ই কারো সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিতে ভুলে যায়। আর জয়াও শুনেছি বেশী কথাবার্তা বলে না।

সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে মনে পড়ল, রায় একদিন বলেছিল, 'ইমাম সায়েব, হিন্দুর ছেলে বটে আমি, তাই বলে বিয়ের মন্ত্রে আর অনুষ্ঠানে যারা বিশ্বাস করে তাদের দলে আমি নই। যে আমার বধু হবে সে মেয়েও যেন ওই বিয়ের মন্ত্রটায় বিশ্বাস না করে।'

রায় কী শেষে 'এশিয়ায়' তার বিদ্রোহিনী বধুকে খুঁজে পেল!

সঙ্গে সঙ্গে রায়েরই আর একটা কথা মনে পড়ে গেল। এই কিছুদিন আগেই ইরাকী-বিপ্লব হয়েছে। তাই সেদিন ইরাকের বিপ্লব সম্বন্ধেই কথা হচ্ছিল। কথায় কথায় রায় বলেছিল, —ইমাম সায়েব, জীবনে স্বপ্ন না দেখেও উপায় নাই, অথচ স্বপ্ন দেখতেও ভয় লাগে। কী জানি বাদশা ফয়জল সেদিন রাত্রে কী স্বপ্ন দেখেছিল! হয় তো তুর্কির স্বপ্ন, হয় তো তার ভাবী বধুকে। কিন্তু জানতও না যে, রাতারাতি তার দাবার সব ঘুঁটি উল্টে গেছে,— কাসেম সারা রাত ধরে তার ছুরিতে শান দিয়েছে! তাই রঙীন স্বপ্নে বিভোর হয়ে যার রাত কাটল, ভোরে উঠে দেখল বিদ্রোহীরা তার মাথা কাটতে এসেছে!'

তাই ভাবলুম শুধোই, ওরা স্বপ্ন দেখছে কী না—দেখি রায়ের রায়টা কী! কিন্তু চেপে গেলুম।

ডাইনিং হলে পা দিয়েই থমকে দাঁড়ালুম। মায়া-আংটি, মায়া-কার্পেট—এ সব আমার কাছে নেই, তা সত্ত্বেও হঠাং যেন পথ ভুলে আরব্যরজনীর অদ্ভুত রাজ্যে এসে পড়েছি বলে মনে হ'ল! তা নইলে হঠাৎ সব এত সুন্দর, এত রঙীন হয়ে উঠবে কেন!

দরজা দিয়ে ঢুকতেই সামনে মাঝারি সাইজের একটা গোল

টেবিলে প্রকাণ্ড এক ফুলদানিতে মস্ত এক গুচ্ছ রজনীগন্ধা রাজরাণীর গর্বে ঘাড় তুলে মৃদু মৃদু দোল খাচ্ছে। সমুদ্রে কোথা থেকে রজনীগন্ধা পেয়েছে জানি না। চারিদিকে ঝাড়বাতি জ্বলে উঠেছে। টেবিলে টেবিলে নতুন টেবিল-ক্লথ পাতা। তাতে কত রকমের নক্সা। তার উপর কত রঙের বোতল, কত বিচিত্র কাঁচের পাত্র সাজানো। ঝাড়বাতির আলো ঠিকরে পড়ে সে সবে রামধনুর রং খেলছে। আর তারই ফাঁকে ফাঁকে গুচ্ছ গুচ্ছ এষ্টার, রডোডেন ড্রনফুলের ছবিওয়ালা মেনুগুলো উঁকি দিচ্ছে।

কত দেশবিদেশের মেয়ে, পুরুষ। তাদের কত রঙের পোশাক, কত ঢঙের সাজসজ্জা। মাথায় সব বিচিত্র রঙীন কাগজের টুপি পরে টেবিলে টেবিলে গোল হয়ে বসে মুঠো মুঠো গল্প হাসির মণিমুক্তো ছড়িয়ে দিচ্ছে! ঝাড়ের আলোয় আর ওই রংচঙে কাগজের টুপিতে রোজকার চেনা লোকগুলোকে যেন কোনো অচেনা রাজ্যের অদ্ভুত জীব বলে মনে হচ্ছে। চারিদিকের এই রঙের তালে তাল দিয়ে দেওয়ালের ফ্রেস্কোগুলোও যেন নতুন ময়ূরকণ্ঠী রং মেখে নিয়েছে। আর এই সবকিছুর উপর আর একটু করে রং বুলিয়ে দিচ্ছে পিয়ানোর সুমধুর হাল্কা সুরের মায়া-তুলি।

বুড়ো চীফ-ষ্টুয়ার্ড তাঁর লাল-পাখিটাকে ফেলে আজ স্বয়ং শ্যাম্পেন বিলি করে বেড়াচ্ছেন।

ঢুকেই দেখি একপাশে মিঞাবিবি! বিবি শুনি থপথপ করতে করতে মিঞাকে বলছেন 'বাজনাটা শুনে আমার কিন্তু বাপু বড্ড নাচ পাচ্ছে। কদ্দিন নাচিনি! বিলেতে থাকতে কেবলই নাচতুম।'

এ্যাঁ! কেবলই নাচতুম! মনে মনে বললুম, 'রক্ষে দাও শ্রীমতী, তোমার ভারে এমনিই জাহাজ অর্ধেক ডুবে আছে, এ'র

উপর আবার নাচ শুরু করলে আমরা আর বাঁচবনা, জাহাজ একদম ডুবে যাবে।'

'এ্যাল্লো স্যার, আউ আর ইউ? ওয়াত্ ব্রিং? ভাজিয়া. পুরীয়া, পাপাত্, দাল রাইস, ভেজিতেবল রাইস, পোতাতো রাইস'—বলতে বলতে আমার ওয়েটার, সোলজার ফাদাবের বীরপুত্র ভিঞ্চি আমার মাথায় ন্যাজহীন লাল তার্বুশের মত একটা কাগজের টুপি পরিয়ে দিল।

খাওয়া দাওয়াব পর আইসক্রীম এনে দিয়ে তিনটে তিন রকম ছবিওয়ালা মেনু নিয়ে এসে বলল, 'ইউ তেক্ স্যাব, অল ইউ তেক্, ভের্রি বিউতি ফু স্যার, আই ভিঞ্চি গিভ।'

তার পব একটু থেমে বলল, 'ভিজিতিং নেপলী. পম্পিয়াই স্যাব? উই সিপ কোম্পানী শো ইউ নেপলী. পম্পিয়াই—বাস এ্যারেঞ্জ উই।'

বললুম, 'এখনো ঠিক কবিনি। আমরা জাহাজে যে কড়ি ফেলেছি নপলী পম্পিয়াইয়ের তেল তো আর সেই কড়িতেই মাখা যাবে না। তার বেলায় তোমার জাহাজ কোম্পানীর নীতি 'ফেল কড়ি মাখো তেল'—তার জন্যে জাহাজ কোম্পানীকে আলাদা টাকা দিতে হবে। আমার সঙ্গে ট্রাভেলাস চেক খুব কম আছে।'

ভিঞ্চি চোখ বন্ধ করে বলল, 'নেপলী! আহা! নেপলী দেখবেন না তো দেখবেন কী! লণ্ডোরা? পারীয়া? বার্লিনা? সে সব তো এ'র পাশে কালো মেয়ে! নেপলীর মদ সুন্দর, আঙুর সুন্দর, আরো সুন্দর নেপলীর মেয়েরা। কিন্তু তার চেয়েও সুন্দর নেপলী-সুন্দরী নিজে। এত আলো বোধহয় দুনিয়ার আর কোনো শহরে জ্বলে না। রাতে নেপলী-সুন্দরী যখন মাথা থেকে পা পর্যন্ত হাজার রঙের আলোর মালা জড়িয়ে রাজরাণীর গর্বে

আকাশে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে থাকে তখন সারা রাত তার দিকে মুগ্ধ হয়ে চেয়ে থাকে না শুধু অন্ধ। এ শহর ঘুরতে ঘুরতে ভাঁজে ভাঁজে ক্রমশঃ উপরে উঠে গেছে। তাই নীচে থেকে উপরে চেয়ে থাকে থাকে সাজানো লক্ষ আলোর মালা ছাড়া কিছুই চোখে পড়ে না। আবার উপরে উঠে নীচেয় চেয়ে দেখুন—চারিদিকে লক্ষ রঙের লক্ষ আলোর ফুল ফুটে আছে। তারই মাঝে হঠাৎ এক সময় চেয়ে দেখবেন অন্ধকারে ভিসুভিয়াসের মাথায় তাবার মত এক সাব আলো জ্বেলে দিয়েছে। আমার কথাটা শুনে বাড়তি কয়েকটা কড়ি ফেলে একবার—শুধু একবার মাত্র আমাদের স্বপ্নের দেশ নেপলী-সুন্দরীকে দেখে আসুন। আমি বলছি আমন দেশ আর দুনিয়ায় নেই।'

প্রত্যেক লোকই যেমন মনে মনে ভাবছে তার সমান দায়িত্বজ্ঞান, তাব সমান বুদ্ধি, তার সমান জ্ঞান, তাব সমান বিবেক দুনিয়ায় আর কারো নেই, সে ছাড়া আর কেউ কিছু বোঝে না, তার সমান কেউ নয়, তেমনি প্রত্যেক জাতই ভাবছে সে'ই দুনিয়ার শ্রেষ্ঠতম জাত। দেশের বেলায়ও দেখি ঠিক তা'ই! সবাই নিজেব দেশটিকেই ভাবছে সেরা দেশ! ইরানের জওয়াদ সেলিম, 'এশিয়া'র দীনা আব ভিঞ্চি—সবাই!

বললুম, 'আচ্ছা, আচ্ছা তাই হবে।'

ভিঞ্চি বলেই চলল, 'কত বিদেশী ওই নেপলীর মায়া কাটিয়ে আর নড়তে পারে নি! আমিও আর জাহাজে বেশীদিন কাজ করব না। সমুদ্রে সমুদ্রে ঘুবে বেড়ানো—এ আর মোটেই ভালো লাগছে না আপনারা বুঝবেন না সমুদ্রের জীবন কী ভয়নক একঘেঁয়ে, কী ভীষণ বিরাক্তকর! তাই সমুদ্রকে সবসময় আমি অভিসম্পাত করি। এ আমার সবকিছু কেড়ে নিয়েছে। এইবার জাহাজ থেকে ছুটি নিয়ে ওই নেপলীরই ধারে কাছে কোথাও ছোট্ট

একটা কুঁড়েঘর বেঁধে চাষবাস করব। বৌকেও জেনোয়া থেকে নিয়ে আসব। আসলে কী জানেন? তাকে ছেড়ে এই সমুদ্রে সমুদ্রে আমি ঘুরি বলেই সে আমার উপর এত চটা। আমার এ কাজ সে মোটেই পছন্দ করে না। নইলে সে আমায় ভালোবাসে খুব। আমরা দু'জন মিলে পাহাড়ের তলায় ছোট্ট একটা কুঁড়েঘর বেঁধে আপেল, পীচ, আঙুর, তরমুজ—এই সব ফলের বাগান করব। সেই সব বিক্রী করে তাতেই আমাদের দু'জনের বেশ সুখে শান্তিতে কেটে যাবে। বেশী টাকাকড়ি আমরা চাই না। আঃ! সে সব কী সুখের দিনই না হবে!' সে স্বর্গ-সুখের আরামে চোখ বন্ধ করে ফেলল।

তখনো ফৈজাবাদীর দেখা নেই। বিরহানলে দগ্ধ হয়ে শয্যা নিল না কী!

যা ভেবেছি ঠিক তাই। খোঁজ নিতে তার কেবিনে গিয়ে দেখলুম কম্বল মুড়ি দিয়ে পড়ে আছে

বললাম, 'কী হুয়া? ফেয়ারওয়েল ডিনারে খেতে নেই গিয়া?'

ম্যালেরিয়া রুগীর মতন কম্বল জড়িয়ে উঠে বসে ক্ষীণ স্বরে বলল, 'কেয়া খায়গা ইমাম সাব, বাঁচকে রহেগা তব্ তো খায়গা। আগ—দিল্‌পে খালি আগ্ জ্বল রহা। ক্যায়সে খায়গা!'

বললুম, 'কিছু ডাক্তার উক্তার না হয় তো দেখানে সে—'

কম্বলটা আর একটু জড়িয়ে নিয়ে বাধা দিয়ে বলল, 'ডাক্‌টারকো পাস্ ইস্ বেমারিকো দাওয়াই নেই হ্যায় ইমাম সাব, ডাক্‌টার বোলাকে কেয়া হোগা? এক পোয়েম লিখা। শুনিয়েগা? হম্ এক পোয়েট্‌ভি হ্যায়।'

বললুম, 'শুনাইয়ে না?'

একটু লাল হয়ে, একটু নিঃশ্বাস ফেলে, গলা খাকারি দিয়ে বালিশের তলা থেকে কাগজ টেনে নিয়ে শুরু করল,—

আগ্ লাগ গ্যায়া। বহত্ ভারি আগ।

কিধার?

উস্ জাগাহ্ পে

যাঁহা দেখা নেই যাতা।

যিস্ জাগাহ কা পাতা নেই হ্যায়।

ডাক্টার আয়া, হাকিম সাব্ভি আয়া,

বহত্ দাওয়াই ভি ডালা,

মোল্লাজী নে দোয়াতাবিজ ভি কিয়া—

মগর আগ নেই বুতা।

উস্‌কে বাদ আয়া দমকল—ফায়ার ব্রিগেড,—

এক, দো, তিন।

পানি ডালা, তলব সুখ্ গ্যায়া,

মগর আগ নেই বুতা॥

ইযে আগ্ খালি উসি সে বুত রহা—

জিস্‌কি আঁখে হ্যায় য্যায়সা কী মোতিয়া,

যিসকি দেখনে গ্যায়সা কী বেহেস্ত কা হুরী॥'

বিরহানলে জ্বলতে পুড়তে অনেককে দেখেছি, কিন্তু এমন কাব্য কারো কাছে শুনিনি!

প্রাণপণে হাসি সামলে বললুম, 'বা! এ তো বহুত্ উম্দা কাব্য হুয়া।'

উৎসাহিত হয়ে বলল, 'এ্যায়সা পোয়েম মেরা আওর ভি হ্যায়, সব আপকো সুনায় গা।'

ভয় পেয়ে গিয়ে কাঁকিয়ে উঠলুম, 'আভ্ভি'?

দ্বিগুণ উৎসাহিত হয়ে বলল, 'হাঁ, আভ্ভি।'

মুখটি যত দূর সম্ভব করুণ করে বললুম, 'আভি মাথাঠো বহুত ঘুরপাক খাতা হ্যায়, লোভে পড়কে বেশী খেয়ে ফেলা হ্যায় কী না, আভি মাথামে কুছ্ নেই ঘুঁসেগা, খামোকা আপকো কাব্যকা অপমান হোগা—বরঞ্চ দুস্‌রা দিন শুনেগা। আভি বরং কাপড়াচোপড়া পরকে চলিয়ে ডেক মে। একটু পরেই গানকা জলসা বৈঠেগা।'

বলল, 'আপ যাইয়ে ইমাম সাব, হাম কেয়া বাচকে হ্যায় জো যায়গা। মুর্দা, ইমাম সাব, হাম মুর্দা হ্যায়।' সঙ্গে সঙ্গে যে ভাবে কম্বল মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়ল তাতে মনে হ'ল জেনোয়ার আগে আর উঠবে না।

মুক্তি পেয়েই দিলুম ছুট। এত সহজে যে রেহাই পাব ভাবিনি।

ডেকে গিয়েই আর এক দৃশ্য দেখে চমকে উঠলুম,—পাহাড়-বিজয়ী দলের যে যাত্রীব সঙ্গে দীনার কেমন যেন একটুখানি হাবুডুবু-খাওয়া সম্পর্ক গড়ে উঠেছে বলে মনে হয়েছিল সে আব একজন সুইস মেয়ের হাত ধরে লউঞ্জের দিকে যাচ্ছে! আমার ধারণাই ঠিক।

দীনার জন্যে মনটা বড় খারাপ হয়ে গেল।

তখনো খেয়েদেয়ে সবাই ডেকে এসে জোটেনি বলে গান শুরু হতে অনেক দেরী—সবেমাত্র একে একে জুটতে শুরু করেছে।

চৌধুরী বলল, 'রায় আর জয়ার কাণ্ডটি লক্ষ্য করেছেন তো'?

বললুম, 'তা আর করিনি!'

বলল, 'শুনেছি প্যারিসে পৌছেই ও'রা প্রেমের গলায় দড়ি দেবে। জানেন তো বিয়ে মানেই প্রেমের আত্মহত্যা?'

বললুম, 'তা হোক, তবু শুভস্য শীঘ্রম।'

'তা বটে—কিন্তু আশ্চর্য!'

'কেন ?'

'এই ক'দিন আগেও রায় বলত বাঙালী মেয়েকে সে কিছুতেই বিয়ে করবে না। করলে করবে কোনো বিদেশীনীকে।'

হাজরা বলল, 'বাঙালী মেয়েদের যা হালচাল তা'তে ও'দেরকে না বিয়ে করাই উচিত।'

বক্তা গোছের মুখার্জি যেন তব্‌লা কোলে নিয়ে আড়চোখে চেয়ে বসে ছিল, হাজরা সেতারে পিড়িং পিড়িং শুরু করে দিতেই সে'ও তাল ঠুকে বলল, 'আমিও তা'ই বলি। এই কলেজে পড়া অল্প শিক্ষিত বাঙালী মেয়েদের মত এমন অপদার্থ জীব আর দুনিয়ায় নেই। অল্প বিদ্যের চেয়ে অজ্ঞতা হাজার গুণে ভালো। অতিজ্ঞানের আছে আলো, অজ্ঞতার আছে ছায়া, কিন্তু অল্পবিদ্যার আছে সর্বনাশা দাহ—সব জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ছারখার করে দেয়। এই অল্প শিক্ষার বিষ পেটে পড়া মেয়েগুলো না পারে উড়তে, না পারে পড়তে, এদের দিয়ে না হয় ঘরের কাজ, না হয় বাইরের কাজ। এরা ঘরেও আগুন লাগায়, বাইরেও।'

দেশ প্রেমিক হাজরা—শুনেছি ও স্বাধীনতার জন্যে না কী এক সময় দেশ প্রেমের চোটে নিজেকে একেবারে উৎসর্গ করে দিয়েছিল—বলল, 'অথচ এ'দের হাতেই আমাদের ভাবীবংশধররা মানুষ হয়ে উঠছে! জানি না তারা সব কী আজগুবি জীব হবে! দেশের আরো কত সর্বনাশ তারা করবে!'

শাফিক শাবান কখন পিছনে এসে দাঁড়িয়েছিলেন জানি না। তিনি বললেন, 'যাদের কথা আপনারা বলেছেন, জয়া নিশ্চয়ই তাদের বাইরে। ব্যতিক্রম সবকিছুরই আছে। রায় বাবা পাকা মালী; নইলে বাগানে এত ফুল্ল ফুটে থাকতে পাতার আড়ালে ফোটা ব্ল্যাক-প্রিন্স গোলাটিকে ও বেছে নিত না।'

আমরা সবাই বললুম, 'তাই যেন হয়,—বাংলাদেশের হাজার

বুনো জংলী ফুলের মাঝখানে হঠাৎ-ফোটা-ব্ল্যাক-প্রিন্স-গোলাপই রায় যেন পেয়ে গিয়ে থাকে।'

আরো খানিক গল্পগুজবের পর আমি বললুম, 'আপনারা কথা বলুন। আমি এখুনি কেবিন থেকে ঘুরে আসছি।'

সুইমিং পুলের ধার ঘেঁষে এগিয়ে যেতে যেতে চোখে পড়ল ডেকের ওই নির্জন প্রান্তে চাঁদোয়ার তলায় আবছা আলো-আঁধারে কয়েকজন মার্কিন মেয়ে পুরুষ খিলখিল হাসাহাসি করতে করতে বেহায়া, নির্লজ্জের মতো যৌবনের পরম ধর্ম যে ভাবে মেনে চলতে শুরু করে দিয়েছে যে, আদিম জগতের আদিম মানুষও সকলের চোখের সামনে এ রকম করতে পারত কি না আমার মনে বড় সন্দেহ আছে।

পৃথিবীতে এই এক জাত—এদের অসভ্যতার কোনো সীমা নেই, বর্ব্বরতার কথা বাদই দিলুম। এদের মধ্যে আমি আজ পর্যন্ত একটা ভালো রুচির নমুনা দেখতে পেলুম না। শুধুমাত্র টাকার জোরে সবাইকে কিনে রেখে সংক্রামক ব্যাধির মতো নিজেদের অসভ্যতার ছোঁয়াচ লাগিয়ে দিয়ে এরা সমস্ত মানুষের রুচির বিকার ঘটিয়েছে; সমস্ত পৃথিবীটাকে চতুর্দিক থেকে উচ্ছন্নে নিয়ে চলেছে বাঁদরামি, শয়তানি ছাড়া এদের আর কোথাও কিছু নেই—জাহাজ, শহরে, বারে, হোয়াইট হাউসে কিম্বা গীর্জায়!

গানের আসর যখন বসল রাত তখন প্রায় এগারোটা। চীন, জাপান, বর্মা, মিশর, ইংল্যাণ্ড, ইটালী, ফ্রান্স, হাঙ্গারী, জার্মানী—সবার গান শেষ হলে লাজুক মিস্টার দত্ত মুখখানি নীচু করে বেহালা নিয়ে বসলেন।

তার পর শুরু হ'ল হেঁড়ে গলায় আঙ্কল্ সামের গান। সে অতুলনীয় অপূর্ব গান যেন গর্দভের মনোমুগ্ধকর সুমধুর হর্ষধ্বনী। গায়কের গায়ে যে রংচঙে জামা, তাতে কোথাও খানিকটা খবরের কাগজের ছবি, কোথাও চিত্রতারকাদের ছবি, কোথাও এ্যাব্বড় বড় গোলাপ ফুল!

শাবান কাউকে কিছু না বলে একখানা বেঞ্চির উপর টান হয়ে শুয়ে পড়লেন। কয়েকজন দেখলুম নিজেদের মধ্যে চোখ টেপাটিপি, হাসাহাসি করতে করতে উঠে চলে গেল। রায় কখন শুয়ে পড়েছিল দেখিনি। হঠাৎ তার নাকের মৃদু ডাক শুনে চমকে উঠলুম। হাজরা দেখি ঝিমোচ্ছে। আমিও ঢুলতে ঢুলতে সবাইকে গুঁতো মারতে শুরু করলুম। কয়েকটা হাঁ করা ইয়াঙ্কি মেম্ কেবল হাঁ করে যেন নিজেদের গান গিলতে লাগল!

হঠাৎ তন্দ্রার ঘোরে মনে হল সমুদ্রের হাওয়ায় যেন কোন্ দূর অজানা স্বপ্নরাজ্যের কত মায়া-সঙ্গীত ভেসে আসছে। গোলাপের আচমকা সৌরভ পরশে যেমন হঠাৎ কোন্ চির অজানা প্রিয়াকে মনে পড়ে গিয়ে অনাদিকালের বিরহ বেদনায় মন উদাস হয়ে যায়, সে সঙ্গীতের সুর যেন তেমনি ব্যাথায় দুলিয়ে মনকে উদাস করে কোথায় উধাও করে নিয়ে চলেছে। শিউলীর গন্ধে যেমন শরতের

অতিভোরে ঘুম টুটে যায়, তেমনি সেই স্বপ্ন-সঙ্গীতের সুরে তন্দ্রা ছুটে গেল।

জেগে দেখি কখন সে সবার গান শেষ হলে জয়া সেতারখানা কোলে তুলে নিয়েছিল জানি না, কিন্তু সেই সেতাবখানির বুক চিরে তখন সুরের অমৃত-ধারা বয়ে চলেছে। কান দুটি একেবাবে মুগ্ধ হয়ে গেল।

শাবানও উঠে বসলেন। যেন এতক্ষণ শুয়ে শুয়ে তিনি কখন জয়ার সেতারের তারে টঙ্কাব বাজবে তারই প্রতীক্ষায় প্রহর গুণছিলেন।

রায় দেখলুম আগেই উঠে বসেছে। আবেগে আমাব হাত চেপে ধরে বলল, 'যাই বলুন ইমাম সায়েব, আমাদের রাগরাগিনী—এ স্বর্গীয় ব্যাপার। এ'র কাছে আর কোনো রাগ বাগিনী লাগতেই পারে না।'

এক মত না হলেও চুপ করে রইলুম।

জয়ার ঘন পল্লবিত চোখদুটি বন্ধ। মাথার মাঝখানে চূড়াব মত করে বাঁধা প্রকাণ্ড খোঁপায়, কোলের সেতার খানায়, কালো মুখে, নীল বসনে ডেকের রঙীন আলো পড়ে সৌন্দর্যের ইন্দ্রজাল সৃষ্টি করেছে। সন্ন্যাসিনী যেন মাথায় জটা বেঁধে কোলে সেতার নিয়ে নিমীলিত চক্ষে পাথরের মূর্তির মত যুগ যুগ ধরে ধ্যানে বসে আছে। সেতারখানা আপনিই বেজে চলেছে, তাকে বাজাতে হচ্ছে না।

কোনো জ্ঞান, কোনো বিদ্যার কাঁচা পাকা কোনো রকম জহুরীই যেমন আমি নই, তেমনি রাগরাগিনীরও নই। তাই কোন্ বাগিনী তার মায়া-আঙুলগুলোর পরশে পরশে সেতারের তারে তারে আকাশভরা কাঁদন তুলে স্বর্গমর্ত ছেয়ে অনন্ত বেদনায় ভারাক্রান্ত করে রেখেছে বুঝলুম না। কিন্তু যৌবনের বিষাদের মত, প্রতিভার

বেদনার মত এক আনবচনায় বেদনার অমৃত পান করে এ টুকু নিশ্চয়ই বুঝলুম যে, শুধু আমারই নয়, সেই আলৌকিক সুরে সুরে এই নিষুপ্ত নিঃঝুম রাত্রে পৃথিবীর ঘরে ঘরে, তারায় তারায়, গ্রহে, চন্দ্রে যে যেখানে ঘুমিয়ে ছিল সকলের ঘুম আচমকা ভেঙে গিয়ে সবাই শয্যার উপর জেগে বসে অবাক হয়ে কান পেতে শুনছে। শুধু তাই নয়—মনে হলো যারা নেই, বহুদিন হলো যাদের গান শোনা শেষ হয়ে গেছে, যারা যুগ যুগ ধরে গভীর ঘুমে অচেতন তারাও ওই সুরের পরশমণির ছোঁয়ায় মুহূর্তের জন্যে চেতন ফিরে পেয়ে আমাদের চারিপাশে ভীড় করে এসে বসেছে।

তখন গভীর রাত। তবু মনে হ'ল পূব-আকাশ লাল হয়ে গেছে। অরোরার সোনার রথ থেকে ওই আলোর তীর এসে পড়ল দিগন্তের ওই লাইট হাউসের মীনার চূড়ায়।

ওই সুরের রূপোর কাঠির ছোঁয়ায় চির-জাগ্রতা শ্যামা-সাগর-সুন্দরীর চোখেও বোধহয় স্বপ্নভরা ঘুম নেমে এসেছে। তাই ভৈরবীর ভৈরবীও আজ নীরব।

॥ ষোলো ॥

লাগে টাকা দেবে গৌরী সেন।

কিন্তু জাহাজে যখন সবাই নিজেই নিজের গৌরী সেন তখন কী আর করব—লোভে পড়ে গিয়ে শেষ পর্যন্ত মরিয়া হয়ে নেপলী, পম্পিয়াইয়ের তেল মাখার জন্যে নিজেরই গাঁট কেটে কড়ি ফেললুম।

ভিঞ্চি বলেছিল, 'উই শিপ কোম্পানী শো ইউ নেপলী পম্পিয়াই, বাস এ্যারেঞ্জ উই।'

সন্ধ্যেবেলায় নেপল্‌স্ এ জাহাজ ভিড়লে বাস এলো। জাহাজ থেকে নেমে আমরা সব সেই বাসে চাপলুম। নেপল্‌স্ শহর তখন আলোয় আলোকময়।

কথায় বলে বাঙালকে হাইকোর্ট দেখানো। আমাদের নেপলীর গাইড ঠিক বাঙালকে হাইকোর্ট দেখানোর মত করেই শহরটার আগামাথা ঘুরিয়ে দেখিয়ে দিল। গাইড ইটালিয়ান।

একেক জায়গায় এক সেকেণ্ডেরও কম সময় বাস দাঁড় করায়—কোথাও আবার দাঁড়ও করায় না—আর গড় গড় করে বলে, এই যে দেখছ বাড়ীটা, এ হচ্ছে মিউজিয়াম; ওই যে দেখছ লম্বা উঁচু মত, ওটা হচ্ছে সীজারের দুর্গ, ইত্যাদি।

সেইজন্যেই মিউজিয়মটা কেমন, দুর্গটা কী রকম তার বর্ণনা যদি দিই তবে আমার সে বর্ণনা ঠিক অন্ধের হাতী বর্ণনার মতই হবে।

গাইড কিন্তু ভয়ানক শিয়েন! আমাদের ও'দিকে একেকটি হাইকোর্ট দেখায় আর তারি ফাঁকে ফাঁকে কায়দা করে বলে নেয়, যাত্রীরা আমায় কিন্তু টিপস্ দিতে যেন ভুলে না যান। অর্থাৎ

অবচেতন ভাবখানা যেন এই যে, আমি তোমাদের ফাঁকি দিচ্ছি বলে তোমরাও যেন আমাকে অষ্ট রম্ভা দেখিও না।

এতখানি পড়ে এবং বইএর নাম, 'সরাইখানার যাত্রী' দেখে পাঠকরা এটা নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছেন যে, আমি কলম বাগিয়ে ঠিক ভ্রমণ কাহিনী লিখতে বসিনি, ভ্রমণ কাহিনী লেখক আমি নই। সেইজন্যে এ কাহিনীর আগাগোড়া একেবারে বর্ণে বর্ণে সত্যি বলে ধরে নেবারও কোনো কারণ নেই। সত্যিমিথ্যের উপর সাহিত্য নির্ভর করে না। সেইজন্যেই যা নিরেট সত্যি খবরের বোঝা তার নাম 'ব্লু বুক'—সে গুদাম ঘরের বস্তাপচা মাল। সাহিত্য আসলে সত্যিও নয় মিথ্যেও নয়

হঠাৎ এ ভূমিকাটুকু এখানে করার উদ্দেশ্য এই যে, ভ্রমণ কাহিনী লিখতে বসিনি বলেই শহর বর্ণনা করা আমার কাজ নয় সেটা জানিয়ে দেওয়া। সে ক্ষমতাও আমার নেই।

কিন্তু তা না হলেও নেপলী দেখে এটুকু না বলে উপায় নেই যে, ভিক্কি যা বলেছিল তা একেবারে বর্ণে বর্ণে ঠিক। স্বপ্নের দেশ তো স্বপ্নের দেশ'ই! আমার মনে হ'ল মাথা থেকে পা পর্যন্ত রং বেরঙের আলোর মালা পরা রাত্রের নেপলী-সুন্দরী যেন স্বপ্নকেও ছাড়িয়ে যায়! এত রঙের এত আলো সত্যি সত্যিই বোধহয় দুনিয়ার আর কোনো শহরে জ্বলে না! মনে হ'ল এইখানেই যদি জীবনটা কাটাতে পারতুম!

শহর ঘুরিয়ে দেখাবার পর গাইড আমাদের খাইয়ে দেবার জন্যে শহরের এক প্রান্তে একটা রেস্তোঁরায় নিয়ে গেল।

তার নীচে থেকেই বয়ে চলেছে আঁকাবাঁকা নদী। খেতে খেতে মধ্যে মধ্যে নীচের দিকে চেয়ে চোখে পড়ল সেই অন্ধকার কালো নদীতে রঙীন আলোর মালা জড়িয়ে মাঝে মাঝে একেকটা

নৌকো ধীরে মন্থরে ভেসে চলে যাচ্ছে। যেন স্বপ্ন-পারাবার থেকে ভেসে আসা একেকটা আলোর নৌকো।

ঝিনুক শামুক কেটে তৈরী এত রকমের এত সুন্দর সুন্দর জিনিষ নেপলীতে পাওয়া যায় যে, দেখে দেখে মনে হয় নেপলীর লোকের মত এমন নিপুণ শিল্পী বোধহয় পৃথিবীর আর কোনো দেশের লোক নয়।

রাত্রে নেপলীর বুড়ি ছুঁয়ে এসে পরদিন সকালে ফের জাহাজ কোম্পানীর বাসে করে গেলুম পম্পিযাইয়ের তেলের গামলায় হাবুডুবু খেতে। পম্পিযাই যাবার পথে নেপলীর একটা বিখ্যাত ঝিনুক শামুকের কারখানা আমরা দেখে নিলুম।

পম্পিয়াইকে প্রাচীর দিয়ে একটা প্রকাণ্ড বাগানের মতো করে ঘিরে রাখা হয়েছে। পিছনে ভিসুভিযাস নিতান্ত ভালো-মানুষের মতো প্রসন্ন মূর্তিতে দাঁড়িয়ে আছে। যেন সে কিছুই জানে না।

আজ অবশ্য সে বৃদ্ধ, পঙ্গু, জর্জ্জরিত। যৌবনের যে অগ্নিতেজে একদিন সে এই পম্পিযাইকে পুড়িয়ে ছারখার করেছে সে আগুন আজ আর ও'র নেই।

যাঁরা জ্ঞান ধরেন, যাঁদের চোখে কল্পনার অদৃশ্য চশমা লাগানো আছে, তাঁরা পম্পিযাইয়ের ভাঙা দেওয়াল আর থামগুলোর মাঝখানেই অনেক কিছু দেখে নিলেন। নিজেদের মধ্যে মৃদু মৃদু সুরে জ্ঞানের কথা আদান প্রদান করতে রইলেন। মুখে সব জ্ঞানী-বাবার হাসি। এমন কী অতীতের এই জীর্ণ কঙ্কালটায় মাংস লাগিয়ে ঠিক মত মূর্তি গড়ে নিয়ে সে যুগে ফিরে গিয়ে রোমাঞ্চিতও হলেন।

আমার জ্ঞাননেত্র, কল্পনার নেত্র অন্ধ। তাই নিতান্ত এই চর্ম-চক্ষু দিয়ে কতকগুলো দাঁত বার করা ভাঙা দেয়াল, থাম আর মূর্তি ছাড়া কিছুই দেখতে পেলুম না। সে যুগেও ফিরে যেতে পারলুম না। নেহাত এ যুগেই রয়ে গিয়ে হংস মধ্যে বক যথা হয়ে হাঁসেদের ডাকাডাকি শুনে ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে দাড়িয়ে রইলুম।

বুড়ো ইটালিয়ান গাইড অবশ্য 'নিতান্ত সরল অর্থ অতি পরিষ্কার' করে সব হিং টিং ছট'ই ব্যাখা করে দিচ্ছিল, কিন্তু কোনো কিছুর সম্পর্কেই যার কোনো ধারণা নেই তার ভোঁতা মাথায় সে সব ঢুকবে কেন!

পম্পিয়াই ঘুরিয়ে দেখাতে দেখাতে হঠাৎ এক কামরার সামনে নিয়ে এসে গাইড যাত্রাদের বলবে, 'দিস রুম নত্ ফর লেদিজ্। লেদিজ্ রিমেন আউত্সাইদ্ প্লিজ।'

মেয়েরা বাইরে অপেক্ষা করবেন, পুরুষ যাত্রীরা বুক ফুলিয়ে ভিতরে গিয়ে দেখতে পাবেন সে সব ঘরের দেয়ালে দেয়ালে রসিক রোমানরা যৌবনের আগল কর্মের সব রসালো ছবি রসিয়ে রসিয়ে এঁকে রেখেছে। গাইডের ভাষায় আরো রস—যদিও একটু বেশী গাঁজিয়ে ওঠে।

মেয়েরা বাইরে রোদে পুড়ে ঘামে ভেজেন বলেই যে তাঁরা এ রস থেকে বঞ্চিত হন্ তা মোটেই নয়—কারন, পুরুষ মেয়েদেরকে যাই ভবুক, মেয়েরা আসলে পুরুষের চেয়ে অনেক বেশী বুদ্ধি ধরে। মেয়েরা পুরুষকে কিনে বিক্রি করে ফের কিনতে পারে। তাই বাইরে দাড়ায়েই মেয়েরা বুঝে নেন্ ভিতরের দেয়ালে কী সব রসের ফোয়ারা বহু শত বছর ধরে গাঁজিয়ে গাঁজিয়ে ঝরছে যে, এ 'রুম নত্ ফর লেদিজ্!'

গাইড তার পর ধীরেসুস্থে চশমার কচে মুছে বলল, 'লোকের ধারণা পম্পিয়াই ভিসুভিয়াসের ফুটন্ত লাভায় ধ্বংস হয়েছিল। কিন্তু

তা ভুল। পম্পিয়াই আসলে ভিসুভিয়াসের গরম ছাইএ চাপা পড়ে গিয়েছিল।' তার পর তার ভুরিভুরি প্রমাণ দিল।

পণ্ডিতেরা তর্কাতর্কি শুরু করলেন। লাভায় ধ্বংস হয়েছিল, না, গরম ছাই চাপা পড়েছিল আমি ও নিয়ে মাথাও ঘামাতে গেলুম না।

আমার সামনে বর্তমানের এত সমস্যা আছে যে, অতীত নিয়ে বুদ্ধি বা সময় খরচ করতে আমি মোটেই রাজি নই।

সব শেয়ালেরই এক রা হতে পারে, তাই বলে ইটালীর সব চিড়িয়াই এক বুলি বলে না কী! নইলে আজকের গাইডও কথার ফাঁকে ফাঁকে সারা পথ'ই কেবল আমাদের স্মরণ শক্তির সংকে উস্কে দিতে রইল কেন—যাত্রীরা, আমায় কিন্তু টিপ্‌স্ দিতে ভুলবেন না!

এই খানেই রুশ, জার্মাণ আর ইংরেজের সাথে আর পাঁচটা জাতের তফাৎ।

কপাল খারাপ, তাই জাহাজে ফিরে আসতেই মিশ্র র সামনে পড়ে গেলুম। বিবি নেই।

মিশ্রা দেখেই রুখিয়ে উঠলেন, 'কই, ইমাম সাহেব, ঘড়িটা নিলেন না? আর সময় কোথায় কাল তো জেনে য়া পৌঁছে যাচ্ছি। মনে রাখবেন, ভাঙা বটে, কিন্তু আসল ওমেগা।

অর্থাৎ ভাবখানা, আপনি কী জিনিষ হারাইতেছেন তাহা আপনি জানেন না!

আমি মনে মনে বললুম, আমি কী জিনিষ হারাইতেছি তাহা আমি খুব ভালো করিয়াই জানি।

মুখে বললুম, 'সে কী ভোলাবার যে ভুলব! সব হবে, ঘাবরে যাবেন না, এখনো অনেক সময় আছে। পম্পিয়াই দেখতে যাননি?'

বললেন, 'না ব্রাদার, ইচ্ছে থাকা সত্ত্বেও কই আর যাওয়া হলো? আমার আবার একটা দোষই বলুন আর গুণ'ই বলুন—আমি বলি দোষ, লোকে বলে গুণ—লোকের উপর অত্যাচার করতে আমার মন ওঠে না। আমার ওয়াইফ প্রেগনেণ্ট সে তো জানেনই? এ অবস্থায় বেশী ওঠানামা, নড়াচড়া ঠিক না—সেইজন্যে গেলুম না। আমার ওয়াইফ অবশ্য কষ্ট হলেও যেতে রাজি ছিল, নলেজ কুড়োবার জন্যে সে সর্বদাই এক পা হয়ে আছে, কিন্তু আপনিই বলুন, সেটা কী তার উপর অত্যাচার হ'ত না?'

বললুম, 'নিশ্চয়ই।'

'আমি অবশ্য একা যেতে পারতুম। আঠারো শিলিং তো হাতের ময়লা। কিন্তু ওয়াইফ যেতে পারবে না, আর আমি গিয়ে মজা করে দেখে আসব—সেটা কী খারাপ দেখায় না, আপনিই বলুন?'

বললুম, 'নিশ্চয়ই। আচ্ছা, এখন কেবিনে যাই, সকাল থেকে ঘুরে ঘুরে বড় ক্লান্তি লাগছে।'

'যান। কিন্তু ঘড়িটার কথা ভুলবেন না—'

'তওবা, তওবা, ও কথাও কী ভুলতে আছে!'

কেবিনে ফিরে এসে দেখতে পেলুম দীনা কাজ করছে। মুখে বড় গম্ভীর থমথমে ভাব। ঝড়ের পাখীর মত উতলা চোখদুটোয় কেমন যেন একটা বিষদের ছায়া।

শুধোলুম, 'এখানে মার চিঠিপত্র কিছু পেলে?'

গম্ভীর উত্তর দিল, 'উঁহু।'

বললুম, 'No news is good news. ভাবনার কিছু নেই। কাল জেনোয়ায় পৌঁছে যাচ্ছি—কালকেই মায়ের দেখা পাবে।'

কাজ করতে করতে তেমনি মৃদু সুরেই ছোট্ট একটুখানি উত্তর দিল, 'হুঁ।' তার পর নীরবে কাজ কর্ম সেরে নীরবেই চলে গেল।

জাহাজে ফিরে অব্দিই কেমন একটু জ্বর জ্বর লাগছিল। তাই তাড়াতাড়ি কম্বল মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়লুম।

ঘুম ধরে এসেছিল। হঠাৎ খুট্ করে একটু শব্দ হ'তেই চোখ মেলে দেখি সোনিয়া। কোলে বাচ্চা।

আজ আবার তাঁর সারা মুখে সেদিনকার সেই অপরূপ মাতৃত্বের মূর্তি বিকশিত হয়ে উঠেছে। দুই চোখে অসীম মমতা নিয়ে মা'য়ের মত করে ঝুঁকে পড়ে শুধোলেন, 'অসুখ করেছে? দীনা বলছিল।'

মুগ্ধ হয়ে গেলুম। একটু থতমত করে অবাক হয়ে তাঁর মুখের দিকে চেয়ে থেকে বললুম, 'ও কিছু নয়, সামান্য একটু জ্বর জ্বর—।'

কপালে হাত দিয়ে দেখে বললেন, 'সামান্য নয়, বেশ জ্বর। ওষুধ দরকার কাল সকালেই জেনোয়ায় পৌঁছচ্ছি। সুতরাং আজকের মধ্যেই ভালো হয়ে ওঠা চাই। ফেলে রাখলে চলবে না। আমি ডাক্তারকে ডেকে আনছি।'

একটু পরেই শফিক শাবান, ভ্রিমিদভ, সোনিয়া আর জাহাজের ডাক্তার এলেন।

ওষুধ খেয়ে বিকালের দিকে অনেকখানি চাঙা হয়ে উঠলুম।

সন্ধ্যায় জাহাজ নেপলী বন্দর ছেড়ে চলল।

॥ সতের ॥

বেলা দশটার কাছাকাছি হঠাৎ কানে এলো, 'আতুচ্চে, আতুচ্চে প্লিজ—'

কান খাড়া করে আগ্রহে হয়ে শুনলুম, 'জাহাজ আর একটু পরেই জেনোয়া পৌছবে।'

জেনোয়া আমাদের শেষ বন্দর। এখান থেকে সবাই আমরা দেশ দেশান্তরে ছড়িয়ে পড়ব।

যাত্রীরা সব ডেক ছেড়ে যে যার নিজের কেবিনে গিয়ে মালপত্র বাঁধাছাঁদা করতে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন।

দানাও আজ সকাল থেকে এত বেশী ব্যস্ত যে, মনে হয় তার মরবার ফুরসৎ নেই। ডেকেও সাড়া পাওয়া যাবে না।

এতদিন যে সব তোয়ালে, বিছানার চাদর, বালিশের ওয়াড়, কম্বল সে যাত্রীদের ব্যবহারের জন্যে কেবিনে কেবিনে বিলি করেছে আজ তাকে সব হিসাব মিলিয়ে জড় করতে হবে।

মালপত্র গুছিয়ে নিয়ে সোনিয়া, দ্রিমিদভ এবং জাহাজের আরো অন্যান্য বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে একবার শেষ দেখা করে এলুম।

সোনিয়া-দ্রিমিদভ জেনোয়াতেই ঘর বেঁধেছেন। সুতরাং এখানেই তাঁদের শেষ। আমাদের মক্কা এখনো অনেক দূর।

সোনিয়া আর দ্রিমিদভকে একটু কবিত্ব করে বললুম, মধুর দিনগুলো জীবন থেকে চলে যায়। শুধু তার বেদনাময় স্মৃতিগুলো থাকে। হারানো দিনের স্মৃতির চেয়ে মধুর বোধহয় আর কিছুই নেই। মাঝে মাঝে একলা বসে মনে মনে এই স্মৃতিগুলোর কথা

ভাবতে ভারি ভালো লাগে। জাহাজের এই আমাদের রঙীন দিনগুলোর কথা আমি অনেক সময় ভাবব। তখন মধুর বেদনায় মনটা দুলে দুলে উঠবে। ভারি ভালো লাগবে।

এমন সময় খবর ঘোষণা হ'ল—'আতুচ্চে, আতুচ্চে প্লিজ। জাহাজ জেনোয়ায় পৌছল।'

হঠাৎ মনটা কেমন খারাপ হয়ে গেল। এ্যাদ্দিন থেকে থেকে জাহাজটার উপর কেমন যেন একটা মায়া পড়ে গিয়েছে।

আজ এ'র সঙ্গে সব সম্পর্ক শেষ।

জাহাজ থেকে নেমে যাবার আগে একবার ভাবলুম দীনার সঙ্গে দেখা করে যাই, কিন্তু কোথাও তাকে খুঁজে পেলুম না।

তার পর গেলুম ভিঙ্কিব খোঁজে। কিন্তু সে'ও যে ভীড়ের মাঝে কোথায় হারিয়ে গিয়েছে দেখতে পেলম না।

লিওনার্দোর কাছ থেকে বিদায় নিচ্ছি, এমন সময় চোখ পড়ল অরোবা রাজরাণীর গর্বে লিওনার্দোর চোখের সামনে দিয়েই সেই চকচকে ফরাসী ছোকরার সঙ্গে হাত ধরাধরি করে জাহাজঘাট থেকে বেরিয়ে গেল।

রেল পাব সন্ধ্যায়। তাই জাহাজঘাট থেকে বেরিয়ে এসে মালপত্র সব তিনশো, না, চারশো, লীরা দিয়ে ষ্টেশনে জমা রেখে আমি আর শাবান দুই মানিকজোড় বেরোলুম শহর দেখতে।

জেনোয়া শহর 'আহা মরি'ও নয় আবার 'ছি ছি মরি'ও নয়। অর্থাৎ এ মেয়ের বিয়ের জন্যে ভাবতে হয় বটে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত বর জোটে।

এক ইটালিয়ান মেয়ের ফলের দোকানে আঙুর কিনতে গিয়ে হাজরার সঙ্গে দেখা।

বলল, 'আর শুনেছেন? আপনারা তো জাহাজ থেকে নামছে

না নামতেই কাস্টমসের মুঠো থেকে পাঁকাল মাছের মত পিছলে বেরিয়ে এলেন। কিন্তু ও'দিকে আপনাদের সেই মিঞাবিবি যে জালে ধরা পড়ে গেছে। কী ব্যাপার জানেন? বিবি আসলে সত্যি সত্যিই প্রেগনেণ্ট্ নয়, পেটের মধ্যে সোনার একটা মস্ত থলি বেঁধে লুকিয়ে রেখেছিল। ধরা পড়ে গেছে।'

শুনে স্তম্ভিত হয়ে গিয়ে আমরা মুখ চাওয়াচাওয়ি করতে লাগলুম। তার পর শুধোলুম, 'কী করে ও'রা জানতে পারল বলুন তো?'

হাজবা বলব. 'তা ঠিক জানি না। তবে এই করে করে কাসটম্সের লোকেদের চোখ এক্সরে হয়ে গেছে, ও'দের ফাঁকি দেওয়া মুস্কিল। তা ছাড়া জানেন তো, একটা মিথ্যেকে আর পাঁচটা মিথ্যেব ধামা চাপা দিয়ে ঢাকতে হয়, আর তারি ফাঁকে ফুটো গলে বেড়াল বেবিয়ে পড়েই হাঁক ছাড়ে ম্যাঁও? বিবির বেড়ালও বোধহয় অমনি করেই বেরিয়ে পড়েছে! আর একটা খবর শুনুন। আপনার ভিঞ্চিকে দেখলুম জাহাজ থেকে নেমে সোজা ষ্টেশনের পাশের মদেব দোকানটায় গিয়ে ঢুকল।'

সন্ধ্যেবেলায় রায় আর জয' রুমাল উড়িয়ে আমাদের বিদায় দিল। ওরা আজ রাতটুকু জেনোয়ায় থাকবে। কাল সকালে গাড়ীতে যাবে প্যারিস।

আমি, শফিক শাবান. চৌধুরী. হাজবা আর ফৈজাবাদী এক কামরা দখল করে বসলুম।

এক কোনে একজন বেঁটে, মোটা স্প্যানিশ থেকে থেকেই ঝুলি থেকে একটা পেট মোটা খড় প্যাঁচানো বোতল বার করে কী যেন ঢকঢক করে মুখে ঢালতে লাগল।

ফ্লেশ কালারের আঁট ব্লাউজ আর জিন্ পরা কয়েকটা ধাড়ি

গোছের আমেরিকান মেয়ে মুখে বিশ্বজয়ের ভাব করে বুক ফুলিয়ে কামরায়, করিডোরে ঘোরাঘুরি করে বেড়াচ্ছে। গায়ের সঙ্গে কাপড়ের রং এমনি বেমালুম মিলে গেছে যে, কিছু পরে আছে বলেই মনে হয় না! তাদের হাবভাব দেখে মনে হয় এই এক রেল যাত্রীর সামনে বেহায়ার মতো ফ্লেশ কালারের ব্লাউজ, জিন্ পরে তারা যেন কী মস্ত বাহাদুরিটাই করছে আর কি! মাথায় রঙীন রুমাল বাঁধা কয়েকজন ইটালিয়ান মেয়ে লজ্জায় চোখ ঘুরিয়ে নিল।

একে একে সব কামরা গুলোই ভর্তি হয়ে গিয়ে শেষে করিডোরে পর্যন্ত নানান রঙের দিশিবিদিশী ব্যাঙ্গোমাব্যাঙ্গোমীর মেলা বসে গেল। রেল ছুটে চলল।

ইটালীর গ্রামগুলো জ্যোৎস্নার রূপালী ওড়না জড়িয়ে কৌতুক-চঞ্চলা দুষ্টু মেয়ের মতো আমাদের দিকে উঁকি দিয়ে দিয়ে পালিয়ে যেতে লাগল।

এক সময় চেয়ে দেখলুম আল্পস্ চাঁদের মুকুট পরে দাঁড়িয়ে আছে।

একজন ফরাসী বুড়ো গম্ভীর হয়ে করিডোর থেকে আমাদের কামরায় ঢুকে একটু বসতে চাইল। আমরা জায়গা করে দিলুম।

না আমরা তার ভ্যাঁ ভোঁ বুঝি, না সে আমাদের ট্যাঁ পোঁ আঁ বোঝে। কিন্তু বসেটসে আভাসে ইঙ্গিতে, তার পর পকেট থেকে বিশ্রী ছবি বার করে এমন সব রসিকতা শুরু করল যে, আমাদের দেশের সবচেয়ে ইতরজনও একটু ইতস্তত করবে।

এক সময় সে কী একটা ষ্টেশনে নেমে গেল।

তার পর এলো এক বুড়োবুড়ি তাদের গোলাপ ফুলের মত পাঁচ ছ' বছরের ছোট্ট মেয়েটাকে নিয়ে। মাথায় তার সোনালী চুল, গায়ে লাল টকটকে পুলোভার আর সবুজ রঙের ফ্রক। মুখটা লাল

টুকটুকে। হাত, পা সব একেবারে গোলগাল, তুলতুলে, ডলি পুতুলের মত। আদর না করে কেউ থাকতে পারবে না।

তার বাপ, মা অনেক অনুনয় বিনয় করে বলল, 'বাচ্চা মেয়ে, করিডোরে আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারছে না, শুধু ও'কে বসবার মত একটু যদি জায়গা করে দেন।'

মেয়েকে বসিয়ে তারা বাইরে চলে গেল।

ওইটুকু মেয়ের কী গর্ব! আমি তাকে রাগাবার জন্যে শুধোই, 'ইংলিশ?'

ভুরু কুঁচকে, বড় বড় নীল চোখ ঘুরিয়ে, ঠোঁট ফুলিয়ে গানের সুরের মত করে বলে, 'ইতালিয়ানা।'

যেন বুঝতে পারছি না এমনি ভাব করে বলি, 'ফ্রেঞ্চ?'

আর সে'ও তত রেগে গিয়ে, ঠোঁট ফুলিয়ে, কাঁদো কাঁদো হয়ে গর্ব করে বলে, 'ইতালিয়ানা।'

অনেকক্ষণ থেকেই ঘুমে ঢুলছিল। ঢুলতে ঢুলতে কামরা আলো করে ঘুমিয়ে পড়ল।

তার পর এসে জুটল দুটো ইয়া তাগড়াই গ্রীক।

তাদের মুখেও ওই একই বুলি, 'আর বাইরে দাঁড়িয়ে থাকতে পারছি না। একটু বসবার জায়গা দিয়ে বাঁচান।'

এরা সব জাহাজে কাজ করে। নিউক্যাসেলে চলেছে তাদের জাহাজ ধরতে।

মাঝরাতে ইটালীর সীমানা পার হয়ে রেলগাড়ী ফ্রান্সের ভিতর দিয়ে ছুটে চলল।

সকালের আলোয় দেখলুম ফ্রান্সের গ্রামগুলো বড় সুন্দর—একেবারে ঘন রেশমী সবুজ।

রেল লাইনের দু'পাশে সবুজের মখমল পাতা ঢেউ খেলানো মাঠ, বড় বড় গাছপালা, জঙ্গল, মাঠে ছোট ছোট, সাদা সাদা,

গোল গোল গোরু চরছে দেখে বোঝাবার উপায় নেই ফ্রান্সের ভিতর দিয়ে চলেছি, না, আমাদের দেশের ভিতর দিয়ে চলেছি। সেই একঘেঁয়ে দৃশ্য। কেবল মাঝে মাঝে বনের ভিতর থেকে একেকটা ঢালু ছাদওয়ালা বাড়ী, ফ্রক পরা মেম দুধও'লী, কোট প্যাণ্টালুন পরা চাষা উঁকি দিয়ে দিয়ে মনে করিয়ে দিল এ শুধুই বিদেশ নয়, ভয়ানক বিদেশ।

এইবার এক লাফে চলুন যাই প্যারিস। প্যারিসে পৌঁছে ট্রেন গেল বিগড়ে। খবর পেলুম পাঁচ ছ' ঘণ্টার আগে ফের ট্রেন চলবার কোনো আশা নেই। সময় কাটাবার জন্যে আমরা সব নেমে পড়লুম প্যারিস দেখতে। কিন্তু প্যারিসের কথা এখানে থাক। প্যারিস আর প্যারিস-সুন্দরীর কাহিনী যেখানে সেখানে।

প্যারিস থেকে আর এক লাফ মেরে চলুন যাই বুলোন। বুলোন থেকে লাফ মেরে ইংলিশ চ্যানেল পার হয়ে ফোক্‌স্টোন।

ফোক্‌স্টোন থেকে আর লাফ নয়, বৃষ্টিতে ভিজে ভিজে গড়িয়ে গড়িয়ে রাত বারোটার সময় চলুন পৌঁছনো যাক লণ্ডন।

॥ আঠার ॥

লণ্ডনে পৌঁছে চির বিমুখ ভাগ্য আমার হাতে ইস্কাবনের বিবি নয়, ইস্কাবনের টেক্কা তুলে দিল। তাই থাকার জায়গা পেয়ে গেলুম নাইট্‌স্‌ব্রিজে। সোজা কথা নয়। লণ্ডন শহরের একটা সেরা পাড়া।

শফিক শাবান পেলেন শেফার্ডস্ বুশে। ফৈজাবাদী হর্নসে রাইজে। চৌধুরী-হাজরা একদিন লণ্ডনের ডালে বসে একটু জিরিয়ে নিয়ে আমেরিকায় উড়ে গেল।

ভোরবেলায় প্রথমে —তখনো অন্ধকার ভালো করে কাটে না— এক দল ঘোড়সওয়ার আমার বাড়ীর সামনে দিয়েই সার বেঁধে টগ্‌বগিয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে যায় হাইড পার্কে। ঘোড়াগুলোর খটাখট ক্ষুরের শব্দে রোজ আমার ঘুম ভেঙে যায়।

তার পর জানালায় দাঁড়িয়ে দেখতে পাই শীতে কাঁপতে কাঁপতে, বৃষ্টিতে ভিজে ভিজে কাগজওয়ালা ছোকরারা ছোট ছোট সাইকেলে করে এসে সামনের বাড়ীগুলোর দরজায় দরজায় কাগজ রাখছে।

তার পর আসে কালো পোশাক পরা পিওন। পিঠে তাদের চিঠির সাদা থলি। তারাও বাড়ীতে বাড়ীতে চিঠি বিলি করে চলে যায়।

তারো পরে আসে দুধওয়ালা তার গাড়ী নিয়ে। শিস দিতে দিতে বাড়ীগুলোর বন্ধ দরজার সামনে সামনে সাজানো খালি দুধের বোতলগুলো তুলে নিয়ে তার জায়গায় ভরা দুধের বোতল সারি সারি সাজিয়ে রাখে।

অর্থাৎ ঘুম থেকে উঠে যে যার দরজা খুললেই দেখতে পাবে বাইরে কাগজ, চিঠি, দুধ সব জমা হয়ে আছে। বাইরে থাকলেও কোনো জিনিষ চুরি হয়ে যাবার ভয় নেই।

আমি সেই দুধের বোতলের লাল টুপিটা খুলে ফেলে যেই চুমুক দিতে যাব অমনি শুনব দরজায় কে নক করছে। খুলে দেখব কালো ফেল্টের টুপি আর লম্বা চেস্টারফিল্ড-ওভারকোট পরে বৃষ্টিতে ভিজে ভিজে শেফার্ডস্ বুশ থেকে এসে গেছেন শফিক শাবান। তাঁরো হাতে এক দুধের বোতল।

প্রথমে খানিকক্ষণ বাঁশি বাজাবেন। তার পর বোতলের টুপি খুলতে খুলতে বলবেন, 'চলুন,—আর কেন? কোটটা গায়ে চাপিয়ে নিন্।'

আকাশ অন্ধকার। বাইরে বৃষ্টি। ঠাণ্ডা হাওয়ার ডানায় বরফের ঝাপট।

একবার সভয়ে বাইরের দিকে চেয়ে আমিও গায়ে ভারি ওভার-কোটটা চাপিয়ে নোব।

তার পর যাব আমরা দুজনে প্রথমে হাইড পার্ক। আমার বাড়ী থেকে পাঁচ মিনিটের পথ। পার্কের সাদা কালো ভীতু খরগোশগুলো আমাদের জুতোর শব্দে পালিয়ে যাবে, পায়রাগুলো পালাবে না।

এ বাগান সমতল নয়। ঢেউ খেলানো উঁচু নীচু। ঘাসের ঘন সবুজ মখমল পেতে সমস্ত বাগানখানাকে মুড়ে রাখা হয়েছে। তার মাঝে আঁকাবাঁকা কালো কালো রাস্তাগুলো যেন ওই সবুজ মখমলের কালো পাড়।

সারপেণ্টাইনের ধার ঘেঁষে খানিক বেড়িয়ে এ বাগান ছেড়ে যাব আমরা গ্রীন পার্কে। এ বাগানও ঢেউ খেলানো। এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত সবুজ রেশম বিছানো। বড় বড় গাছগুলো

পাতা ঝরিয়ে এ'র কালো পথে পথে নানান রঙের গালিচা পেতে দিয়েছে। এ'র ঘন সবুজের ছোঁয়ায় একটুকু ঘুম ধরে, একটু স্বপ্নের নেশা লাগে। এখানের বাতাসে পর্যন্ত যেন একটখানি হাল্কা সবুজ রং লেগে গিয়েছে।

তার পর এই গ্রীন পার্কেরই গালচে পাতা পথ আর সবুজ হাওয়া চিরে যাব বাকিংহাম প্যালেসের সামনেটায়।

প্যালেসের গার্ডগুলো একেবারে নিশ্চল, নিশচুপ হয়ে পাথরের মূর্তির মত দাঁড়িয়ে আছে। মাথায় তাদের ভালুক লোমের প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড টুপি তাতে সোনালী চেন। গায়ে আঁটসাঁট, চকচকে লাল-কালো পোশাক।

কেউ আবার কলের পুতুলের মত এ গেট থেকে ও গেটে আপন মনে গম্ভীর হয়ে মার্চ করে বেড়াচ্ছে। তার হাবভাব দেখলে হাসি পায়। মার্চের তালে তালে তার ভারি বুটের যে শব্দ হয় তাতে কানে তালা লাগে।

একটা না একটা ছোটোখাটো ভীড় ওখানে লেগেই আছে। কেউ ওদের ফোটো তোলে ; ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা দুষ্টুমি করে কেউ ও'দের গোপ ধরে একটু টেনে দেয়, কেউ কাপড় ধরে টানে,—তবু ও'দের নড়নচড়ন নেই, তেমনি গম্ভীর হয়ে নিশ্চল দাঁড়িয়ে থাকে। মাথায় ভালুক লোমের যে বৃহৎ মৌচাকটি পরে আছে তাতে ভুরু পর্যন্ত ঢাকা পড়ে গেছে, চোখদুটি শুধু খোলা,—ছেলেমেয়েদের দুষ্টুমিতে সেই টুপির তলায় চোখদুটি শুধু ঘন ঘন বাঁই বাঁই করে এদিক ওদিক ঘুরতে থাকে।

বাকিংহাম প্যালেস রাণীর বাড়ী হলেও বাড়ার রাণী নয়।

এখানে খানিকক্ষণ গার্ডগুলোর মজা দেখে ভিক্টোরিয়ার প্রকাণ্ড মূর্তিটার সিঁড়ি বেয়ে ওপারে নেমে যাব আমরা সেণ্ট জেমসেস্ পার্কে। এখানে খানিক বেঞ্চিতে বসে জিরিয়ে নিয়ে তার পর

আবার সেই গ্রীন পার্কের সবুজ নেশায় ডুবে, সবুজ ছায়ায় চোখে ঘুমের আমেজ লাগিয়ে, সবুজ হাওয়ায় বুক ভরে পিকাডিলি ধরে সোজা এগিয়ে গিয়ে 'এরসে'র ফোয়ারার ছিটেয় একটু গা ভিজিয়ে ডান দিকে বেঁকে হে-মার্কেট হয়ে যাব ট্রাফালগার স্কোয়ারে।

এইখানে আছে বিরাট উঁচু থামের উপরে নেলসনের মূর্তি, ফোয়ারার উৎস। বিরাট বিরাট কালো পাথরের সিংহ সমস্ত চত্বরটাকে পাহারা দিচ্ছে।

এইখানে ফোয়ারার চারিপাশে শত শত উজ্জ্বল পায়রা সব সময় মেলা বসিয়ে রেখেছে। তারই সাথে সাথে লেগে যায় রংবেরঙের ছেলমেয়ের ভীড়। পায়রাগুলো মাথায়, কাঁধে, হাতের উপর উড়ে এসে বসে—একটও ভয় করে না। যেন সবাইকে বন্ধু বলে কত কাল ধরে চেনে। এ'দের এত আদর লাগে যে, কিছুতেই কিছু না খাইয়ে পারা যায় না।

এ'র সামনেই ন্যাশানাল আর্ট গ্যালারী।

বাইরে থেকে বাড়ীটা দেখে বিশ্বাসই হয় না এই বিখ্যাত ন্যাশানাল আর্ট গ্যালারী বলে। কিন্তু একবার ভিতরে পা দিলে মনে হবে এ'র ভিতরেই যদি সারা জীবনটা থাকতে পারতুম!

এ গ্যালারীতে পুরনো ওস্তাদদের ছবিই বেশী। নতুনদেরও কিছু কিছু নমুনা আছে। তবে নতুন ওস্তাদদের রকমারি ওস্তাদির খেল্ দেখা যায় টেম্স্ নদীর ধারে টেট্ গ্যালারীতে। অবশ্য পুরনোরা যে, একেবারেই সেখান থেকে নির্বাসিত তা নয়। কেউ কেউ বিদ্রোহীদের মাঝখানে পড়ে গিয়ে ভয়ে ভয়ে উঁকি দিচ্ছেন। বিশেষ করে কতকগুলো ঘরে একচ্ছত্র রাজত্ব করছেন মহাশিল্পী টার্ণার। কিন্তু সে সব পরের কথা।

রোজ দেখি এই ন্যাশানাল আর্ট গ্যালারীর একদিকের গেটের কাছে এক বুড়ো ভিখিরী তার টুপিটাকে উল্টে রেখে এক মনে রঙীন

চক দিয়ে ফুটপাথের উপর ছবি এঁকে চলেছে। আর যত পয়সা সব জমা হচ্ছে সেই উল্টোনো টুপির ভিতর। আমাদের দেশের ভিখিরীদের মত এরা মুখ ফুটে কখনো বলবে, না ভিক্ষে দাও।

আর একদিকেব গেটে এক মাঝ' বয়সী মেয়ে ফুল বিক্রী করে। নানান রঙের ফুলের মাঝখানে ওর তিন চাব বছরের ছোট্ট মেয়েটাও একটা আধ ফোটা গোলাপের কুঁড়ির মত ফুটে থাকে।

আমবা ওই পায়রাগুলোকে খাইয়ে, ভিখিরীটার ছবি দেখে, তার উল্টোনো টুপিতে পেনি ফেলে, ফুলওয়ালীটার কাছ থেকে দু'একটা ফুল কিনে, তার মেয়েটাকে একটু আদর করে তার পব এইখান থেকে হয় বাসে করে নয় হাঁটতে হাঁটতে যে যার কাজে চলে যাব।

বাসেব ভাড়া এখানে বড্ড বেশী। তাই হু' কথায় বাস এখানে জবড়জং খাঁ'র নাতিও কবতে পারে না। এ শহরে প্রথম এসেই চোখে পড়ে বুড়োবুড়ি, ছেলেমেয়ে হাতে এক গাদা বোঁচকাবুঁচকি ঝুলিযে, বৃষ্টিতে ভিজতে ভিজতে, শীতে কাঁপতে কাঁপতে সব একেবারে পাগলের মত উদ্ধশ্বাসে হেঁটে চলেছে। কেউ কেউ আবার মাঝে মাঝে দৌড়য় !

এক মুহূর্ত যেন কাবে। দাঁড়াবাব সময় নেই ! সবায়ের চলন বলন, মুখের ভাবখানা দেখলে মনে হয় এক মুহূর্ত দাঁড়ালেও যেন জগৎখানা উল্টে যাবে !

লণ্ডনের প্রথম তিনদিন এমনি করেই কাটল।

॥ উনিশ ॥

চারদিনের দিন রবিবার পড়ল।

সকাল বেলায় একটু সময় পেয়ে বাক্সো থেকে দরকারি জিনিষ-গুলো বার করে হাতের কাছে গুছিয়ে নিচ্ছি, এমন সময় শেফার্ডস বুশ থেকে হাজির হলেন শফিক শাবান।

এসেই মাথা থেকে ভিজে টুপিটা খুলে টান মেরে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বললেন, 'চলুন, আমায় একবার ল্যাঙ্কাষ্টার রোডে যেতে হবে। বড্ড দরকার।'

বললুম, 'ল্যাঙ্কাষ্টার রোড? সে আবার কোথায়?'

শফিক শাবান হেসে উঠে বললেন, 'আমিও চিনি না। খুঁজে বার করতে হবে। কোন এরিয়া তা'ও জানি না। শুধু ল্যাঙ্কাষ্টার রোড আর বাড়ীর নম্বর—এই দুটি জিনিষ মনে আছে।'

অচেনা লণ্ডন শহরে রাস্তা খুঁজে বার করা এমন কিছু কঠিন কর্ম নয় সে অভিজ্ঞতা আমার এই তিন দিনেই হয়ে গিয়েছে। রাস্তায় রাস্তায় ম্যাপ টাঙানো আছে। ছোট ছোট ম্যাপ কিনতেও পাওয়া যায়। তা ছাড়া পুলিশদের শুধোলেও হয়। তারা সব মাথায় কালো টুপি আর গায়ে কালো পোশাক পরে ভারি ওভারকোট চাপিয়ে আমাদেরকে সাহায্য করবার জন্যে রাস্তায়ঘাটে গম্ভীর হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। অমন পুলিশ আর কোথাও আছে কী না আমি জানি না। আশেপাশে কোথাও চোখে দেখতে না পেলেও যেখানে দরকার ভানুমতীর খেলের মত মাটি ফুঁড়ে বেরোয়!

তা ছাড়া আমি এই তিন দিনেই দেখেছি রাস্তার লোকেরাও এত ভদ্র যে, শুধু মুখের কথায় না চিনতে পারলে—বিশেষ করে বিদেশী দেখলে—দূরে হলেও নিজে সঙ্গে করে নিয়ে গিয়ে রাস্তা দেখিয়ে দেয়।

তাই বললুম, 'চলুন তা'হলে পুলিশ কিম্বা রাস্তার লোক কাউকে শুধোনো যাক।'

শফিক শাবান হীটারের ধারে বসে বাঁশিতে এলোমেলো সুর বাজাতে বাজাতে বললেন, 'সেটি হচ্ছে না। পুলিশ, ম্যাপ, রাস্তার লোক,—এ'দের সবাই শুধোয়। আমি নিজে হচ্ছি খাপছাড়া লোক, তাই এই তিন দিনে লণ্ডন শহরে বেছে বেছে সবচেয়ে অদ্ভুত লোক যে আমার চোখে পড়েছে কপাল ঠুকে তাকেই শুধোব। চলুন।'

একটু অবাক হয়ে বললম, 'কে?'

তিনি হেসে উঠে বললেন, 'চিনতে পারলেন না তো? অথচ তাকে আপনারই প্রতিবেশী বলা চলে। সে থাকে হাইডপার্ক কর্ণারে—ঠিক বাসস্ট্যাণ্ডগুলোর সামনেই ফুটপাথে।'

'ফুটপাথে!'

'হ্যাঁ। সে একজন ভিখিরী। তাড়াতাড়ি চলুন।'

শফিক শাবান আমাকে হাইডপার্ক কর্ণারে ভিখীরিটার কাছে নিয়ে গেলেন।

হাইডপার্ক কর্ণার থেকে এই তিনদিনে বহুবার বাসে চেপেছি, এখান থেকে পায়ে হেঁটেও বহুবার যাতায়াত করেছি, কিন্তু সে আমার চোখে পড়েনি। অথচ শেফার্ডস বুশের শফিক শাবানের চোখে সে ঠিক পড়েছে।

তার মাথায় এক মাথা রুক্ষ বাবরী চুল। পাইরেট গোছের চেহারা। গায়ে যে কাপড়গুলো আছে আজ আর সে গুলোর আসল রং চেনবার উপায় নেই। মনে হয় সে গুলো খুব কম করে হ'লেও

অন্তত বছর পনের আগে গায়ে চেপেছে। তার পর আর গা থেকে নামেনি। বয়েস পঞ্চাশের কাছাকাছি বলেই মনে হল। লম্বায় চওড়ায় চেহারায় মিলিয়ে হঠাৎ দেখলে মনে হয় যেন বার্ণার্ড শ'র এ্যাণ্ড্রক্লিস এ্যাণ্ড দি লায়ন বায়োস্কোপের পর্দা থেকে স্বয়ং ফেরোভিয়াস নেমে এসে হাইড পার্ক কর্ণারে ভিক্ষে করছে। মনে হল একটু ছিটগ্রস্ত। মস্তান গোছের!

দেখলুম রোদ পোয়াতে পোয়াতে মহা ফূর্তিতে ফুটপাথেব উপর রঙীন খড়ি ঘষে ঘষে ছবি আঁকছে sunset after rain. সামনেই পার্কের রেলিঙে একটা নোটিশ লটকে বেখে দিয়েছে, Don't take photo here. সম্পত্তিব মধ্যে একটি সাদা জগ, একটি বাসন, একটি পাইপ। পাশে রাখা উল্টোনো টুপিটা পেনিতে ভর্তি।

তা ছাড়া আমার মনে হ'ল আজ তার কাছে আসা আমাদের ভুল হয়েছে—রবিবাবে সে যেন ভয়নক ব্যস্ত! ডেকেও বোধহয় সাড়া পাওয়া যাবে না!

আজ রবিবারে লণ্ডনের সব হাতুড়ে আর্টিষ্টরা মোটরে, মোটর-সাইকেলে করে সারা সপ্তাহের ছবির ঝাঁপি নিয়ে এসে হাইড পার্ক কর্ণারে ছবির মেলা সাজিয়েছে. সারাদিনটা তাদের আজ এখানেই কাটবে। সঙ্গে আছে স্যাণ্ডউইচ, বিস্কুট, আপেল, চকোলেট—খাওয়াদাওয়াটাও আজ এইখানেই হবে। দর্শকদেব ভীড়। জোর বেচাকেনা।

তারা পার্কের রেলিঙে নোটিশ ঝুলিয়ে রেখেছে—'এখানে পোরট্রেট করা হয়। পেন্সিলে দশ মিনিটে। কালি কলমে পনের মিনিটে।' কোনো কোনো দর্শক—বিশেষ করে মেয়েরা—কোনো এক নির্জন দিকে গিয়ে তাদের দিয়ে পোরট্রেট আঁকাচ্ছে।

সে'ও আর্টিষ্ট, তাই ভিখিরী হ'লে কী হ'বে—সে'ও তাদের সঙ্গে ভয়নক মেতে উঠেছে। ফুটপাথে ছবি আঁকতে আঁকতে হঠাৎ

ব্যস্ত হয়ে নিজের আস্তানাটি ছেড়ে তাদের মাঝখানে গিয়ে একবার চারিদিকে চেয়ে তাদেরকে মোড়লী করে বলছে, 'জন, তোমার এ ছবিটা কিন্তু ভালো হয়নি, এখানে এত চড়া রং দিলে কেন?' 'মেরী, তোমার নিগ্রো মেয়ের ছবিটা মন্দ হয়নি, ওই লাইনে তুমি হাত পাকাও, ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল।' 'আরে, আরে রেবেকা, তুমি করছ কী? অত ব্রাইট ছবি খানার পাশে অত ডাল ছবিখানা টাঙাচ্ছো? ছেলেমানুষ, অভিজ্ঞতা চাই, অমনি হয়না।' 'ও হে হ্যারী, তুমি কিন্তু বাপু দিন দিন কাজে ফাঁকি দিচ্ছ, আগের মত ছবি আর তোমার ভালো হচ্ছে না; এমন করলে জেরবার হবে তা কিন্তু বলে দিচ্ছি।'

সবাই তাকে চেনে, তাই কেউ তার কথায় রাগ করছে না, বরং হাসছে।

তার পরেই আবার নিজের আস্তানাটিতে ফিরে এসে পাইপে টান দিতে দিতে মহা ব্যস্ত হয়ে রঙীন চক ঘষে ঘষে ফুটপাথের উপর ছবি আঁকছে। তারি ফাঁকে ফাঁকে খবরের কাগজখানাতে ব্যস্ত হয়ে চোখ বুলিয়ে নিচ্ছে, আবার তাদের মাঝখানে উঠে গিয়ে তাদেরই একজন হয়ে গল্পগুজব করছে, উপদেশ, পরামর্শ দিচ্ছে। কে তার কথা শুনল, কে শুনল না, কে হাসল, সে সবে তার কোনো তোয়াক্কাই নেই। সে আপন ঝোঁকেই আছে!

শফিক শাবান প্রথমে তার উল্টোনো টুপিতে এক মুঠো পেনি দিয়ে তার পর তার সঙ্গে বেশ করে জমিয়ে নিলেন।

এ কথা সে কথার পর ে প্রশ্ন শুনেই ক্ষ্যাপাটে হাসি হেসে ভাঙা ভাঙা হেঁড়ে গলায় গড় গড় করে সে বলল, 'লাইক্কাষ্টার রোইড স্যাইর? ভেরি ফার স্যাইর। বেইজ-ওয়াইটার (বেজওয়াটার) এইবিয়া স্যাইর। টেইক ফিফটি টু বাস স্যাইর, এ্যাইণ্ড গো টু ল্যাইডব্রোইক গ্রোইভ (ল্যাডব্রোক গ্রোভ)

স্যাইর, এ্যাই্‌গুগেইট ইউ ডাউন দেইয়ার স্যাইর, এ্যাইও আয়েস্ক্‌-এইনিবাডি স্যাইর, এ্যাইও দেইয়ার ইউ আর স্যাইর। গুডমর্নিন্‌ স্যাইর'—তারপরেই আর অপেক্ষা না করে পাইপে আরাম করে একটা টান দিয়ে পাশেই যে গাড়ীখানায় স্যাণ্ডউইচ, চা, কফি বিক্রী করছে সেখানে কফি খেতে চলে গেল। এক নিঃশ্বাসে কফি খেয়ে ফিরে এসে ফের মহাব্যস্ত হয়ে ফুটপাথের উপর আঁকা তার সেই sunset after rain ছবিটাতে কয়েকবার রঙীন খড়ি বুলিয়ে নিয়েই নিজের আস্তানা ছেড়ে আর্টিষ্টদের আড্ডার দিকে যেতে যেতে পাইপে টান দিতে দিতে ক্ষ্যাপাটে চাউনী মেলে আমাদের বলল, 'আমি কী স্যাইর এই এক জায়গায় ভিক্ষে করছি স্যাইর? পাইকাডিলিতে (পিকাডিলি) করেছি, ট্রাইফালগার স্কোইয়ারে (ট্রাফালগার স্কোয়ার) করেছি, পাইডিংটানে (প্যাডিংটন) করেছি, ওয়াইস্টভোর্ণ-পর্কে (ওয়েস্টবোর্ণ পার্ক) করেছি, লাইডব্রোইক গ্রোইভে (ল্যাড-ব্রোক গ্রোভ) করেছি, মইর্বেল আর্চে (মার্বেল আর্চ) করেছি, শাইফার্ডস-বুশে (শেফার্ডস বুশ) করেছি, লইম গ্রোইভে (লাইম গ্রোভ) করেছি, কইনসিনটনে (কেনসিংটন) করেছি, হুইসটনে (ইউসটন) করেছি, হাই-মার্কেট (হে মার্কেট) করেছি, হাইমারমিথে (হ্যামার স্মিথ) করেছি—কোন্‌ জায়গায় করিনি? তার পর থানা গেড়েছি এই হইডপার্ক কর্ণারে আজ তিন মাস হ'ল। এখানে দিব্যি মনের সুখে আছি, আর নড়বার ইচ্ছে নেই। আমারই জাতভাইরা রোববার রোববার এখানে ছবির দোকান করে, তাদের সঙ্গে বেশ ফূর্তিতে দিনটা কাটে। দরকার হলেই আমার কাছে আসবেন স্যাইর, এই লণ্ডন শহরটার রাস্তাঘাট আমি ঠিক আমার হাতের তেলোর দাগ গুলোর মতই চিনি।'

হাইডপার্ক কর্ণারে ততক্ষণ আর্টিষ্ট আর দর্শক খদ্দের মিলে আরো ভীড় জমতে শুরু করেছে।

ভিখিরীটার কথা মত আমরা বাহান্ন নম্বর বাসে চাপলুম।

বাসে বসে শফিক শাবান বললেন, 'ও'র চেহারা, বিশেষ ধরনের সব আঁটসাঁট পোশাক দেখে ও'কে ভিখিরীর বদল পাইরেট বলে মনে হয় না?'

বললুম, 'হ্যাঁ! ভিখিরী না হয়ে জলদস্যু টলদস্যু হলেই যেন মানাতো ভালো!

শাবান বললেন, 'তাই আমি ওর নাম দিলুম মরগান, দি ভাইকিং!'

আমি হাসলুম।

তিনি বলেন, 'তবু তো ও'র আসল পরিচয় এখনো পাননি।'

'কী?'

'খুব ভালো মাউথ অরগান বাজাতে পারে।'

'তাই না কী?'

এতক্ষণে বুঝতে পারলুম শেফার্ডস্ বুশের শফিক শাবান আসলে কিসের জন্যে হাইড পার্ক কর্ণারের মরগান, দি ভাইকিঙের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছেন।

শাবান বললেন, 'হ্যাঁ। কাল বৃষ্টিভেজা সন্ধ্যায় মাথায় কালো ফেল্টের টুপি আর গায়ে ভারি ওভারকোটখানা চাপিয়ে শীতে হিহি করা শরীরটাকে পাশের রেঁস্তোরা থেকে এক কাপ কফি খেয়ে একটু গরম করে নিয়ে দিশেহারা হয়ে যেই হাইড পার্ক কর্ণারে এসে এক পাল সাহেব মেমের পিছনে বাসের জন্যে লাইন দিয়েছি অমনি কানে এলো বাঁশির সুর। চেয়ে দেখি আমার মরগান, দি ভাইকিং বাজাচ্ছেন! কী সুর আমি জানি না, কিন্তু মনে হচ্ছিল সে সুরে যেন হাইড পার্ক কর্ণার থেকে দূরের মার্বেল আর্চ পর্যন্ত কাঁদছে। আজ ভাব জমিয়ে নিলুম, এইবার যখন ইচ্ছে মরগান, দি ভাইকিঙের বাঁশি শুনব, আর ও'র উল্টোনো টুপিতে মুঠো মুঠো পেনি দোব।'

দেখতে দেখতে আকাশ অন্ধকার করে বৃষ্টি নেমে এলো। সকাল থেকেই রোদ আর বৃষ্টির আড়াআড়ি চলেছে।

শাবান বললেন, 'উঃ! এ দেশের এই আবহাওয়ায় তিনদিনেই যেন মেলানকোলিয়া ধরে গেল। আবহাওয়া কালো, বাড়ীগুলো কালো কালো, লোকগুলোর পোশাক কালো—সব শুদ্ধ মিলে গিয়ে যেন সর্বদা পালাই পালাই লাগছে!'

বললুম, 'যা বলেছেন! এসে অব্দি আমার কী মনে হচ্ছে জানেন? জাপানীদের একটা প্রবাদ আছে, একজন পুরুষকে পাগল করতে তিনজন মেয়েই যথেষ্ট! কিন্তু তিনজন মেয়েও লাগবে না, কাউকে পাগল করতে চাইলে তা'কে লণ্ডনে নিয়ে এসে ছেড়ে দিলেই হবে!'

সঙ্গে সঙ্গে শফিক শাবানের হাসির আওয়াজ যেন বাসের ভিতর থেকে কুইন্‌স্‌ গেট হয়ে ব্রম্পটন আর্কেড ছাড়িয়ে সুদূর পিকাডিলি পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ল। তাঁর প্রাণখোলা হাসির শব্দে লাল বাস ভর্তি এক পাল সায়েব মেম চমকে উঠে আড়ে আড়ে তাঁর দিকে চাইতে লাগল।

খুব একচোট হেসে নিয়ে তার পর বললেন, 'লণ্ডন-সুন্দরী যেন বিধবা হয়ে গিয়ে সর্বক্ষণ শোকের কালো পোশাক পরে কাঁদছে।'

ল্যাডব্রোক গ্রোভে নেমে শুধোলুম, 'হঠাৎ ল্যাঙ্কাষ্টার রোডে কেন?'

শাবান বললেন, 'আমার এক নাইজিরিয়ান বন্ধু থাকে। তার কাছে আমার শ'পাঁচেক পাউণ্ড জমা আছে। কায়রোয় থাকতে আমার কাছে ধার নিয়েছিল। লণ্ডনে দেবার কথা আছে।'

তার পর একজন বুড়ী মেমকে শুধিয়ে ল্যাঙ্কাষ্টার রোডে পড়ে পথ চলতে চলতে দু'পাশে চেয়ে বললেন, 'লণ্ডনে এসে অব্দি একটা জিনিষ দেখে ভারি অবাক লাগছে। প্রায় সব পাড়াতেই

দেখছি দু'পাশাড়ি বাড়ীগুলো এক রকম। নম্বরটা ঠিক মত না মনে রাখলে নতুন নতুন এখানে নিজের বাড়ী চিনে বার করাও দেখছি সেই আলীবাবা গল্পের মর্জিয়ানার খড়িব দাগে দস্যুসর্দারের মত ধাঁধায় পড়ার অবস্থা!'

তাঁকে তাঁর নাইজিরিয়ান বন্ধুর বাড়ী পৌঁছে দিয়ে বললুম, 'আমি এখন যাই। আমায় একবার ট্রাফালগার স্কোয়ারে যেতে হবে। দশটাব সময় আমার এক বন্ধুব সঙ্গে সেখানে দেখা করার কথা আছে। বিশেষ দরকাব। সাড়ে ন'টা বাজছে।'

শফিক শাবান মুচকি হেসে বললেন, 'যে রকম তাড়া দেখছি—বান্ধবী নয় তো?'

লজ্জায় লাল হয়ে বললুম, 'আরে না—না।'

শফিক শাবান ঠিক পিকাডিলিব 'এরসেব' ফোযারার মত রামধনু রঙেব হাসির ফোয়ারা ছড়িয়ে দিয়ে কালো বেজওয়াটারকে রঙিয়ে দিলেন।

॥ কুড়ি ॥

হে-মার্কেটে পৌছতেই মেঘ কেটে গিয়ে রোদ উঠে পড়ল। আমার মনে হ'ল যেন শোকাচ্ছন্না লণ্ডন-সুন্দরীর কালো ঘোমটাখানা হঠাৎ হাওয়ায় খসে পড়ে রুজ-পাউডার মাখা ঝকঝকে চকচকে মুখখানা বেরিয়ে পড়েছে।

ট্রাফালগার স্কোয়ারে ততক্ষণে নীল নীল পায়রাগুলোকে খাওয়াবার জন্যে, ওদের ছবি তোলবার জন্যে রং বেরঙের ছেলেমেয়ে, বুড়োবুড়ীর একেবারে মেলা লেগে গিয়েছে।

এক কোনে একটা বেঞ্চিতে আরাম করে বসে চক্রবর্তীর জন্যে অপেক্ষা করতে লাগলুম। দুটো আদুরে পায়রা আমার দুই কাঁধে উড়ে এসে বসে নিজেদের ভাষায় নানানরকম কথাবার্তা, আব্দার শুরু করল!

ঘড়ীর কাঁটা এক পা এক পা করে সাড়ে দশটার ঘরে পৌছল, তবু চক্রবর্তীর টিকির দেখা নেই। বাঙালীর ঘড়ীতে সবসময়ই এগারোটার সময় দশটা বাজে—সেটা বিলেতেও!

কতক্ষণ হাঁ করে বসে থাকা যায়! কারো জন্যে অপেক্ষা করে বসে থাকার চেয়ে বিরক্তিকর ব্যাপার আর কী আছে আমি জানি না। উঠে পড়লুম।

'এই যে কোথায় চলেছেন?'

চমকে চেয়ে দেখি একটা প্রকাণ্ড কালো পাথরের সিংহের আড়াল থেকে হাসিমুখে বেরিয়ে আসছেন বুড়ো অবিনাশবাবু।

সেদিন রাত্রে বুলোন থেকে ফোকষ্টোন—ইংলিশ চ্যানেল

পার হ'তে হ'তে স্টীমারে আলাপ হ'য়েছিল। উনি অনেকদিন লণ্ডনে আছেন।

ভদ্রলোকের স্নিগ্ধ চেহারাখানায় কী আছে জানি না, দেখলেই মুগ্ধ হয়ে পড়তে হয়। ভাবি ভালো লাগে।

বয়েস ষাটের কাছাকাছি হবে। মাথায় কালো ফেল্টের টুপি, মুখে সাদাকালোয় মেশমেশি দাড়ী, গায়ে ভারি কালো ওভারকোট, হাতে ছড়ি। লম্বা সোজা শরীর। লাল রং। হঠাৎ বাঙালী বলে চেনা দায়।

তাঁর মুখের উজ্জ্বল হাসিটি যেন বুলগেরিয়ার গোলাপি-আতর হয়ে আমার সর্বাঙ্গে সুগন্ধি হাত বুলিয়ে অনির্বচনীয় আরামে ভরে দিল।

আমি কিছু বলার আগেই আরো সামনে এগিয়ে এসে বললেন, 'হাতে সময় আছে, না, বড্ড তাড়া আছে?'

বললুম, 'না, কোনো তাড়া নেই।'

হেসে আমার কাঁধে চাপড় মেরে বললেন, 'খুব ভালো কথা। চলুন, একটু বসা যাক।'

ফোয়ারার ধারে আমরা একটা বেঞ্চিতে বসলুম।

বসেটসে তিনি বললে, 'দেখুন মশাই, আমি বুড়ো হয়ে গেছি বটে, তাই বলে আমি কিন্তু বুড়োর দলে নই। তাই বেছে বেছে যত ইয়ংম্যানদের সঙ্গে আমি বন্ধুত্ব করি। বিশ্বাস না হয়, খোঁজ নিয়ে দেখুন এত বড় এই লণ্ডন শহরে আমার একজনও বুড়ো বন্ধু নেই। থাকার জায়গাটায়গা যোগাড় করতে পেরেছেন?'

'হ্যাঁ পেয়েছি—নাইট্‌স্‌ব্রিজে।'

'বাঃ! খাসা জায়গায় পেয়েছেন দেখি! আপনাকে ভাগ্যবান লোক বলতে হবে। আমিও হোবর্নের বাড়ীটা ছেড়ে কাল পরশুই লাইমগ্রোভের দিকে চলে যাচ্ছি। ওইদিকে একটা ভালো বাড়ী পাচ্ছি। লণ্ডন কেমন লাগছে?'

'এই সবেমাত্র এসেছি তো—এখনো বেশ খাপ খাইয়ে নিতে পারছিনা, তাই—'

হেসে উঠে বললেন, 'লণ্ডনকে ভালো লাগতে একটু সময় লাগবে। প্রথম প্রথম খারাপই লাগে। বিয়ের প্রথম দু'তিন-দিন নিজের স্ত্রীর সঙ্গেও ভালো করে ভাব জমিয়ে নিতে বিস্তর অসুবিধে হয়। এখন পালাতে পারলে বাঁচেন বলে মনে হচ্ছে, কিন্তু আর কয়েকদিন থাকুন, দেখুনশুনুন, চিনুন, জানুন, তখন আর লণ্ডনকে ছেড়ে যেতে চাইবেন না। এমন জায়গা আর নেই। কিন্তু এর এই কালো ঘোমটা খুলে এ'র সঙ্গে ভালো করে চেনাজানা হ'তে একটু সময় লাগে। কত দিন থাকবেন?'

'ঠিক বলতে পারছি না। আপনি?'

'আমি!' বলে তিনি অদ্ভুত একটুখানি হেসে চুপ করে গেলেন। আমি অবাক হয়ে তার মুখের দিকে চেয়ে রইলুম।

তাঁর টুপির উপরে একটা পায়রা উড়ে এসে বসেছিল। পায়রাটাকে ধরে আদর করে তার গায়ে হাত বুলোতে বুলোতে বললেন, 'দেখুন, এক দল লোক আছে তাদের জন্মই হয় হাতে এক গাদা রঙের তাস নিয়ে। তাই সংসারের আসরে ভাগ্যের তাসখেলায় তারা প্রথম থেকেই জিততে শুরু করে দেয়। আর এক দল লোক আছে, তাস তাদের হাতে হয়তো অনেক থাকে, কিন্তু রং থাকে না একখানাও। হারতে হারতে, যুঝতে যুঝতে বহু অপেক্ষা করে থাকার পর দৈবাত কখনো কখনো খেয়ালখুশী মত ভাগ্য তাদের হাতে রঙের টেক্কা খানা তুলে দেয়। আমি হচ্ছি এই শেষের দলের। আমার টাকার ঝুলি বরাবরই শূন্য ছিল; হাতে এক গাদা বাজে তাস নিয়ে আমি পৃথিবীতে এসেছিলুম। তাই সংসারের তাসের আসরে বরাবর হারতে হারতে এই শেষ বয়েসে হঠাৎ একদিন দেখি ভাগ্য আমার হাতে শুধু রঙের টেক্কাখানাই নয়, পর পর সাহেব,

বিবি, গোলাম সবকিছুই তুলে দিয়েছে! একদিন কাগজ খুলেই দেখি একটা লটারীতে আমি জিতে গেছি! প্রথম নিজের চোখকে বিশ্বাস'ই করতে পারি না! বারবার দেখেও না! আমার এক ইংরেজ বন্ধু কলকাতা ছেড়ে দেশে ফিরে যাবার সময় টিকিটটা আমাকে প্রেজেন্ট করে গিয়েছিল! সে কত টাকা জানেন?'

'কত?'

'দশ লাখ।'

'বলেন কী! দ---শ লাখ।'

'ভেবে দেখুন মনের অবস্থাখানা! জীবনের সাতান্ন বছর একশোটা টাকা যার কাছে স্বপ্ন ছিল সে রাতারাতি দশ লাখ টাকার মালিক! এ সব হ'ল গিয়ে তিন বছর আগের কথা। আমি মশাই, এই তক্তোপোষে গোল হয়ে বসে জটলা পাকানোয় আর পরনিন্দে চর্চ্চার মত মহৎ কাজে ব্যস্ত, অতীতের বড়াইএ রপ্ত, মুখে হাতী ঘোড়া মারায় ওস্তাদ, দিবানিদ্রার রসে ভরা নাদুসনুদুস, রবীন্দ্র প্রভাবের ফাঁদে পড়ে গড়ে ওঠা ভাবপ্রবণতার নেশায় ঢুলুঢুলু, মেয়েলী ঢঙের আদুরে ন্যাকা, ঘরকুনো বাঙালীদের মত 'ছা পোষা' মানুষ কোনোদিনই নই। বিয়ে থা'ও করিনি। আমার রক্তে আছে সমুদ্রের ডাক, পাহাড়ের ডাক, মরুভূমির ডাক। তাই আমার শূন্য ঝুলি টাকায় ভরে উঠতেই আমার জীবনের সবচেয়ে বড় যা সাধ ছিল সেই দেশভ্রমনে একদিন বেরিয়ে পড়লুম। অনেক পাহাড়, অনেক মরুভূমিতে ঘুরে একদিন শেষে এই লণ্ডনে এসে পৌছেছি। এমন জায়গা আর হয় না। এই সভ্য ইয়োরোপ ছেড়ে আর কোনদিন আমি আমাদের ওই অসভ্য দেশে ফিরে যাব না।'

গা জ্বলে উঠল। বললুম, 'বলেন কী! নিজের দেশ—

তিনি উত্তেজিত হয়ে বাধা দিয়ে বললেন, 'ও সব ভাব প্রবণতা ছেড়ে দিন। যে দেশে মানুষের জীবনের চেয়ে সস্তা আর কিছুই

নেই, যে দেশে সরল, অজ্ঞ মানুষগুলো কুটিল রাজনীতিবিদদের জঘন্য, পৈশাচিক রাজনীতি-দাবাখেলার স্রেফ ঘুঁটি, যে দেশের ভাবনাচিন্তা, আদর্শ সবকিছু মরা অতীতের রাজ্যের কুসংস্কারকে আঁকড়ে ধরে গড়ে ওঠে, যে দেশে শতকরা একজন মানুষেরও ঠিক মতো অন্ন, বস্ত্র, গৃহের সংস্থান নেই, রাজনীতির ধোঁকাবাজি, নিরীহ, অসহায় মানুষের রক্ত-শোষণ, অসততা আর ধর্মের হানাহানি ছাড়া যেখানে আর কিছুই চোখে পড়ে না, শুধুমাত্র সংখ্যায় বেশী বলেই সুযোগ পেয়ে যেখানে আমরা মুখে ভ্রাতৃত্বের ভণ্ডামী করে সমস্ত শিক্ষা, সমস্ত সভ্যতা, সমস্ত মনুষত্বকে পশুত্বের পায়ে বলি দিয়ে ছুঁতোয় নিরীহ সংখ্যালঘুদের দিনের পর দিন গলায় ছুরি চালিয়ে জবাই করে চলেছি, যে দেশে বাঁদর রাজা, শিয়াল মন্ত্রী আর গাধা কোটাল সে দেশকে অসভ্য বলব না তো কাকে বলব বলতে পারেন? যে দেশে সভ্যতা আছে, মানবতা আছে, মনুষত্ব আছে, মানুষের জীবনের দাম আছে, যারা সামনে এগিয়ে চলতে জানে, যারা পুরনো অচল, জীর্ণ জিনিষকে ঝেড়ে ফেলে দিয়ে বদলাতে পারে বিদেশ হলেও সে'ই আমার দেশ।'

মুখে তর্ক করা কোনোদিনই আমার স্বভাব নয়, ওতে অযথা শক্তি এবং সময় নষ্ট ছাড়া আর কোনোই লাভ হয় না। রবার্ট ওয়েনের কথাটা আমি খুব মানি, never argue, repeat your assertion. সেইজন্যে সবাই যখন কথায় কথায় কোমর বেঁধে তর্ক করতে, বক্তৃতা ঝাড়তে, উপদেশ দিতে আর বিদ্যে ফলাতে ব্যস্ত থাকে, আমি মুখে তালাচাবি এঁটে রাখি। তা ছাড়া তাঁর উত্তেজনার সুরটা হয় তো একটু বেশী চড়া হয়ে গিয়েছে, তাই বলে সত্যের সুরটাও যে সে তুলনায় খুব বেশী ক্ষীণ বলে তো মনে হয় না। তাই চুপ করেই রইলুম।

তার পর আরো নানান রকম কথাবার্তার পর পায়রাগুলোকে

আদর করে খাইয়ে দাইয়ে বাড়ী ফিরব বলে যেই আমরা রাস্তায় উঠে এসেছি অমনি পিছন থেকে কে যেন ছুটে এসে মিষ্টি করে আব্দারের সুরে বলল, 'বুড়ো দাদু, বুড়ো দাদু, একটা আপেল কেনো না বুড়ো দাদু।'

চমকে পিছনে ফিরে দেখি বাবো তেবো বছরের একটি মেয়ে অবিনাশবাবুর হাত জড়িয়ে ধরে দাঁড়িয়ে আছে। অবিনাশবাবুও এই অচেনা মেয়েটিকে দেখে কেমন থতমত খেয়ে গিয়েছেন।

তার মুখের রং লাল টুকটুকে আপেলের মত। এক মাথা কোঁকড়ানো কোঁকড়ানো বব্ ছাঁটা চুল। সরল চোখদুটি ছেপে একরাশ দুষ্টুমি একেবারে উপচে পড়ছে। মুখে চমৎকার একখানা ঝকঝকে নিঃসঙ্কোচ ভাব। চোখে মুখে কথা! বুদ্ধির আলোয় ঝলমলে। কাঠবেড়ালীর মত দুষ্টু মেয়েটা যেন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই নাচছে! গায়ে রঙীন ফ্রক আর ওভারকোট। এক হাতে মস্ত এক ফুলের সাজি।

মুনিয়া পাখির মত চঞ্চল এই ছোট্ট মেয়েটিকে আমার ঠিক ট্রাফালগার স্কোয়ারের পায়রাগুলোর মতই আদর লাগল। চেয়ে দেখলুম বুড়ো অবিনাশবাবুরও দুই চোখে স্নেহ একেবারে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছে।

অবিনাশবাবু বললেন, 'তোমার হাতে তো ফুলের সাজি,—আপেল কই?'

দুষ্টু মেয়েটা চোখ দুটো নাচিয়ে চুল দুলিয়ে হাত তুলে দূরের দিকে দেখিয়ে বলল, 'ওই যে বুড়োটাকে দেখতে পাচ্ছো, ও'র কাছে আছে—চল। ও ফল বিক্রী করে। আমার ফুল সব্বাই কেনে, ও'র ফল কেউ কেনে না। বুড়োটার ভারি দুঃখু, দাদু! ও'র জন্যে আমার ভারি মায়া হয়! ও'ও আমায় খুব ভালোবাসে। রোজ দেখি বুড়ো ওইখানে ফলের গাড়ীখানা নিয়ে এসে বসে

থাকে, কিন্তু কী জানি কেন, বুড়োর কপাল এমনি খারাপ যে, কেউ ও'র ফল কেনে না। সন্ধ্যেবেলায় যখম বাড়ী ফিরে যায় রোজ আমি শুধোই, আজ কতগুলো ফল বিক্রী হ'ল? মাথা নেড়ে বলে একটাও না। আজ নিয়ে তিন মাস হ'ল ও'র একটা আপেলও কেউ কেনেনি। কেন যে বুড়োব কপাল এত খারাপ কে জানে! একটু তাড়াতাড়ি চল না বুড়ো দাছু, আমায় আবার ফুলগুলো বিক্রী কবতে হবে। অবশ্য আমার ফুল বিক্রী হ'তে দেরী লাগবে না জানি। আমাব কপালটা এমনি ভালো যে, আমি ফুল নিয়ে এসে দাঁড়ালেই সব বিক্রী হযে যায়।'

এ রকম নিঃসঙ্কোচ, ঝকঝকে মেযে আমি আগে কখনো দেখিনি। অচেনা নতুন লোককে অতি সহজে আপন কবে নেবার একটা অদ্ভুত ক্ষমতা আছে মেয়েটিব মধ্যে! যেন না চিনেও সকলেব সঙ্গেই তাব অনেকদিনেব চেনাশোনা।

আদুবে মেযেটাব দুষ্টু চুলগুলোর মধ্যে হাত বুলোতে বুলোতে আমি শুধোলুম, 'তোমাব নাম কী?'

'শুভ্রা মজুমদাব।'

অবিনাশবাবু শুধোলেন, 'তুমি কত দিন হ'ল লণ্ডনে এসেছে?'

'পাঁচ বছব।'

'এখানে তোমাব কে কে আছেন?'

'বাবা মা'ব সঙ্গে এসেছিলুম। এখন আব কেউ নেই।'

আমি আব অবিনাশবাবু প্রায় এক সঙ্গেই শুধোলুম, 'কেন?'

'তু'জনেই মাবা গেছেন। এখন আমি একদম একা। দেশেও আমাব আর কেউ নেই। বেজওযাটাবে আমাব এক পাতানো মাসামা আছেন, মা বাবাব বন্ধু,— আমি তাঁকে বলি বেজওয়াটার আন্টি— তাঁর বাড়ীতেই থাকি। আব দিনেববেলায় ফুল বিক্রী করি। তাতেই আমার বেশ চলে যায়।' তার পব একটু থেমে

বলল, 'কিন্তু আমার দুঃখু হয় ওই বুড়োটার জন্যে। আহা! বেচারীর এমনি দুর্ভাগ্য যে, একটা ফলও কেউ কেনে না। জানো দাদু, ওই বুড়োও কিন্তু বাঙালী। বলে, আজ দশ বছর হ'ল লণ্ডনে আছে। আমি ভাবছি এইবার থেকে ও'র পাশে বসেই ফুল বিক্রী করব। তাহলে আমি ঠিক জানি, ও'র সব ফল বিক্রী হয়ে যাবে।'

আমি শুধোলুম, 'তোমার বেজ্ওয়াটার আন্টি কী বাঙালী?'

বলল 'হ্যাঁ। তাঁর নাম জয়ন্তী চ্যাটার্জ্জি।'

তার পর আমাদের বুড়ো ফলওয়ালার কাছে নিয়ে যেতে যেতে শুধোল, 'আচ্ছা দাদু, তুমি থাকো কোথায়?'

'ফিন্‌জবেরি পার্কে। তবে কাল পরশুই আমি লাইমগ্রোভে চলে যাচ্ছি।'

'কতদিন হ'ল এসেছ?'

'অনেক দিন।'

শুভ্রা বলল, 'আমি তোমাকে অনেক জায়গায় দেখেছি। অরেঞ্জ ষ্ট্রীটে দেখেছি, বেকার ষ্ট্রীট দিয়ে যেতে যেতে মাদাম তুসাদ থেকে তোমাকে বেরোতে দেখেছি, হাফ মুন ষ্ট্রীটে দেখেছি, নিউ বণ্ড ষ্ট্রীটে দেখেছি, ওয়াটারলু ষ্ট্রীটে দেখেছি।'

অবিনাশবাবু বললেন, 'আমি তো তোমায় এর আগে কখনো দেখিনি।'

শুভ্রা আমার দিকে চেয়ে বলল, 'আপনাকে কী বলব?'

বললুম, 'তোমার যা ইচ্ছে।'

একটু ভেবে বলল, 'আঙ্কেল বলব।'

বললুম, 'বেশ।'

শুভ্রা শুধোলো, 'তুমি কোথায় থাকো আঙ্কেল?' 'আপনি' থেকে এক মুহূর্তে 'তুমি'।

বললুম, 'নাইট্‌স্‌ব্রিজে।'

তার পর ফের কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, 'আচ্ছা বুড়ো দাদু, এই যে আমাদের চেনা নেই শোনা নেই তবু তোমাকে দাদু বলছি, এ'র জন্যে তুমি রাগ করছ ?'

অবিনাশবাবু আদর করে তার আপেলের মত গাল দুটো টিপে দিয়ে বললেন, 'না গো শুভ্রারাণী, না।'

'বুড়ো লোক দেখলেই কী জানি-কেন সব্বাইকে আমার দাদু বলতে ইচ্ছে করে।'

অবিনাশবাবু হেসে বললেন 'তুমি আমাকে দাদুই বোলো।'

শুভ্রা তার সাজির ফুলগুলোর মাঝখানে ঘাড় বাঁকিয়ে দুষ্টুমি করে বলল, 'শুধু দাদু বলব না, বুড়ো দাদু বলব !'

আমরা হাসলুম।

শুভ্রা বলল, 'ওই বুড়ো ফলওয়ালাকেও আমি দাদু বলি। তুমি আমার কী বললে একটু আগে—শুভ্রারাণী ?'

অবিনাশবাবু বললেন, 'হুঁ।'

'শুভ্রারাণী ! কী সুন্দর নাম ! এ নামে এ'র আগে আমাকে কেউ ডাকেনি। তুমি আমায় সব সময় শুভ্রারাণী বলেই ডেকো।'

আমি বললুম, 'আমি কিন্তু তোমায় হার ম্যাজেস্টি, দি কুইন বলব।'

শুভ্রা খিলখিল করে হেসে উঠল। সে মিষ্টি হাসি যেন রঙে, মাধুর্যে ইরানের রঙীন আতরদানকেও ছাড়িয়ে গেল।

হাসি থামিয়ে শুভ্রা বলল, 'দাড়াও।' তার পর বলল, 'তোমরা দু'জনে আমার এত সুন্দর দুটো নাম দিলে তার বদল এই নাও দু'জনে দুটো গোলাপফুল।' তার সাজি থেকে দুটো মস্ত মস্ত গোলাপ আমাদের সামনে মেলে ধরল।

আমি সস্নেহে হাতে নিয়ে শুধোলুম, 'কত দাম ?'

সে বলল, 'বা রে! দাম তোমাদের দিতে হবে না। তোমাদের দিলুম।'

অবিনাশবাবু বললেন, 'না, তুমি ছেলেমানুষ, এত বড় দুটো গোলাপফুলের অনেক দাম। অন্যকে বিক্রী করলে তুমি অনেক পয়সা পেতে। আমাদেরকে এমনি দিতে যাবে কেন?'

সে দুষ্টুমিভরা চোখ দুটো আমাদের দিকে মেলে হেসে উঠে তার পর বলল, 'এই দেখ, এখনো আমার সাজিতে অনেক ফুল আছে। এ গুলো বিক্রী করে আমি অনেক পয়সা পাব। আমি তো একা, এত পয়সা আমি কী করব? তাই রোজ আমি বাড়ী যাবার সময় ফুল বিক্রীর অর্দ্ধেক পয়সা ওই বুড়ো ফলওয়ালাকে দিয়ে যাই। নইলে ও'র চলবে কী করে? সবার ফল সবাই কেনে, আর ও বেচারা ফলের গাড়ী নিয়ে দিনের পর দিন বসে থাকে, তবু কেউ ও'র ফল কেনে না দেখে বড় মায়া হয়। তুমিই বল না, মায়া হয় না?' উত্তরের অপেক্ষা না করেই গোলাপ ফুল দুটো আমাদের কোটের কলারে গুঁজে দিয়ে ওভারকোটের পকেট থেকে একটা ছোট আয়না বার করে সামনে মেলে ধরে বলল, 'কী সুন্দর দেখাচ্ছে দেখ!' আবার তেমনি মিষ্টি সুরে খিলখিল করে হাসতে লাগল।

এ মেয়েটি যেন ঝর্ণার মত কেবল হাসতেই জানে। শুধু দুষ্টুমী করতেই ও'র ভালো লাগে। ও'র মা নেই, বাবা নেই, কেউ নেই, স্নেহ ভালোবাসা থেকে বঞ্চিত হয়ে এত অল্প বয়েসে এই কঠিন লণ্ডন শহরে ও'কে জীবন-সংগ্রামে নামতে হয়েছে, তবু ও'র ছোট্ট মনখানি আনন্দে ভরপুর

ততক্ষণে আমরা বুড়ো ফলওয়ালার সামনে এসে পড়েছিলুম। তার গায়ে এক ছেঁড়া কোট, মাথায় রংচটা ছেঁড়া ফেল্টের টুপি, ছেঁড়া ট্রাউজারখানা দিয়ে হাঁটু দুটো বেরিয়ে আছে, পায়ে ছেঁড়া জুতো।

চুল, দাড়ি, ভুরু—সব একেবারে শীতের লণ্ডনের বরফের মতই সাদা। বয়েস হয় তো যাটের কাছাকাছি। কিন্তু বয়েসের তুলনায় বড্ড বেশী বুড়ো হয়ে পড়েছে। সামনে একটা ফলের :গাড়ীতে এক গাদা আধ-শুকনো আপেল, আধপচা আঙুব, আর পীচ।

বুড়ো ফলওয়ালা ফুটপাথের উপর জড়সড় হয়ে বসে বসে ঝিমোচ্ছিল আর শীতে কাঁপছিল।

শুভ্রা ডাকল, 'দাত্ন।' বুড়ো জেগে উঠল।

শুভ্রা হাসতে হাসতে বলল, 'এই দেখ আমার নতুন দাত্ন আর আঙ্কেলকে দেখ। এইমাত্র আলাপ হ'ল। নতুন দাত্ন আমার নাম দিয়েছেন শুভ্রারাণী। আর অ্যাঙ্কেল আমাব নাম দিয়েছেন হার ম্যাজেস্টি, দি কুইন। আমার নতুন দাত্ন তোমার আপেল কিনতে এসেছেন।'

একরাশ বিস্ময় আব অবিশ্বাস বুড়োব করুণ চোখ ছুটোয় ঘনিয়ে উঠল। খানিক ফ্যালফ্যাল করে আমাদেব মুখের দিকে চেয়ে থেকে কাঁপা গলায় বলল, 'আমার আপেল কিনবেন !!'

শুভ্রা বলল, 'হ্যাঁ গো, হ্যাঁ। কতখানি আপেল কিনবে দাত্ন ?'

আপেলের অবস্থা দেখে একখানাও কেনার কথা নয়। তবু অবিনাশবাবু বললেন, 'এক পাউণ্ড।'

বুড়ো ফলওয়ালা অবাক হয়ে বলল, 'এ—ক পাউণ্ড !'

কেউ যার ফল কেনে না তার পক্ষে কথাটা বিশ্বাস করা সত্যিই কঠিন।

অবিনাশবাবু বললেন, 'হুঁ।'

বুড়ো কাঁপতে কাঁপতে এক পাউণ্ড আপেল ওজন করে দিল।

অবিনাশবাবু বললেন, 'আর এক পাউণ্ড পীচ দিন।'

বুড়োর চোখছুটে এবার বিস্ময়ে বিস্ফারিত হ'ল।

শুভ্রা বলল, 'দেখছ, আমার নতুন দাত্ন কত ভালো ? তোমার

কপাল আজ খুলে গেছে।' তার পর সে তার ফলওয়ালা দাদুর পিঠে আদর করে হাত বুলোতে বুলোতে বলল, 'দাদু, আমার ফুল বিক্রীর সাথে সাথে কাল থেকে আমি তোমার ফল বিক্রী করে দোব। আমি তোমার সঙ্গে থাকলে দেখবে, একেকদিনে তোমার একেক গাড়ী ফল বিক্রী হয়ে যাবে। এতদিন কেন যে তা করিনি তাই ভাবছি। আমার কয়েক পাউণ্ড জমানো আছে, সেই টাকাটা আমি তোমাকে দোব। এ সব শুকনো বাজে ফল বাদ নিয়ে কাল থেকে তুমি নতুন ফল নিয়ে এস।'

এই আদরের ছোঁয়ায় বুড়োর চোখদুটো জল জল করে উঠল।

শুভ্রা বলল, 'তোমরা তিনজনে কথা বল, আমি ফুলগুলো বিক্রী করে আসি গে, বেলা হয়ে যাচ্ছে। আবার আর এক সময় দেখা হবে।' তার ফলওয়ালা দাদুর কোটেও একটা গোলাপফুল লাগিয়ে দিয়ে তার পর আমাদের তিন জনের গালেই চুমু খেয়ে যেন পাখির মত রঙীন ডানা মেলে উড়তে উড়তে ট্রাফালগার স্কোয়ার পার হয়ে চলে গেল।

বুড়ো ফলওয়ালা সস্নেহে বলল, 'পাগ্লী মেয়ে! রোজ আমার কোটে একটা করে গোলাপ ফুল লাগিয়ে দিয়ে চলে যায়! ও তো ফুল দিয়ে যায় না, আমার মনে হয়, ও যেন ও'র তাজা লাল টকটকে হৃদয়খানাই রোজ আমার বুকে উপহার দিয়ে যায়। ওই পাগ্লী মেয়েটাই ও'র ছোট্ট মনের ভালোবাসা দিয়ে এই লণ্ডন শহরে আমায় বাঁচিয়ে রেখেছে। নইলে ক-বে আমি মরে যেতুম। ও যদি কাল থেকে আমার সঙ্গে থাকে তা'হলে ঠিক দেখবেন আমার একেক গাড়ী ফল রোজ রোজ বিক্রী হয়ে যাবে। মেয়েটা ভীষণ পয়া।'

অবিনাশবাবু শুধোলেন, 'আপনার নাম কী?'

বুড়ো শীতে কাঁপতে কাঁপতে কাঁপা গলায় বলল, 'আমায় মাপ

করবেন। এত বড় ঘর থেকে আমি এসেছি যে, নাম বলে সে বংশকে আমি লজ্জায় ফেলতে পারব না। এত বড় ঘরের ছেলে হয়েও নিজের দোষে আজ এই লণ্ডনের পথের ধারে বসে দুর্ভাগ্যের বোঝা হয়ে বেড়াচ্ছি—তাই নামটা আমার দয়া করে জানতে চাইবেন না। শুধু এইটুকু জেনে রাখুন অনেকদিন আগে পদ্মাপার থেকে আমি এসেছি।'

॥ একুশ ॥

চক্রবর্তী টেলিফোন করল, সকালে একটা দরকারি কাজে আটকে গিয়েছিল বলে ট্রাফালগার স্কোয়ারে আসতে পারেনি, বিকেলবেলায় গ্রীন পার্কে দেখা হবে।

ওভারকোটের কলারখানা তুলে দিয়ে শীতে জড়সড় হয়ে বেঞ্চিতে বসে গ্রীন পার্কের সবুজ হাওয়ার ছোঁয়ায় আরামের ঘুম ধরে এসেছিল, হঠাৎ নাকে বারবার কিসের সুগন্ধ এসে লাগায় আধা ঘুম আধা জাগরনের ঘোরে মনে হচ্ছিল এ যেন প্যারিসের সেন্ট নয়, যেন দামেস্ক-বাগ্দাদের গোলাপ বাগে ইরাণী কার্পেটের উপর বসে আছি আর অশরীরি 'সাকী' হাতে সোনালী মদের পাত্র নিয়ে সামনে বসে সুগন্ধি নিঃশ্বাস ফেলছে।

দাঁড়ে বসা কাকাতুয়া পাখীটা যেমন ঝিমোতে ঝিমোতে হঠাৎ পাখা ঝটপটিয়ে জেগে ওঠে, তেমনি ধড়মড় করে হঠাৎ জেগে উঠে দেখি কোথায় দামেস্ক-বাগ্দাদের গোলাপ বাগ আর কোথায়ই বা ইরাণী কার্পেট. সোনালী মদের পাত্র হাতে 'সাকী'—বসে আছি ধোঁয়াটে লণ্ডনের গ্রীন পার্কে, আর আমার ঠিক পায়ের কাছেই ঘাসের মখমলের উপব পড়ে আছে একটা মস্ত রঙীন রেশমী রুমাল। কোন্ অজানা অচেনা রূপসী মেমসায়েবের গাদা গাদা সোনা ভরা মাথা থেকে তাঁর অজানতে খুলে গিয়ে হাওয়ায় উড়ে এসে আমার সামনে পড়েছে জানি না, কিন্তু সেই রুমালটি থেকেই অমন মনমাতানো সুগন্ধ বেরোচ্ছে।

আর পাশেই বেঞ্চির উপরে লায়ন্সের দোকানের ছোট একটা

কেকের বাক্সো রাখা—তাতে ছোট্ট একটা চিরকুট বাঁধা। তাড়াতাড়ি চিরকুটটা পড়ে দেখলুম লেখা আছে, 'তুমি ঘুমিয়ে আছো বলে তুললুম না। কেকের বাক্সোটা রেখে গেলম। চেরিংক্রস থেকে একটা কাজ সেরেই আমি এক্ষুনি ঘুরে আসছি। চক্রবর্তী

মেঘান্ধকার নিস্তব্ধ আকাশকে ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত করে গম্ভীর শব্দে বিগবেনের ঘণ্টা বাজল।

লণ্ডনে সন্ধ্যা নামল।

এলো চক্রবর্তী।

এসেই পাশে বসতে বসতে বলল, 'সকালে কথা দিয়েও ট্রাফালগার স্কোয়ারে আসতে পারিনি বলে আই এ্যাম সো সরি ভাই, যে, কী বলব! বেরিয়েছিলুম ঠিকই, কিন্তু রাস্তায় দেখা হয়ে গেল প্যামেলার সঙ্গে। সে কিছুতেই ছাড়ল না। ধরে নিয়ে গেল রিচমণ্ডে। তার কাছ থেকে ছাড়া পেতেই কেনসিংটনে এসে দেখা হয়ে গেল রোজির সঙ্গে। সে বলল, চল আজ রবিবার, ছুটির দিন, সারপেনটাইনে নৌকোয় করে ঘুরব। হাইড পার্কে গিয়ে ফের দেখা হয়ে গেল ডরোথীর সঙ্গে। তিনজনে মিলে নৌকোয় করে ঘুরতে ঘুরতে বড্ড বেলা হয়ে গেল। আমার ওই তো মুস্কিল। রাস্তায় বেরোনো দায়। একজন না একজন গার্ল-ফ্রেণ্ডের সঙ্গে দেখা হবেই আর সে একটা না একটা আব্দার ধরবেই,—এড়ানো অসম্ভব। বিয়ে না করলে এ দেশে এই মুস্কিল—বুঝলে? মেয়েগুলো জোর করে তোমার পিছু নেবে। কিন্তু যে মুহূর্তে তুমি বিয়ে করলে কিম্বা ও'রা জানবে তুমি বিবাহিত, তখন আর ও'রা কাছে ঘেঁষবে না। আমি যে বিয়ে না করে কী মুস্কিলেই পড়েছি সে আর কী বলব, ভাই! এক পাল গার্লফ্রেণ্ড জোর করে ঘাড়ে এসে জুটেছে, আমি ও সব এত এ্যাভয়েড করতে চাই, কিন্তু অসম্ভব। শুধু টাকার শ্রাদ্ধ! যাক গে ও সব কথা। তুমি যেন

কী আলোচনা করতে চেয়েছিলে? বিজনেস্ টক্—না? হ্যাঁ, তা তুমি আমার সঙ্গে পার্টনারশিপে আসতে পার, আমার তাতে কোনো আপত্তি নেই, তা'তে তোমার ভালোই ইনকাম হবে। আমরা করি কী জানো ভাই? ভিলেজ থেকে ভেজিটেব্‌ল্‌স্, ফ্রুটস ইত্যাদি নিয়ে এসে লণ্ডনের মার্কেটে সাপ্লাই করে দিই। আমরা নিজেরা করি না, আমাদের মিড্‌ল্‌ম্যান আছে। মিড্‌লম্যান অবশ্য একজন মেয়ে—মেয়ে না হলে চলে না! জানো তো রঙের সব কটা তাসই মেয়েদের হাতে আছে! আজকাল তাই সংসারের সব কাজেই মেয়েদের জয়জয়াকার! ভেরি প্রফিটেব্‌ল্ বিজনেস। আজ তিন বছর আমরা এইটাই করছি। তুমি আসতে পার আমার সঙ্গে, আমার কোনো আপত্তি নেই। ও সব পরে হবে এখন। এই তো তিন চারদিন হ'ল এসেছ, এরি মধ্যে ইনকাম, বিজনেস, চাকরী বাকরী—ও সব নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছ কেন? আমি তো আছি। আমি থাকতে তোমার কোনো ভাবনা নেই। নাও, কেক খাও।'

কেকের বাক্সোটা খুলে আমার কোলের উপরে রাখল।

একটা কেকে কামড় দিয়ে বলল, 'তবে একটা কথা সর্বদা মনে রেখ। বিজনেস বল, যা কিছু বল—এ দেশে কিছু করতে গেলে অনেস্টি চাই। আমাদের দেশের সব ছেলেমেয়েরা পিলপিল করে এখানে চলে এসে রাজ্যের ডিজঅনেস্টি করে এ দেশে আমাদের নাম ডুবিয়েছে। এরা মানুষকে ভীষণ বিশ্বাস করে কি না। সেই সুযোগ নিয়ে আমাদের দেশের ছেলেমেয়েরা এখানে ব্যাঙ্কের চেক জাল করা থেকে দোকানের টাই, বই চুরী পর্যন্ত সবকিছুই করে। মেয়েছেলে নিয়ে কেলেঙ্কারীর কথা বাদই দিলুম। সুতরাং ভাই, বি কেয়ারফুল। অনেস্টি চাই। অনেস্টি দিয়ে এখানে দেশের মুখ উজ্জ্বল করা চাই। বিজ্‌নেস্ টক্ পরে হবে। চল, রাস্তাঘাটে

একটু বেড়ানো যাক। ঠাণ্ডায় হাঁটতে ভালোই লাগবে। খানিক বেড়িয়ে টেড়িয়ে চল, আমার ঘরে চল। নতুন কামরাটা কেমন হ'ল দেখবে।'

'নতুন কামরা মানে?'

'আজ সকালে প্যাডিংটনের বাড়ীটা ছেড়ে ওয়েষ্টবোর্ণ পার্কের একটা বাড়ীতে চলে গেছি।'

'তুমি প্রায়ই বাড়ী বদল কর, দেখি! চিঠিতেও লিখতে!'

'হ্যাঁ ভাই, ল্যাণ্ডলেডিদের সঙ্গে আমার প্রায়ই খিটিমিটি লাগে। তাই বাড়ী আমাকে প্রায় প্রত্যেক মাসেই পাল্টাতে হয়। ল্যাণ্ড-লেডিদের কৃপায় লণ্ডনে এসে যাযাবর হয়ে গিয়েছি! চল।'

বাগান পার হ'তে হ'তে বলল, 'তোমার সঙ্গে টাকা আছে?'

'কত?'

'এই ধর পাউণ্ড তিনেক ধার দিতে পার? আজ রোববার হয়েই মুস্কিল হ'ল, ব্যাঙ্ক বন্ধ। যা ছিল সকালে গার্ল ফ্রেণ্ডদের পিছনে আর বাড়ী বদল করে খরচ হয়ে গেছে। কালকেই ব্যাঙ্ক থেকে তুলে তোমাকে দিয়ে দোব।'

পকেট থেকে তিন পাউণ্ড বার করে দিলুম।

নিয়ে বলল, 'থ্যাঙ্ক ইউ ভাই। কই কেক খাও?' কেকের বাক্সোটা ফের সামনে মেলে ধরল। তার পর বলল, 'তুমি কিছু ভেব না, আমার বিজনেসের পার্টনার হ'তে তোমায় এক পয়সাও ইনভেষ্ট করতে হ'বে না। আমার বিজনেস তোমারই বিজনেস। আমার টাকা তোমারই টাকা। আমি শুধ্ চাই অনেস্টি,—দেশের মুখটা যেন এখানে থাকে।'

আলোয় আলোয় কালো লণ্ডনের চেহারা ততক্ষণে একদম পাল্টে গিয়েছে।

চতুর্দ্দিকের হাজারো রঙের আলো ঠিকরে পড়ে পিকাডিলির

এরসের ফোয়ারা, ট্রাফালগার স্কোয়ারের ঝর্ণাগুলো পর্যন্ত রঙীন হয়ে উঠেছে।

স্বচ্ছ আয়নার মত কালো কালো ভিজে পথগুলোতে রামধনু রঙের খেলা।

দু'পাশাড়ি দোকানে দোকানে কত রঙের আলো। শো কেস-গুলো কত রকম ভাবে সাজানো। আমার এক বন্ধু বলেছিল, শুধু শপ-উইনডো দেখে দেখেই লণ্ডনের প্রথম এক মাস কাটিয়ে দেওয়া যায়—সে কথা দেখছি ভুল নয়।

সন্ধ্যার লণ্ডন যেন স্বপ্ন রাজ্য।

রাস্তায়ঘাটে কত রকম লোকজন। কত ঢঙের কত নিপুন সাজসজ্জা। বাহার দেখতে হয় মেয়েদের। মাথার চুলটি থেকে পায়ের জুতোটি পর্যন্ত দেখলে মনে হয়—হ্যাঁ, এরাই সাজতে জানে।

এ দেশে মেয়েদের ফ্যাশান আমদানি হয় প্যারিস থেকে জানি। কিন্তু অবাক হয়ে দেখলুম ছেলেদের ফ্যাশানে যেন কিছু কিছু ইয়াঙ্কি ছোঁয়াচ লেগেছে! পৃথিবীর প্রায় সব দেশগুলোর মত গোঁড়া ইংল্যাণ্ডও শেষে অসভ্য-মার্কিনী-ডুগডুগির তালে তালে বাঁদর নাচ নাচতে শুরু করেছে না কী। জানতুম না তো! এই আমেরিকান সভ্যতা—এ এক সর্বনাশা সংক্রামক ব্যাধি। এর ছোঁয়াচ থেকে নিজেকে বাঁচানো বড় মুস্কিল।

কেউ চলেছে জোড়ায় জোড়ায়, কেউ একা। কিন্তু কোনোরকম গেলমাল নেই, হৈ হটেটাগোল নেই। চাপা চাপা কথাবার্তা, মৃদু মৃদু হাসি। এলোমেলো চলা নেই। ঠেলাঠেলি নেই। হুড়োহুড়ি নেই। সবাই চলেছে নিয়ম মেনে, দৃপ্ত ভঙ্গীতে। সবকিছুতে একটা গাম্ভীর্য। একটা সৌন্দর্য।

লাল লাল গম্ভীর বাসগুলো যেন শহরের রূপ আরো বাড়িয়ে দিয়েছে।

পিকাডিলির রাস্তায়ঘাটে রংমাখা মেয়েরাও সব সেজেগুজে শিকারের সন্ধানে ঘুরছে। তারি ফাঁকে ফাঁকে গম্ভীর মূর্তি পুলিশদের সজাগ দৃষ্টির বিদ্যুৎ।

পিকাডিলি-হেমার্কেটের মোড়ে প্রকাণ্ড যমদূতের মত এক নিগ্রো জুতো-পলিশওয়ালা বসেছিল। চারিদিকের আলো পড়ে তার চকচকে কালো মুখেও রং খেলছে।

চক্রবর্তী বলল, 'দাঁড়াও তো ভাই, জুতোটা একটু পলিশ করিয়ে নিই। এই কাজটি আমার দিয়ে কিছুতেই হয় না।'

চোখে পড়ল অল্প দূরেই একটা বাস স্ট্যাণ্ডে লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে একটা ছেলে আর একটা মেয়ে চুমু খাচ্ছে—বোধহয় সে তার বান্ধবীকে বাসে তুলে দিতে এসেছে। কিন্তু তাদের চুমু খাওয়া আর শেষ হয় না! চুমু খেতে খেতে ওদিকে বাস ছেড়ে চলে গেল! আর একদিকে একটু নির্জন পেয়ে একটা বিরাট থামের আড়ালে একজোড়া ছেলেমেয়ে দু'জন দু'জনকে জড়িয়ে ধরে দু'চোখ বন্ধ করে এমন চুমু খাচ্ছে যে, মনে হ'ল তারা আর এ দুনিয়ায় নেই; সবকিছু ভুলে গিয়েছে!

জুতো পলিশ শেষ হলে চক্রবর্তী বলল, 'দাও তো ভাই দশ শিলিং, কাল তোমায় দিয়ে দোব। তখন যে তিন পাউণ্ড দিলে সেটা অন্য কাজে দরকার আছে। জুতো পলিশে খরচ করলে চলবে না।'

তাড়াতাড়ি দশ শিলিং বার করে দিলুম।

তার পর এলোমেলো হাঁটতে হাঁটতে আমরা কভেন্ট গার্ডেনের কাছে গিয়ে পড়লুম।

কভেন্ট গার্ডেন। ফলফুল আর সব্জির বাজার। তারি সাথে সাথে ব্যালে অপেরার মেশামেশি। কানে আসে ফলফুল আর সব্জিওয়ালা বুড়োবুড়ি, ছেলেমেয়েদের গুণগুণ গান। কী সব

একেকজনের চেহারা। ঠিক যেন কোনো রসিক চিত্রকরের তুলির আঁচড়ে আঁকা বিরাট বিরাট একেকটি ব্যাঙ্গচিত্র।

চোখে পড়ল একদিকে ফুটপাথের উপরে এক বুড়ো পিকচার-পোষ্টকার্ডওয়ালার ছোট্ট দোকান।

চক্রবর্তী বলল, 'দাঁড়াও তো ভাই, কতকগুলো কার্ড কিনে নিই। ছোট ভাইটা পাঠাতে লিখেছে।'

দেখেশুনে তার একটাও পছন্দ হ'ল না। মুখ বেঁকিয়ে নাক সিঁটকে বলল, 'ভেরি ব্যাড প্রিন্ট। চল, আমরা ওইদিকে যাই।'

আমি উল্টোমুখো [illegible]

কোটের পাশের পকেটের দিকে চোখ পড়তেই চমকে উঠলুম। কী ও গুলো উঁকি দিচ্ছে? পিকচার-পোষ্টকার্ড না! কিন্তু কী করে তা হবে! আমার চোখ, বুড়ো দোকানীর চোখকে ফাঁকি দিয়ে চক্রবর্তী ও কাজ করতেই পারে না।

আমার ঐ চোখের ভুল বলে নিজেকে ধিক্কার দিয়ে ফের চলতে শুরু করলুম।

চক্রবর্তী কেকের বাক্সোটা ফের সামনে মেলে ধরে বলল, 'কই, খাও?'

রাস্তায় দেখ কেমন কী যত্ন করে বুড়োবুড়ীদের হাত ধরে আস্তে আস্তে রাস্তা পার করে দিচ্ছে! তার জন্যে সমস্ত গাড়ী দাঁড়িয়ে পড়ছে। কণ্ডাকটাররা দেখছি কত যত্নের সঙ্গে বুড়োবুড়ীদের ধরে ধরে বাস থেকে নামিয়ে দিয়ে রাস্তা পার করে দিয়ে আসছে। তার জন্যে বাস দাঁড়িয়ে থাকছে।

লোকজন, গাড়ীঘোড়া এত নিয়ম মেনে চলছে যে, গাড়ীতে হর্ণ বাজাবার দরকার হচ্ছে না। রাস্তায় রাস্তায় এত অসংখ্য গাড়ী এবং লোকের ভীড় তবু এখন পর্যন্ত তো আমি কোনো গাড়ীর হর্ণের আওয়াজ কানে শুনতে পেলুম না। কোথাও কোথাও দেখছি গাড়ীর

জ্বালায় লোকজন হয়তো কিছুতেই রাস্তা পার হতে পারছে না, তখন সামনের গাড়ীচালক নিজে থেকেই নিজের গাড়ীটা থামিয়ে পিছনের গাড়ীগুলোকেও থামাবার জন্যে হাত দেখাচ্ছে। সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত গাড়ী দাঁড়িয়ে পড়ছে। কোনো গলির গাড়ীওলা হয়তো গলির মুখে দাঁড়িয়ে আছে, দাঁড়িয়েই আছে, গাড়ীর ভীড়ে কিছুতেই বড় রাস্তায় পড়তে পারছে না, তখনো দেখতে পাচ্ছি বড় রাস্তার কোনো গাড়ীওলা নিজের গাড়ীটা দাঁড় করিয়ে পিছনের গাড়ীগুলোকেও দাঁড়াবার জন্যে হাত দেখিয়ে তাকে বড় রাস্তায় পড়বার সুযোগ করে [illegible] দিচ্ছে। গলির গাড়ীওলাও তখন তাকে একটা [illegible] দিচ্ছে।

এরা এত নিয়ম মেনে চলে যে, সেদিন মাঝরাত্রে হাঁটতে হাঁটতে বাড়ী ফেরার পথে দেখি রাস্তায় লোকজন, গাড়ীঘোড়া কিচ্ছু নেই, তবু লাল আলো জ্বলেছে বলেই একজন গাড়ী নিয়ে ঠায় দাঁড়িয়ে আছে, সবুজ আলো জ্বলতে তবে গেল।

লণ্ডনের সন্ধ্যায় মনে রং লাগিয়ে লিসেস্টার স্কোয়ার, টটেনহ্যাম-কোর্ট রোড, গুজ স্ট্রীট, বণ্ড স্ট্রীটে বিস্তর লুকোচুরী খেলে আমরা অক্সফোর্ড স্ট্রীট ধরে চলতে শুরু করলুম।

অক্সফোর্ড স্ট্রীটে পড়তেই একটা মেয়ের সঙ্গে তার দেখা। মনে হ'ল এ রকম রূপসী মেয়ে সত্যিই এর আগে আমি কখনো দেখিনি। নিখুঁত সাজসজ্জা।

দেখা হতেই একটু অপ্রস্তুতে পড়ে গিয়ে চক্রবর্তী আমায় বলল, 'তুমি একটু এগোও, আমি আসছি।'

কথাবার্ত্তা বলে ফিরে এসে গর্ব করে বলল, 'ও আমার নতুন গার্লফ্রেণ্ড। ফরাসি মেয়ে।'

বললুম, 'এত তাড়াতাড়ি ছেড়ে দিল যে?'

'ছাড়ছিল না, বলছিল থিয়েটার দেখাতে নিয়ে যেতে। তুমি দাঁড়িয়ে আছো তাই আমিই জোর করে চলে এলুম।'

খানিক দূর এগিয়ে আসতেই আবার এক মেয়ের সঙ্গে তার দেখা। কিন্তু একে দেখেই চমকে উঠলুম। এ তো রূপের জ্যোতি নয়, রূপের আগুন। আলো দেয় না। পোড়ায়। ছাপমারা চেহারা। চোখেমুখে যেন চটুল বিদ্যুৎ। রাঙা ঠোঁটে সাপের মত বিষাক্ত বাঁকা হাসি।

আমি দাঁড়িয়ে না থেকে তাড়াতাড়ি খানিকটা এগিয়ে গেলুম।

খানিক হাসিতামাসা করে তাকেও বিদায় দিয়ে চক্রবর্তী ফিরে এসে বলল, 'ও আমার আর একজন গার্ল ফ্রেণ্ড। নাম ডলি। এক সময় ও আমার মডেল ছিল। তখন আমি লণ্ডনে এসে খুব ছবি আঁকতুম।'

বললুম, 'কিন্তু ও কী ভালো মেয়ে? চেহারাটা যেন একেবারে ছাপমারা—'

চক্রবর্তী বলল, 'না, না, ডলি খুব ভালো মেয়ে।'

চুপ করে গেলুম। খানিক পরে বললুম, 'এইবার বিয়ে থা কর। এ রকম গার্লফ্রেণ্ড করে আর কতদিন চলবে?'

হেসে বলল, 'তা যা বলেছ। আমিও যে বিয়ের কথা ভাবছি না, তা নয়। কিন্তু আমার কী আইডিয়া জানো ভাই? ফ্লার্ট যার সঙ্গে ইচ্ছে কর, কিন্তু বিয়ে করবে নিজের সমাজে।'

বললুম, 'খুবই ভালো আইডিয়া, কিন্তু এখানেও তো বাঙালী মেয়ের আজকাল অভাব নেই। লণ্ডন তো যেন কলকাতা শহর বলে মনে হয়।'

চক্রবর্তী হাসল।

ততক্ষণ হাঁটতে হাঁটতে আমরা মার্বেল আর্চের কাছে এসে পড়েছি।

চক্রবর্তী বলল, 'চল, পার্ক লেন ধরে আর একটু হেঁটে গিয়ে হাইড পার্ক কর্নার থেকে আমরা বাসে চাপব।'

ওয়েষ্টবোর্ন পার্কে তার নতুন বাড়ীতে বসে একটু চা টা খাওয়ার পর চক্রবর্তী বলল, 'তুমি কয়েকদিন একটু জিরিয়ে জুরিয়ে নাও, লং জার্নি করে এই সবেমাত্র এসেছ। তারপর বিজনেস্ হবে। আমি যখন আছি তোমার কিচ্ছু ভাবনা নেই। মনে রেখো শুধু অনেষ্টি থাকলেই এ দেশে সবকিছু করা যায়। এ দেশে টাকা নয়, অনেষ্টি ইজ ইওর বেস্ট ক্যাপিটাল। তুমি এখন কোথায় যাবে? বাড়ী?'

'না। আমি এইখানে একটু ল্যাডব্রোকগ্রোভে একজনের সঙ্গে দেখা করে যাব।'

'তুমি তাহলে যাও ভাই, আমার এক বন্ধু এখুনি আসবে, তাকে নিয়ে একটু এয়ারপোর্টে যেতে হবে।'

বাইরে বেরিয়ে আসতেই মাঝ বয়সী এক ভদ্রলোক ঠাণ্ডায় দাঁতে দাঁতে কত্তাল বাজিয়ে একটু আঝালো সুরে শুধোলেন, 'আচ্ছা মশাই, এই বাড়ীতে কি প্রশান্ত চক্রবর্তী বলে কেউ থাকেন?'

ভদ্রলোকের কথার সুর শুনে মনে হল তিনি যেন একেবারে তিক্ত বিরক্ত হয়ে গিয়েছেন।

একটু অবাক হয়ে তার মুখের দিকে চেয়ে বললুম, 'হ্যা।'

ভদ্রলোকের যেন ঘাম দিয়ে জ্বর ছেড়ে গেল। হাঁফ ছেড়ে বললেন, 'যাক বাঁচা গেল। ভেরি ইট বেটার ফেলো। আমি একটা কাজে এক মাসের জন্যে কলকাতা থেকে লণ্ডনে এসেছি। আমার ফিরে যাবার সময় হয়ে এলো। অথচ এই এক মাসের মধ্যে ভদ্রলোককে কিছুতেই ধরতে পারছি না। তিনি কেবল বাড়ীই বদল করে বেড়াচ্ছেন। ডলিজ্ হিলের বাড়ীতে গেলে শুনছি তিনি মর্নিংটন ক্রেসেণ্টে চলে গিয়েছেন, আবার সেখানে গেলে শুনছি, তিনি আজ সকালেই হ্যাম্পষ্টিডের একটা বাড়ীতে উঠে গেছেন; হ্যাম্পষ্টিডে গেলে শুনতে পাচ্ছি হ্যামারস্মীথে চলে গেছেন; হ্যামার-

স্মীথে গেলে বলছে প্যাডিংটনে আবার প্যাডিংটনে গেলে বলছে, ওয়েষ্টবোর্ণ পার্কে। ভেরি ষ্ট্রেঞ্জ ফেলো। ভেরি ষ্ট্রেঞ্জ। উনি বাড়ীতে আছেন?'

তাঁর মারমুখো ভাব দেখে কৌতুহলী হয়ে বললুম 'আছে। কিন্তু ব্যাপার কী?'

তিনি দু'হাত তুলে নাটকীয় ঢঙে বললেন, 'ব্যাপার আমার মাথা আর মুণ্ডু মশাই। কী আর বলব! দুনিয়ায় কত রকম চিড়িয়াই যে আছে! চিড়িয়াখানা মশাই, এই দুনিয়া এক চিড়িয়াখানা। লণ্ডন-কলকাতা যত দূরেই হোক, আমরা হলুম গিয়ে ল'ইয়ার, আমাদের কানে সব খবরই পৌঁছয়। ভদ্রলোক তো এদিকে ব্যারিষ্টারী পড়তে যাচ্ছি বলে লণ্ডনে এসে রাজ্যের গার্লফ্রেণ্ড আর এ পাড়া, ও পাড়া করে মৌজ করে বেড়াচ্ছেন, আর ও'দিকে দেশে যে ওঁর স্ত্রী না খেতে পেয়ে মারা যাচ্ছে, সে খবরটুকুও রাখেন না। বললে বিশ্বাস করবেন না মশাই, আজ পাঁচ বছর হ'ল স্ত্রীকে একটা চিঠি লিখে খবর নেওয়া দূরে থাক, একটা পয়সা পর্যন্ত কখনো পাঠান না। সে বেচারীর দুর্দশা দেখলে চোখে জল এসে পড়ে। দেশের লোকের চাঁদা—চাদা বললে ভুল হবে—ভিক্ষেয় তার দিন চলছে। আমারই গাঁয়ের মেয়ে! তাই আসার সময় কাঁদতে কাঁদতে বারবার আমাকে বলে দিয়েছে আমি যেন দেখা করে ওঁর খবরটা নিয়ে যাই। তাদের দুঃখের কথা জানিয়ে যেন দেশে ফিরে যেতে বলি।'

আমার মাথা ততক্ষণে বাঁই বাঁই করে ঘুরতে শুরু করেছে। স্তম্ভিত হয়ে বললুম, 'বলেন কী! চক্রবর্তী বিবাহিত!'

'শুধু কী বিবাহিত? তিন তিনটি বাচ্চা বাচ্চা মেয়ে আছে মশাই, তিন তিনটি মেয়ে। তারা সব না খেতে পেয়ে মরছে।'

'কিন্তু সব্বাই জানে ও অবিবাহিত!'

'লুকিয়েছে, বুঝলেন না, লুকিয়েছে! গভীর জলের মাছ! মস্ত ঘুঘু। বিবাহিত বললে রাজ্যের গার্লফ্রেণ্ড করে, এ পাড়া ও পাড়া ঘুরে মৌজ করা হবে কী করে!'

'কিন্তু কলকাতায় থাকতেও আমাকে কক্ষনো বলেনি তো দেশে গিয়ে বিয়ে করেছে বলে!'

আমার সে কথার উত্তর না দিয়ে ভদ্রলোক বললেন, 'কী বললেন, ভিতরে আছেন উনি? কত নম্বর রুম?'

'দোতলায়—আট নম্বর রুম।'

ঝাঁটার মত গোঁফ ফুলিয়ে, গোল গোল চোখ ঘুরিয়ে আস্ফালন করে 'আমি হলুম গিয়ে ল'ইয়ার, আমার কাছে কারো চালাকী চলবে না' বলে ভদ্রলোক ভিতরে চলে গেলেন।

আমি আর ল্যাডব্রোক গ্রোভের দিকে পা বাড়াব কী, সারা লণ্ডন তখন আমাকে নিয়ে ঘূর্ণীর মত ঘুরছে। আমার তিন পাউণ্ড দশ শিলিং নির্ঘাৎ মারা গেল। এই বিদেশ বিভুঁয়ে তিন পাউণ্ড দশ শিলিং আমার কাছে তিন লক্ষ টাকার সমান।

॥ বাইশ ॥

আগেই সবিনয়ে জানিয়ে রেখেছি আমি ঠিক ভ্রমণ কাহিনী লিখতে বসিনি, সে ক্ষমতা থেকে আমি বঞ্চিত। তাই আমার এ বই-এর নাম 'সরাইখানার যাত্রী'। তা ছাড়া আমাদের দেশে 'বিলেত ফেরত' বলতে যা বোঝায় তা আমি নই। লণ্ডনে আমার অভিজ্ঞতা খুবই অল্পদিনের। সুতরাং সেটা ভাসা ভাসা। সেইজন্যেই আমার এ লেখায় বিদেশের কোনো খবর নেই, দিতে চেষ্টাও করিনি। তা ছাড়া আজকাল বিলেতের খবর কারই বা অজানা আছে যে, আমার ভোঁতা কলম দিয়ে আনাড়ি হাতে তা আবার নতুন করে পরিবেশন করতে হবে ?

শেফার্ডস বুশে শফিক শাবান যে ছাতাধরা লালচে বাড়ীতে থাকতেন প্রকাণ্ড সে পুরনো বাড়ী। বহু তার খোপ। প্রতি খোপে খোপে নানান রঙের লোক।

শাবান ছাড়া সে বাড়ীর আর ছ'জনের সঙ্গে জানাশোনা হয়েছিল।

এক হচ্ছে সুসানা। ইংরেজ মেয়ে। দুই সেন। তিন হচ্ছেন বড়দা। সকলের তিনি বড়দা। চার ওথেলো। ঘানার লোক। আসল নাম ওথেলো নয়। বন্ধুরা নাম দিয়েছিল ওথেলো, দি মুর। পঞ্চম হচ্ছেন আল্‌হাজ্‌ ফয়জুর আহমদ বোগ্দাদি। আর ষষ্ঠ জন ব্যানার্জি।

সকালবেলায় ঠিক সময়টিতে খাবানের ঢাকর দেখা না পেয়ে ভাবলুম দেখি তো একবার খোঁজ নিয়ে হঠাৎ গা ঢাকা দিলেন কেন! ফাঁদে পড়ে আটকে গেলেন না তো! এ দেশে কিছুই বলবার জো নেই। সোনালী চুল আর নীল চোখ দিয়ে চারিদিকেই ফাঁদ পাতা। কে কখন ফাঁদে পড়ে যায় বলা মুস্কিল।

বাইরের দিকে একবার সভয়ে চেয়ে ভারি ওভারকোটটা চাপিয়ে নিয়ে বৃষ্টির মাঝখানেই বেরিয়ে পড়লুম। একে ঝিপ ঝিপ বৃষ্টি, তার উপর আবার ঠাণ্ডা ধারালো বাতাস যেন সাঁই সাঁই করে এলোপাথাড়ি তলোয়ার চালাচ্ছে। যার গায়ে লাগছে কেটে কুচি কুচি হয়ে যাচ্ছে।

স্লোন স্কোয়ারে একটু কাজ ছিল। সেখানে কাজ সেরে চেশাম প্লেসে এসে পেনি রেখে দুধওয়ালার গাড়ী থেকে দুধের বোতল নিয়ে লাউণ্ডস্ স্কোয়ার পার হয়ে নাইট্‌স্‌ব্রিজের মোড়ে পড়তেই আমার বুড়ো খবরের কাগজওয়ালা 'পাইপার' 'পাইপার' করে হাঁকতে হাঁকতে আমাকে দেখে হাসিমুখে 'গুড মর্নিং স্কোয়ার' বলে হাতে একটা কাগজ ধরিয়ে দিল।

হাঁটতে হাঁটতে হাইডপার্ক কর্ণারের কাছে এগিয়ে গিয়ে দেখলুম আমার ফলওলির ফলের গাড়ীটা ঠিক জায়গায় রাখা আছে, কিন্তু সে নিজে নেই। কোন্ ফলের কত দাম সব চিরকুট লিখে ঝুলোনো আছে। নিজেই দুটো আপেল ওজন করে নিয়ে পয়সা রাখার জায়গায় পয়সা রেখে পাশে চাইতেই চোখে পড়ল একটু দূরেই একটা বন্ধ দোকানের সামনে নীচু সিঁড়ির উপরে আধখেপির মত একটা আধবুড়ি মেম বসে আছে আর আধবুড়োগোছের একজন খবরের কাগজওয়ালা পাশের ফুলওয়ালীর কাছ থেকে এক গোছা লাল ফুল কিনে তাকে উপহার দিচ্ছে। বুড়ী একেবারে খুশীতে আটখানা হয়ে

বুড়োর হাত থেকে ফুলগুলো নিচ্ছে। কয়েকজন বুড়ী মেম রাস্তা দিয়ে চলে যেতে যেতে আড়ে আড়ে তাই দেখে নিজেদের মধ্যে হাসাহাসি করছেন।

কে? চমকে উঠলুম। চোখদুটো ঘষে নিয়ে আর একবার ভালো করে চেয়ে দেখলুম। নাঃ, চিনতে ভুল হয়নি। আরে, ওই বুড়ী'ই তো আমার ফলওলি! আজ মাথায় একটা রঙীন রুমাল বেঁধেছে বলে প্রথমে চিনতে পারিনি! বুড়োবুড়ীর কাণ্ড দেখে হাসি পেল।

হঠাৎ কানে এলো বাজনার সুর। ওপারের ফুটপাথে নিজের জায়গাটিতে বসে আপন মনে বিভোর হয়ে মাউথ অর্গান বাজাচ্ছে আমাদের মরগান, দি ভাইকিং! বড় করুণ সে সুর। কাছে গিয়ে দেখলুম দু'চোখ বন্ধ। পাছে তার তাল কেটে যায় তাই ডাকলুম না। চুপচাপ খানিক শুনে পাশে রাখা তার উল্টোনো টুপিতে কতকগুলো পেনি রেখে বাসে চাপলুম।

প্রথমে যাব মেরিলিবোন। একটু দরকার আছে। তার পর যাব শেফার্ডস বুশ।

বাসের জানালা থেকে দেখতে পেলুম মোড়ে মোড়ে প্রথম মহাযুদ্ধ এবং দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের মৃত সৈনিকদের কালো কালো বিরাট বিরাট মূর্তিগুলোর পায়ের কাছে ভোরবেলায় কারা ফুল দিয়ে গেছে।

মেরিলিবোনের কাজ সেরে শেফার্ডস বুশে পৌঁছতে পৌঁছতে প্রায় ন'টা বেজে গেল।

গিয়ে দেখলুম শাবান এক উঁচু চেয়ারে বসে আছেন আর এক মেম ইজেল খাড়া করে ক্যানভাস খাটিয়ে তাঁর ছবি আঁকছে।

মেয়েটির মাথা থেকে দুই গাল বেষ্টন করে চমৎকার একটি রুমাল বাঁধা।

একটা জিনিষ দেখে অবাক লাগল। সে সুন্দরী নয়, অথচ আর পাঁচটা মেয়ের মত সুন্দর সাজবার জন্যে ঠোঁটে, গালে, ভুরুতে কোথাও এতটুকু রংটং মাখেনি। আমাদের দেশের মেয়েদের মত গা ভর্তি গয়না পরার জংলী রুচি এ'দের নেই জানি, তবুও দেখেছি অনেক মেম দু'একটা নকল মুক্তো কিম্বা প্লাষ্টিকের মালাটালা কিছু পরে। কিন্তু এ মেয়ের গায়ে তারো নামগন্ধ নেই। স্বচ্ছ নীল চোখদুটিতে লাজুক চাহনী।

বাইরে বৃষ্টি। ঘরে অন্ধকার। আলো জ্বলছে। এক কোণে ফায়ার প্লেসে আগুন জ্বলে সেই-রক্তজমানো ঠাণ্ডার মাঝে মধুর গরমে ঘরখানাকে যেন স্বর্গ করে রেখেছে।

শাবান আমাকে দেখেই চেয়ার ছেড়ে লাফিয়ে উঠে বললেন, 'আরে, আসুন, আসুন। আপনার বিরহে ছটফট করছি, তবু নড়বার উপায় নেই। সুসানা কাল বিকেল থেকে বন্দী করে রেখেছে। পোরট্রেট না হ'লে ছুটি নেই।'

সুসানার লাজুক চোখ দুটোয় আর একটু লজ্জার ছায়া ফুটে উঠল।

শাবান আমার সঙ্গে তার আলাপ করিয়ে দিলেন। ছবিতে কাঁচা হাত। এঁকে এঁকে পাকাচ্ছে। বিশেষ করে পোরট্রেটে।

আমি যেয়ে পড়ায় ছবি আঁকা তখনকার মত শিকেয় উঠল।

শাবান একটু ছুটি পেয়ে হাঁফ ছেড়ে বেঁচে এক কোনে বসে বাঁশি বাজাতে শুরু করলেন।

আমি বললুম, 'আজ আপনার মরগান, দি ভাইকিঙের বাঁশি শুনলুম।'

শাবান হেসে বললেন, 'তাই না কী? কেমন লাগল?'

বললুম, 'ভালো।'

সুসানা অবাক হয়ে শুধোলো, 'মরগান, দি ভাইকিং কে?'

শফিক শাবান সারা শেফার্ডশ বুশ কাঁপিয়ে হেসে উঠে তার পর সবকিছু বুঝিয়ে দিলেন।

সুসানা প্যালেট, তুলি টেবিলের উপর রেখে দিয়ে শুধোলো, 'আচ্ছা, আপনাদের দেশে শুনেছি খুব বেশী মন্ত্রতন্ত্রের চলন—সত্যি?'

বললুম, 'অনেকটা।'

'ইয়োরোপের, মধ্যপ্রাচ্যের বহু দেশ আমি হিচহাইকিং করে ঘুরেছি। প্রত্যেক সামারেই আমি বেরোই। ইণ্ডিয়ায় একবার যাবার ইচ্ছে আছে। দেখব সে কেমন আশ্চর্য দেশ।'

বললুম, 'সেই সবচেয়ে ভালো পরের মুখে না শুনে নিজের চোখে দেশটা একবার দেখে আসুন।'

'ইণ্ডিয়া দেখবার আমার ভারি কৌতূহল। শুনেছি বড্ড বেশী সাপ আর ভূত-পেত্নির উপদ্রব?'

বললুম, 'সাপ আছে, কিন্তু ভূত আছে কী না কখনো দেখিনি। তবে হ্যাঁ, পেত্নি ঘরে ঘরে আছে বটে!'

আমার কথাটা ঠিক বুঝতে না পেরে বলল, 'এ্যাঁ!' মনে হ'ল একটু ভয় পেয়ে গিয়েছে।

বললুম, 'কিন্তু আপনার তাতে ভয়ের কিছু নেই। মেয়েদের তারা ঘাড় মটকায় বলে কখনো জানি না। তবে দেশশুদ্ধ ছেলে-দের তারা ঘাড় মটকে খাচ্ছে জানি!'

এতক্ষণে বুঝতে পেরে সুসানা আর শফিক শাবান চারিদিকে হাসির রং ছড়িয়ে দিলেন।

হাসি থামিয়ে শফিক শাবান বললেন, 'উঃ! দিন দিন এত ঠাণ্ডা বাড়ছে যে ফায়ার-প্লেসেও যেন আর ফায়ার নেই বলে মনে হয়! এত ঠাণ্ডা কেন পড়ে বলুন তো?'

আমি কিছু বলার আগেই সুসানা যেন কী ভাবতে ভাবতে

আনমনে বলল 'গাছের পাতা ঝরছে কিনা, তাই এত শীত পড়েছে। না ঝরলে নতুন পাতা গজাবে কী করে?'

তার উত্তর শুনে আমি হাঁ করে তার মুখের দিকে চেয়ে আছি। আর্টিষ্টরা শুনেছি একটু বে-খেয়াল গোছেরই হয়! কী বলে, কী করে তাদের না কী সবসময় ঠিক দিশে থাকে না।

শাবান যেন চট করে কী একটা ভেবে নিয়ে চোখ পাকিয়ে বললেন, 'হাঁ? এমন কথা? কাটো তবে লণ্ডনের সব গাছ।'

আমি আর সুসানা সঙ্গে সঙ্গে আরো অবাক হয়ে তাঁর মুখের দিকে তাকালুম।

হঠাৎ তিনি হাসতে হাসতে উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, 'বুঝলেন না তো সুসানার অদ্ভুত উত্তরে আমি আবার তার চেয়েও এক অদ্ভুত উত্তর দিলুম কেন? আপনারা তো ভাবছেন, এ লোকটার নিশ্চয়ই মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছে। তা নয়। তবে শুনুন বলি'—ফের বেশ করে জাঁকিয়ে বসে রসিয়ে বসিয়ে বললেন, 'গল্প প্রচলিত আছে বাগদাদে যখন প্রথম এক তূর্কি পাশা আসেন, অসহ্য গরমে রাগের চোটে তাঁর চোখে মুখে আগুন ছুটতে চায় দেখে পাত্রমিত্ররা ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে বলল, হুজুর, খেজুর পাকছে, তাই এত গরম পড়েছে। পাশা চোখ রাঙিয়ে বললেন, হাঁ? এমন কথা? কাটো সব খেজুর গাছ। দুর্দ্দান্ত পাশার কথায় প্রতিবাদ করে এত বড় বুকের পাটা কারো নেই। তাই সবাই মিলে না কী বাগদাদের খেজুর গাছ কেটে সাফ করে দেয়!'

আমার হাসতে হাসতে পেটে খিল ধরল।

আর সুসানা হাসতে হাসতে ছেঁড়া মালার একগাদা মুক্তোর মত টল টল করে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ল।

এমন সময় হাতে এক মস্ত বেগনী রঙের থলি ঝুলিয়ে মহাব্যস্ত হয়ে সেন এসে হাজির। ওর সদাই অমনি ব্যস্ত ভাব।

ঢুকেই ধপ করে থলিটা মেঝেতে রেখে চারিদিকে একবার ব্যস্ত চোখ বুলিয়ে বলল, এই যে ইমাম সায়েব, আপনি কতক্ষণ হল এলেন? খবর সব ইয়ে তো? সুসানার পোরট্রেট কদ্দুর এগোলো? বা'! প্রায় শেষ হয়ে এসেছে দেখছি। তোমার খবর সব ইয়ে? মিষ্টার শফিক শাবান বেশ ইয়ে? দু'শিলিং ধার দিন তো মিষ্টার শাবান, কালকেই দিয়ে দোব'—সঙ্গে সঙ্গে থলিটা তুলে নিল।

শাবান বললেন, 'আচ্ছা হবে, হবে—অত ব্যস্ত কেন? কী আছে থলেতে?'

'আর বলবেন না। খাটতে খাটতে, মাল বইতে বইতে প্রাণটা ইয়ে হয়ে গেল। এমন কষ্টের জীবন জানলে কে আসত এ দেশে! শালার জুতো সেলাই থেকে চণ্ডীপাঠ পর্যন্ত সব কাজ নিজেকে করতে হয়। শুধু চুল ছাঁটাটি বাদে। তা'ও বোধহয় এবার নিজেকেই করতে হবে। যদ্দিন দেশে ছিলুম ছটফট করছিলুম কদ্দিনে আমাদের এক পাল ভিখিরী আর ঠগের দেশ ছেড়ে বিলেতের স্বর্গে যাব। আর বিলেতে এসে ছট্‌ফট্ করছি কদ্দিনে দেশে ফিরব। মনে কী আর কোথাও সুখ বলতে কিছু আছে! সেই রবীঠাকুরের ইয়ে, মানে কাব্যি আছে না, নদীর ওপার ভাবছে এ পারেতেই সব সুখ, আবার নদীর এ পার ভাবছে যত সুখ সব ও পারে? একেবারে খাঁটি ইয়ে। বসবার কী আর ইয়ে আছে যে দুদণ্ড বসব? কাপড়গুলো আজ তিনদিন হ'ল ধুয়ে রেখেছি, ইসতিরি করতে নিয়ে যাওয়ার সময় হয়নি, তাই এখন লণ্ড্রিতে এই এক ব্যাগ কাপড় নিয়ে যাচ্ছি ইসতিরি করতে। তার পর আবার ফিরে এসেই ইয়ে, মানে, রান্না করতে হবে। বাপের জন্মে কোনোদিন রান্না করিনি, আর এই দেখুন, কাল বাঁধতে গিয়ে ইয়ে, মানে হাত পুড়িয়ে ফেলেছি। তার পর রান্না করে খেয়েদেয়ে বাসনটাসন ধুয়েই বেরব চাকরীর খোঁজে। অক্সফোর্ড ষ্ট্রীটের দু'

পাশাড়ি দোনগুলোর শো কেসে কাল দেখছিলুম অনেক পার্ট-টাইম জবের ইয়ে সাঁটা। আজ ঠিক করেছি সবগুলোতেই ঢু দিয়ে কপাল ঠুকে দেখব। একটা পার্ট-টাইম ইয়ে না হলেই চলছে না।'

আমি বললুম, 'সেদিন যে আপনি কী সব চাকরীর সন্ধানে গেলেন,—কী হ'ল?'

আড়চোখে একবার সুসানার দিকে চেয়ে নিয়ে বাংলায় বলল, 'সে আর বলবেন না। এই ইংরেজগুলো,—ওঃ। এমন ইয়ে! এত ভণ্ডামীও জানে! কথায় কথায় সকলের মুখে থ্যাঙ্ক ইউ, স্যার, প্লিজ, পার্ডোন, এক্সকিউজ মি, শুনে মনে হবে না জানি সব কী দেবতা। কিন্তু ও সব আসলে সোনায় বাঁধানো বিষদাঁত। শালারা ওপর থেকে জল ঢালে আর নীচে থেকে গুঁড়ি কাটে। তিন জায়গায় সেদিন গেলুম। বললে কী জানেন? পয়লা নম্বর মহা দরদী সেজে বলল, 'আহা, আপনি আমার দোকানে ক্লিনারের কাজ করবেন, সে হ'তেই পাবে না। এখানে সবাই যদিও সব কাজ করছে, dignity of labour অত্যন্ত বেশী, তবু আপনার মত একজন লোককে আমি এ কাজ করতে দিতে পারি না। আপনার আরো ভালো কাজ দরকার। আমাকে দয়া করে আপনার ঠিকানাটা দিন। আমি কাল পরশুর মধ্যেই এর চেয়ে কোনো একটা ভালো কাজ ঠিক করে আপনাকে চিঠি লিখব। আজ পর্যন্ত তার চিঠির পাত্তা নেই। আসলে মিষ্টি কথায় ফিরিয়ে দিল আর কী! কালো চামড়াকে দেবে না। দ্বিতীয় দোকানের মালিক এক বুড়ী মেম। দেখা করতেই মহা খাতির করে বসিয়ে বলল, ভয়ানক দুঃখিত। এই মোটে আধ ঘণ্টাও হয়নি আমি ক্যাশিয়ার ঠিক করে ফেলেছি। আপনি যদি আধ ঘণ্টা আগে আসতেন তাহলে আপনাকে আমি নিশ্চয়ই রাখতুম। অথচ কালও আমি দেখেছি শো কেসে সেই বিজ্ঞাপন আঁটা আছে। তৃতীয় দোকানের

ম্যানেজার বলল, ভয়নক দুঃখিত মিষ্টার সেন, আপনি মেয়েছেলে হলে নিশ্চয়ই রাখতুম। ইংল্যাণ্ডে দোকানে টোকানে মেয়েরাই বেশী কাজ পায়, ছেলেদের পাওয়া ভারি মুস্কিল। কোম্পানী থেকে হুকুম আছে এ কাজের জন্যে মেয়েছেলে বহাল করতে হবে। অথচ পরশু আমি দেখেছি সেইখানে এক ছোকরাকেই বহাল করেছে। মিষ্টি কথায় শালারা এমন কায়দা করে কালো চামড়াকে অবহেলা করে যে, হঠাৎ আসল ব্যাপার বোঝা দায়। দিন তো মিষ্টার শফিক, দু'শিলিং ধার, আর দেরী করায় ইয়ে নেই।'

শাবানের কাছ থেকে দু'শিলিং পেতেই হঠাৎ মনে পড়ল, 'ওহো, আমার কলমটা কাল ইয়ে—মানে হারিয়ে ফেলেছি, আপনাদের কারো কাছে নেই? এই যে সুসানার আছে দেখছি। দাও তো সুসানা, কলমটা একবার। রাত্রেই ফিরিয়ে দোব।' নিজেই টেবিল থেকে ছোঁ মেরে তুলে নিয়ে পকেটে গুঁজল।

সুসানা তখন সিগারেট ধরাচ্ছিল। সেনকে একটা দিতে গেল। সেন গম্ভীর হয়ে বলল, 'Thank you sir, I am vegetarian.'

আমরা সবাই হক্‌চকিয়ে মুখ চাওয়াচাওয়ি করছি দেখে সেন থলি নামিয়ে রেখে উপরের দিকে মুখ তুলে খুব খানিক হাসল আগে। তার পর বলল, 'জানেন না বুঝি? তবে শুনুন। একবার এক শিখ সর্দারজীকে এক মেমসায়েব সিগারেট অফার করেন। এখন সর্দারজীর দৌড় ফাষ্টবুক পর্যন্ত। তাই শুনেই ফট্ করে মেমসায়েবকে সর্দারজী বলল, Thank you sir I am vegetarian.' তারপরেই হাসির রঙে ঘরখানাকে একটু রঙিয়ে দিয়ে থলিটি তুলে নিয়ে সেন টুক করে বেরিয়ে গেল।

সেন বেরিয়ে যেতেই 'কই সেন আছো না কী—সেন' বলতে বলতে বড়দা এসে ঢুকলেন। ঢুকেই ছবির ইজেল দেখে একটু

অপ্রস্তুত হয়ে গিয়ে বললেন, 'ওহো, তোমরা কাজ করছ। আচ্ছা, আমি পরে আসব।'

শাবান জোর করে বললেন, 'না, না বড়দা বসুন। কাজ পরে হবে।'

বড়দার বয়েস খুব সম্ভব চল্লিশের কিছু ওপরে। মাথায় ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া কাঁচাপাকা চুল। বহুকাল বিলেতে থাকায় রংটিতে একটু সায়েবী আমেজ লেগেছে। গায়ে চকোলেট রঙের গরম ড্রেসিং গাউন। মুখে পাইপ। হাতে ক্যামেরা। তাঁর এই ক্যামেরাটি যেন ইরাকীদের তসবী! ছবি তিনি তুলতে জানেন না, অথচ এই ক্যামেরাটি সর্বদা তাঁর হাতে কিম্বা কাঁধে আছেই। কানে পেন্সিল! বোধহয় কিছু লিখতে লিখতে উঠে এসেছেন। উদাসীন, খেয়ালী গোছের লোক। কম্যুনিষ্ট। আমাদের দেশের কোনো কোনো ব্রাহ্ম এবং কম্যুনিষ্টকে জানি, মুখে তাঁরা ঘোরতর ব্রাহ্ম এবং কম্যুনিষ্ট, কিন্তু যেই হিন্দু মুসলমানের কোনো প্রশ্ন ওঠে অমনি তাঁরা ঘোরতর হিন্দু হয়ে যান!—এমন কী উদার ঋষি ভান করা ন্যাকা রবীন্দ্রনাথও এ রোগ থেকে বাদ যান না! অর্থাৎ তাঁদের নীতি যেন আরবদের নীতি! যেই প্যালেষ্টাইন কিম্বা অন্যকিছু নিয়ে কারো সঙ্গে কোনো গোলমাল বাধে দুনিয়ার মুসলমানদের কাছ থেকে সাড়া পাবার জন্যে অমনি তারা রাতারাতি ঘোরতর মুসলমান হয়ে পড়ে; তার পর যেই গরজটি ফুরিয়ে যায় অমনি তারা রাতা-রাতি ঘোরতর আরব হয়ে পড়ে! বড়দা কিন্তু সে রকম দু'রঙা কম্যুনিষ্ট নন।

বড়দা ধীরেসুস্থে একটা চেয়ার টেনে বসে বললেন, 'সেন, এসেছিল না?'

বললুম, 'হ্যাঁ, এই মাত্তর বেরিয়ে গেল।'

'কখন ফিরবে কিছু বলল?'

'না, তা বলেনি। তবে তাড়াতাড়ি ফিরবে বলেই মনে হ'ল। কেন বলুন তো?'

'আজ সকালে আমার এক বন্ধুর সঙ্গে দেখা করে ও'র জন্যে একটা রেস্তোঁরায় একটা চাকরী ঠিক করেছি। রাতে গিয়ে প্লেট ধুয়ে দিয়ে আসতে হবে। কিন্তু ও'কে সকাল থেকে কিছুতেই ধরতে পারছি না। তাই বলাও হচ্ছে না। তা ছাড়া আমার ঘড়িটা কালই ফিরিয়ে দোব বলে আজ সাতদিন হলো নিয়েছে, আর দেবার নামটি করছে না।'

আমরা সবাই বললুম, 'বলেন কী!'

বড়দা বললেন 'আজ ঘড়িটা যদি না পাই তাহলে মুস্কিল হয়ে যাবে। কাল সকাল আটটার ট্রেনে আমি ব্রাসেল্‌স যাচ্ছি, ট্রেন ধরতে পারব না।'

সুসানা হেসে বলল, 'তা'হলে ও ঘড়ি আপনার না ফেরত পেলেই ভালো। কারন, পেলে আর ব্রাসেল্‌স যাওয়া হবে না।'

আমি আর শাবান দু'জনেই একটু অবাক হয়ে শুধোলুম, 'কেন?'

সুসানা স্নিগ্ধ হাসির আভায় মুখ উজ্জ্বল করে বলল, 'সেটা বড়দাকেই শুধিয়ে দেখুন। ওঁর ঘড়িতে আটটা কোনোদিন ঠিক সময়ে বাজে না।'

বড়দা বললেন, 'হ্যাঁ, তা যা বলেছ। সে বিষয়ে আমার ঘড়ি একেবারে দাগী চোর। বিশ্বাস করেছো কী মরেছ! আরে ওই খুনে ঘড়ির পাল্লায় পড়েই তো কিছুতেই আমাব দেশে ফেরা হ'ল না। তিন তিনবার বুকিং করে নষ্ট হলো। ওই ঘড়িকে বিশ্বাস করে কিছুতেই জাহাজ ধরতে পারলুম না। তাই রাগ করে ঠিক করে ফেললুম আর দেশেই ফিরব না।'

আমি বললুম, 'তবে ও ঘড়ি সেনকেই দিয়ে দিন।'

বড়দা গম্ভীর হয়ে গিয়ে বললেন, 'না সে হতেই পারে না। ও আমার ভয়ানক দামি ঘড়ি। এ্যাদ্দিন সাথে সাথে আছে, একটা মায়া পড়ে গেছে। আমি আর আমার ঘড়ি একসাথে নেই—এ আমি ভাবতেই পারি না।'

সুসানা মুচকি হেসে বলল, 'এক মিনিট। আমি এক্ষুনি আসছি।'

সে বেরিয়ে যাওয়ার একটু পরেই ইয়া জাঁদরেল গুঁফো এক পুলিশম্যান এসে হাজির। কী গাম্ভীর্য! যেন স্বয়ং বিশমার্ক!

শফিক শাবানকে সামনে পেয়ে শুধোলো, 'স্যার, মিষ্টার অরুণ মুখার্জি কার নাম?'

শফিক শাবান একটু অবাক হযে বড়দাকে দেখিয়ে দিলেন।

পুলিশম্যানটা বড়দাকে শুধোলো, 'আপনি কী স্যার, এখন মিউজিয়াম ষ্ট্রীটে গিয়েছিলেন?'

বড়দা বললেন, 'হ্যাঁ, এই মাত্তব আসছি।'

পুলিশম্যানটা সঙ্গে সঙ্গে পকেট থেকে বেশ ধুলো একটা মানি-ব্যাগ বার করে বলল, 'মিউজিযাম ষ্ট্রীটে, স্যার, আপনার এই মানিব্যাগটা কুড়িয়ে পেয়েছি।' ব্যাগটি হাতে ধরিয়ে দিয়েই সঙ্গে সঙ্গে পুলিশম্যান অদৃশ্য।

বড়দা ব্যাগ হাতে নিয়ে থ।

আমরাও অবাক।

চোখের সামনে যেন একটা ভোজবাজি ঘটে গেল। আমাদের দেশে এ জিনিষ কল্পনাও করা যায় না।

বড়দা বললেন, 'রাস্তা হাঁটতে হাঁটতে কখন ব্যাগটা পকেট থেকে পড়ে গিয়েছিল জানতেও পারিনি। এতে প্রায় পঞ্চাশ পাউণ্ড আছে। সর্বনাশ হয়েছিল আর কী!'

আমি বললুম, 'এ দেশের লোকের সততা, কর্ত্তব্যজ্ঞান আর দায়িত্বজ্ঞান দেখলে সত্যিই অবাক হয়ে যেতে হয়।'

বড়দা বললেন, 'তা'ও তো এখনো কিছুই দেখনি। এই তো সবেমাত্র এ দেশের মাটিতে পা দিয়েছ। এখনো অনেক ভেল্কি দেখতে বাকী।'

শফিক শাবান বললেন, 'এ দেশের পুলিশ যেন সত্যি সত্যিই ম্যাজিক জানে!'

বড়দা বললেন, 'তা যা বলেছ। ম্যাজিকই দেখায়! অথচ আমার বেশ মনে আছে মিউজিয়াম ষ্ট্রীট ধরে যখন হাঁটছিলুম, ধারে কাছে কোথাও কোনো পুলিশ আমার চোখে পড়েনি। যেখানে দরকার পুলিশ যেন চোখের সামনে মাটি ফুঁড়ে বেরোয়।'

শফিক শাবান বললেন, 'আপনার ব্যাগ বলে পুলিশম্যানটা জানলই বা কী করে? ঠিক বাড়ীই বা খুঁজে বার করল কী করে?'

বড়দা বললেন, 'ভিতরে আমার একটা ছোট্ট কার্ড লাগানো আছে। কিন্তু নামধাম না থাকলেও ও'রা ঠিক কেমন করে বাড়ী চিনে বার করে যার জিনিষ তাকে দিয়ে যায়! অথচ একটি পেনি খোয়া যাবে না। তাই তো তখন তোমার কথায় সায় দিয়ে বললুম এ'রা ম্যাজিকই জানে।' তার পর একটু থেমে পাইপে আরাম করে টান দিতে দিতে বললেন, 'একবার বার্মিংহামে এক দর্জির কাছে আমার একটা কোট অল্টার করতে দিয়েছিলুম। এক মাস পরে কোটটা নিতে গেলে দর্জি আমাকে পাঁচটা নোট ফেরত দিয়ে বলল, স্যার, আপনার কোটের পকেটে এই পাঁচ পাউণ্ড রয়ে গিয়েছিল। অথচ আমার খেয়ালও ছিল না। আমাদের দেশে এ সব গল্পের মতো মনে হবে।'

এমন সময় সুসানা ফিরে এলো। এসে বড়দার দিকে চেয়ে

বলল, 'একজন পুলিশম্যান আপনার খোঁজ করছিল। আমি এখানে পাঠিয়ে দিয়েছিলুম। এসেছিল?'

বড়দা বললে, 'হ্যাঁ।' তার পর কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থেকে বললেন, 'আচ্ছা, আমি এখন চলি। কাল সকালেই ব্রাসেলস যাচ্ছি কি না। বাক্সোটাক্সো গুছোতে হবে। তোমাদের সঙ্গে সেনের দেখা হলে আমার কামরায় একটু পাঠিয়ে দিও।'

বড়দা চলে গেলে সুসানা বলল, 'এই এক বাতিকগ্রস্ত লোক! উনি কী সত্যিই কাল ব্রাসেল্‌স যাবেন ভেবেছেন না কী? মোটেই না। গত বছর একবার ঝোঁক হয়েছিল, যার সাথেই দেখা হয় গম্ভীর হয়ে বলেন, আমি তো আর কোনো কাজের ভার নিতে পারি না, আমি তো কালকেই দেশে ফিরে যাচ্ছি। এক মাস ধরে ওই ঝোঁক ছিল। এবার আবার হয়েছে, কাল সকলেই আমি ব্রাসেলস যাচ্ছি! আজ সাতদিন ধরে শুনছি কাল সকালেই আমি ব্রাসেল্‌স যাচ্ছি—অথচ কোনোদিনই যাচ্ছেন না!'

একটু পরেই বড়দা আবার হন্তদন্ত হয়ে ফিরে এলেন।

সুসানা মৃদু হেসে বলল, 'কী হলো, ফিরে এলেন? বাক্সো গুছোলেন না?'

বড়দা বললেন, 'আরে, মহা বিপদ হয়েছে। পেন্সিলটা যে কোথায় রাখলুম কোথাও খুঁজে পাচ্ছি না। আমার ভীষণ সখের পেন্সিল।'

সুসানা হেসে ফেলল। শফিক শাবান কোনোরকমে হাসি সামলালেন।

আমি বললুম, 'আপনার কানে হাত দিয়ে দেখুন!'

সঙ্গে সঙ্গে লজ্জায় তাঁর সারা মুখ লাল হয়ে উঠল। কানে হাত দিয়ে বললেন, 'দেখেছ, কানে গুঁজে রেখে আর সারা বাড়ী তোল-

পাড় করে বেড়াচ্ছি কোথায় গেল আমার সখের পেন্সিল!' লজ্জায় তাড়াতাড়ি পালিয়ে গেলেন।

হঠাৎ জানালা দিয়ে দেয়ালের হাল্কা সবুজ ওয়াল-পেপারের উপর রোদের একটা সোনালী রেখা চিক্‌চিকিয়ে উঠল।

কিন্তু ওই পর্যন্তই। জানালার পর্দা সরিয়ে আকাশের দিকে চাইতে না চাইতেই সূর্য আবার মেঘের কম্বলে মুখ লুকোলো।

আমাদের দেশে শ্রাবনের মেঘ যেমন মস্ত আকাশখানা জুড়ে নীল মখমল পেতে দেয়—যে অপরূপ মেঘের রূপে নয়নমন একেবারে জুড়িয়ে যায়, বিলিতি মেঘের সে রূপই নেই। কেমন একরকম বিশ্রী ছাতাধরা রং। আকাশের বুড়ো চোখে যেন ছানি পড়ে গেছে। আর এ দেশের বৃষ্টিতে সেই প্রাণ মাতানো মেঘমল্লার শোনা যায় না। এ মেঘে মনের ময়ূর তো দূরের কথা বনের ময়ূরও নাচাবে না। আকাশও যেন এ দেশের বোবা—অন্তত এখন পর্যন্ত আমাদের দেশের মত সেই মেঘের অরণ্য থেকে কেশর-ফোলা সিংহের হুঙ্কার শুনলুম না।

জানালায় দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে নীচেয় রাস্তার বড় বড় লাল দোতলা বাসগুলো, রেলওয়ে লস্ট-প্রপারটির লাল বিজ্ঞাপনের খোলস পরা আধক্ষ্যাপাটে বুড়োগুলো, পুরনো ওভারকোট পরা শীতে কাঁপা যে কাগজওয়ালা বুড়োগুলো কাঁপাগলায় হাঁকছে 'পাইপার পাইপার', রঙীন রঙীন ওভারকোট, ওয়াটারপ্রুফ পরা, মাথায় রেশমী রুমাল বাঁধা মেম আর নানান রঙের চেস্টারফিল্ড কোট পরা সায়েবগুলো, পাথরে বাঁধানো রাস্তা, বড় বড় বাড়ী, হৈ হট্টগোল—মুহূর্তে সব ইন্দ্রজালের মতো অদৃশ্য হয়ে গিয়ে চোখের সামনে ভেসে উঠল মাঠের পর মাঠ দিগন্তে মিশে গিয়ে সবুজ ধানের ক্ষেতে বাদ্‌লা হাওয়ায় ঢেউ খেলছে। মাঝে মাঝে বাঁশবন, তাল-বনের সারি। তারি মাথায় ঘনঘোর কালো মেঘ ঘনিয়ে উঠে নীল

অঞ্জন বিছিয়ে দিয়েছে সবুজ ধানের ক্ষেতে। বাঁশবনের মাঝখান থেকে উঁকি দিচ্ছে ছোট্ট একখানি মাটির ঘর। উঠোনে ধানের মরাই, খড়ের গাদা। হঠাৎ সেখান থেকে ক্ষেতের মাঝখানে ছুটে এলো এক কালো গোরু আর তারি পিছনে পিছনে বেরিয়ে এলো এক কালো মেয়ে। তার মাথায় রুক্ষ এলোচুল, নবযৌবন-বিকশিত দেহে আঁটসাঁট করে জড়ানো লাল শাড়ী।

কিন্তু এ ছবিও ভোজবাজির মত মুহূর্তে মিলিয়ে গেল। চমকে উঠলুম। চেয়ে দেখি, সেই পাথরে বাঁধানো কঠিন রাস্তাগুলো দিয়ে ছুটে চলেছে বড় বড় লাল বাস। রেলওয়ে-লস্ট-প্রপার্টির লাল বিজ্ঞাপনের খোলসপরা বুড়োগুলো পাগলের মত ঘুরছে। বুড়ো কাগজওয়ালারা শীতে জড়সড় হয়ে মাঝে মাঝে কাঁপা গলায় হাঁকছে 'পাইপার' 'পাইপার।' ওভারকোট, ওয়াটারপ্রুফ পরা সায়েব-মেমগুলো হাতে নানানরকম বোঝা নিয়ে ঘোড়ার মত ছুটে চলেছে। আকাশ অন্ধ ঘোলা চোখ মেলে পাগ্‌লা শহরটার দিকে ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে আছে। আর কখনো কখনো তার ছানিপড়া চোখের কোল বেয়ে ফোঁটা ফোঁটা জল ঝরছে।

ঘরের মধ্যে চেয়ে দেখলুম শাবান আবার সেই চেয়ারটায় বসে গেছেন আর সুসানা হাতে তুলে নিয়েছে রংতুলি।

॥ তেইশ ॥

শেফার্ডস বুশ থেকে বেরোতে বেরোতে সাড়ে ন'টা বেজে গেল। আমায় এখন যেতে হবে বেকার ষ্ট্রীট। সেখান থেকে রাসেল স্কোয়ার। তার পর ব্যালহাম হাই রোড। আমি নতুন এসেছি। তাই কতকগুলো যোগাযোগ পাতিয়ে নেবার জন্যে আমায় এখন অনবরত লণ্ডন শহরে চর্কিনাচ নেচে বেড়াতে হচ্ছে।

তিন জায়গায় বুড়ী ছুঁয়ে নাইট্সব্রিজে ফিরে এসে গ্লসেস্টার রোড ধরে হন্ হন্ করে হেঁটে ক্রমওয়েল রোড পার হয়ে যেই ব্রম্পটন রোডে পা বাড়িয়েছি এমন সময় দেখা হয়ে গেল বুড়ো অবিনাশ বাবুর সঙ্গে। হাসিমুখে শুধোলেন, 'কোথায় চলেছেন ?'

'এই—একটা দোকানে, একটা জিনিষ কিনব।'

'তার পর ?'

'বাড়ী।'

'না বাড়ী নয়। আমার সঙ্গে যেতে হবে।'

'কোথায় ?'

'ট্রাফালগার স্কোয়ার।' তাঁর মুখে সেই অপূর্ব হাসি—যে হাসি বুলগেরিয়ার গোলাপি আতর হয়ে সেদিন আমার সর্বাঙ্গে সুগন্ধি হাত বুলিয়ে মধুর আরামে ভ'রে দিয়েছিল।

ঘড়ী দেখলুম সাড়ে দশটা। বললুম, 'আচ্ছা।' এঁকে এড়াবার উপায় নেই। বুড়োর মধ্যে অদ্ভুত একটা আকর্ষণ আছে। ওঁর সঙ্গে থাকতে ভারি ভালো লাগে।

ওভারকোটের পকেট থেকে একটা আপেল বার করে দিয়ে বললেন 'খান।'

আর এক পকেট থেকে আর একটা আপেল বার করে তিনিও কামড় দিলেন।

আমি শুধোলুম, 'ট্রাফালগার স্কোয়ারে কেন?'

স্নিগ্ধ হেসে বললেন, 'শুভ্রারাণীকে দেখতে। মেয়েটাকে আমার ভারি ভালো লেগে গেছে। যেন আমি আমার নিজের মেয়েকে খুঁজে পেয়েছি। সেইদিন থেকে সর্বক্ষণ আমার মনে শুধু ও'রই চিন্তা! সত্যি, মাঝে মাঝে আমার নিজেরই ভেবে অবাক লাগছে— এ আমার কী হ'ল! এ রকম তো আগে কখনো হয়নি! আমার সবকিছু যেন সেইদিন থেকে পাল্টে গিয়েছে। আগে বাঁচতে আর ভালো লাগত না, কিন্তু এখন মনে হচ্ছে আমাকে বাঁচতে হবে, শুভ্রার জন্যে আমাকে বাঁচতে হবে। আমার অনেক দায়িত্ব! বেঁচে যে এত আনন্দ আমি আগে তা জানতুম না! কয়েকটা কাজে জড়িয়ে গিয়ে সময় করতে পারিনি বলে এই দু'তিনদিন আদু'রে মেয়েটাকে দেখতে পাইনি—কিন্তু ভিতরে ভিতরে আমি ছটফট করে মরছি।'

অবাক হয়ে তাঁর মুখের দিকে চেয়ে দেখলুম তাঁর দুই চোখে পিতৃস্নেহ একেবারে উছলে উঠেছে। কথাগুলো তিনি যেন স্নেহের রসে একেবারে ভিজিয়ে ভিজিয়ে বললেন।

হাইড পার্ক কর্ণারে এসে তিনি বললেন, 'চলুন, একটা ট্যাক্সি ধরি। হেঁটে পৌছতে অনেক সময় লাগবে। মেয়েটাকে দেখবার জন্যে আমার আর তর সইছে না।'

সমস্ত যৌবন সবকিছু মাধুর্য থেকে নিজেকে বঞ্চিত করে সংসারের শুকনো রুক্ষ মরুভূমিতে একা একা কাটিয়ে তার পর জীবনের শেষে বুড়ো বয়েসে যখন একবার মানুষের ঘাড়ে প্রেম কিম্বা স্নেহের ভূত চাপে তখন এমনিই হয়! তখন আর মাথার ঠিক থাকে না!

চেয়ে দেখি মরগান, দি ভাইকিং তখন পাইপে টান দিতে দিতে খড়ি ঘষে ঘষে ফুটপাথের উপর ছবি আঁকছে।

ট্রাফালগার স্কোয়ারে পৌঁছে দেখতে পেলুম ঝর্ণার ধারে শুভ্রা আদর করে পায়রাগুলোকে খাওয়াচ্ছে। কতকগুলো পায়রা তার মাথায়, কাঁধে উড়ে এসে বসেছে। সে তাদের সঙ্গে কথা বলছে, দুষ্টুমি করছে, চুমু খাচ্ছে, হাসছে, খাওয়াচ্ছে।

আমার মনে হল সারা ট্রাফালগার স্কোয়ারটিকে সে আলো করে রেখেছে।

আমাদের দেখতে পেয়েই চুল দুলিয়ে, কোট উড়িয়ে দৌড়ে এলো।

বুড়ো অবিনাশবাবু তাকে জড়িয়ে ধরে তার আদুরে লাল মুখখানিকে চুমোয় চুমোয় আরো লাল করে তুললেন।

আমি বললুম, 'কই গো, হার ম্যাজেস্টি, দি কুইন, আজ তোমার ফুল কই?'

শুভ্রা বলল, 'দাদুর ফলের গাড়ীর কাছে রেখে এসেছি। রোজ সকালে এই পায়রাগুলোকে না আদর করলে আমার ফুল বিক্রীই হয় না। দিনটাই সেদিন আমার ভালো যায় না।'

তার কালো কালো দুষ্টু চোখদুটো যেন ঘুরছে। বলল, 'চল বুড়ো দাদু আর আঙ্কেল, দেখবে চল, আমার ফলওয়ালা দাদুর চেহারা কেমন পাল্টে গেছে দেখবে চল। দাদুকে একটা নতুন ট্রাউজার, একটা নতুন কোট, একটা নতুন টুপি আর একজোড়া নতুন জুতো কিনে দিয়েছি। এই দারুণ শীতে সেই ছেঁড়া কাপড়গুলো পরে থাকতে দাদুর বুঝি কষ্ট হ'ত না, তোমরাই বল?'

তার পর আমাদের উত্তর দেবার আগেই পায়রাগুলোকে উড়িয়ে দিয়ে তাদের দিকে চেয়ে হেসে উঠে বলল, 'আমি যদি পাখিটাখী হতুম তো বেশ হ'ত! কোনো ভাবনাচিন্তা, দুঃখুকষ্ট থাকত না, যখন ইচ্ছে যেখানে খুশী মনের আনন্দে উড়ে যেতে পারতুম!'

অবিনাশবাবু সস্নেহে তার মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে বললেন, 'তুমি পাখিটাখী হলে আমরা তোমাকে পেতুম কী করে? তা'হলে আমাদেব বুঝি কষ্ট হ'ত না?'

তার লাল গালে লজ্জাব একটুখানি আভা খেলা করেই মিলিয়ে গেল।

বলল, 'চল বুড়ো দাছু, দেবী হয়ে যাচ্ছে, দেখবে চল। আঙ্কেল চল।' আমাদের হাত ধরে সে যেন নাচতে নাচতে নিয়ে চলল।

নতুন টুপিতে, নতুন জুতোয, নতুন ট্রাউজাবে, নতুন কোটে তার ফলওযালা দাছুব চেহাবা দেখলুম সত্যিই পাল্টে গিয়েছে। ফুটপাথেব উপব বসে বসে বুড়ো ঝিমোচ্ছিলেন, আমাদেব গলাব আওয়াজ পেয়েই জেগে উঠলেন।

শুভ্রা আমাদেব দিকে চেয়ে তু' চোখ ছুটো নাচিয়ে বলল, 'কেমন, ঠিক বলেছিলুম কী না,—আমাব ফলওলা দাছুকে আব চেনাই যায় না?'

বুড়ো একটু লজ্জা পেয়ে আড়চোখে আমাদেব দিকে তাকালেন।

ফলেব গাড়ীখানাব পাশেই তাব ফুলেব সাজিখানা বাখা ছিল। শুভ্রা তাবই ভিতব থেকে তিনটে গোলাপফুল তুলে নিয়ে একটা আমাব কোটে, একটা অবিনাশবাবুব কোটে আব একটা তার ফলও'লা দাছুব কোটে পবিয়ে দিল।

সত্যিই—এই ছোট্ট মেয়েটি যেন তার লাল টকটকে তাজা হৃদয়খানাই আমাদেব বুকে ছুলিয়ে দেয।

শুভ্রা ফুল পরিয়ে দিয়ে বলল, 'জানো বুড়ো দাছু, আমি নিজে আজকাল আমার ফুল বিক্রীব সাথে সাথে আমাব ফলওযালা দাছুর ফলও বিক্রী করে দিই?'

অবিনাশবাবু বললেন, 'তাই না কী?'

সে বলল, 'হ্যাঁ। দাদুর একেক গাড়ী ফল আজকাল একেক দিনে বিক্রী হয়ে যায়,—তাই না দাদু?'

ফলওয়ালা বুড়ো সস্নেহে হেসে বললেন, 'হুঁ।'

শুভ্রা বলল, 'আমি আজকাল বেজওয়াটার-আন্টির বাড়ী ছেড়ে দিয়ে ফলওয়ালা দাদুর সঙ্গেই থাকি—তা জানো?'

আমি আর অবিনাশবাবু প্রায় এক সঙ্গেই বলে উঠলুম, 'কই, না তো!'

শুভ্রা বলল, 'হ্যাঁ—ছেড়ে দিয়েছি।'

আমি শুধোলুম, 'কেন?'

'বেজওয়াটার-আন্টির কাছে আমি কুড়ি পাউণ্ড জমা রেখেছিলুম। সেই টাকাটা সেদিন চেয়ে পেলুম না—তাই। বেমালুম উড়িয়ে দিল। বলল, আমি না কী জমা রাখিনি। এমনি করে ও'রা আমার কত টাকা যে মেরে নিয়েছে তার ঠিক নেই! আমার টাকার লোভেই ও'রা আমায় রেখেছিল।'

আমরা বললুম, 'বল কী!'

সে বলল, 'হ্যাঁ। কত কষ্টের টাকা আমার, আর এইভাবে ও'রা মেরে নিল! খৃস্‌মাসের সময় কাপড় জুতো কিনব বলে কতদিন ধরে জমিয়েছি ম।'

আমি একটু থতমত খেয়ে গিয়ে শুধোলুম, 'ও'রা মানে? তোমার বেজওয়াটার-আন্টির বাড়ীতে আর কে আছেন?'

'বেজওয়াটার-আন্টির হাজবেণ্ড আছেন। আর আমারই বয়সী দু'জন ছেলেমেয়ে আছে। আঙ্কেল একটা দোকানে চাকরী করেন।'

তার পর বলল, 'ওদের ওখানে থাকতে আমার ভালও লাগত না। পয়সা তো নিতই, তা ছাড়া আমার উপর ভয়ানক অত্যোচার করত।'

অবিনাশবাবু বললেন, 'অত্যেচার করত?' তাঁর দুই চোখ বেদনায় পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছে।

শুভ্রা তাড়াতাড়ি যেন কথা ঘুরিয়ে নেবার জন্যে বলল, 'তা ছাড়া ফলওলা দাদুর একটু যত্ন দরকার নয়? দাদু বুড়োমানুষ, আমি সাথে থাকলে একটু যত্ন হবে। এত বুড়োমানুষ কখনো একদম একা একা থাকতে পারে?'

ততক্ষণে তার ফুলের সাজি আর ফলের গাড়ীর চারিপাশে সায়েব মেমের মেলা জমতে শুরু করেছে।

শুভ্রা ফুল আর ফল বিক্রী করতে ভীষণ ব্যস্ত হয়ে পড়ল।

ফলওয়ালা বুড়ো আমাদের ফিসফিস করে বললেন, 'মেয়েটার মধ্যে কী যাদু আছে, দেখুন না! আমি সেই থেকে গাড়ী নিয়ে বসে আছি অথচ একটা লোকও এলো না। আর ও আসতেই লোকের একেবারে ভীড় লেগে গেল!'

শুভ্রা বুড়োকে একটু ধমক দিয়ে বলল, 'দাদু, তুমি হাত গুটিয়ে বসে থাকলে আমি একা হাতে ক'দিক সামলাতে পারি? দাও, আপেল আঙুরগুলো তুমি একটু ওজনটোজন করে দাও।'

বুড়ো লজ্জা পেয়ে ব্যস্ত হয়ে বললেন, 'হ্যাঁ, এই যে দিচ্ছি মা।'

আমরা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তাদের বিক্রী করা দেখতে লাগলুম।

শুভ্রার ফুলের সাজি শেষ হয়ে গেলে অবিনাশবাবু বললেন, 'আমায় এক পাউণ্ড আপেল আর এক পাউণ্ড আঙুর দাও তো শুভ্রারাণী।'

বুড়ো ফলওয়ালা ওজন করতে যাচ্ছিলেন, শুভ্রা বলল, 'তুমি দিও না। আমার বুড়ো দাদুকে আমি নিজের হাতে ওজন করে দোব।'

ফলগুলো নিয়ে তাকে আরো আদর করে তার পর তার হাতে দু'টো দু'পাউণ্ডের নোট গুঁজে দিয়ে অবিনাশবাবু আমার

হাত ধরে তাড়াতাড়ি চলে আসছিলেন। কয়েক পা এগিয়ে যেতেই শুনতে পেলুম শুভ্রা চিৎকার করে বলছে, 'বুড়ো দাদু, বুড়ো দাদু, একটু দাঁড়াও।'

দাঁড়াতেই হ'ল।

চুল উড়িয়ে এক দৌড়ে কাছে এসে বলল, 'তুমি ভুল করে দু'টো দু'পাউণ্ডের নোট দিয়েছ। এক পাউণ্ড আপেল চার শিলিং, আর এক পাউণ্ড আঙুর পাঁচ শিলিং।'

অবিনাশবাবু সকৌতুকে হেসে বললেন, 'তাই না কী! বেশ তা হোক—ওই দু'পাউণ্ডের নোট দু'খানাই তুমি রেখে দাও।'

শুভ্রা একটু অবাক হয়ে বলল, 'বা রে! তা কেন?'

অবিনাশবাবু বললেন, 'রাখো না।'

শুভ্রা বলল, 'তা হয় না দাদু। তোমার মোট ন'শিলিং দাম হয়, সে জায়গায় দু'পাউণ্ড দিতে যাবে কেন?'

অবিনাশবাবু তার গালদুটি ধরে আদর করে বললেন, 'দুষ্টু মেয়ে কোথাকার! দাদুর কাছ থেকে কিছু নিতে নেই বুঝি? ও টাকাটা আমি তোমাকে দিলুম। তুমি রেখে দাও।'

শুভ্রা অবাক হয়ে তাঁর মুখের দিকে চেয়ে বলল, 'তোমার বোধহয় অনেক টাকা, না দাদু?'

অবিনাশবাবু চুপ করে রইলেন।

শুভ্রা খুশীতে নাচতে নাচতে নোট দু'খানি হাতে করে তার ফলওয়ালা দাদুর কাছে ফিরে গেল।

॥ চব্বিশ ॥

সকালবেলায় ঘুম ভেঙেই মনে পড়ল কাল রুটি মাখনটাখন কিনে রাখতে ভুলে গিয়েছি, অথচ পেটে তখন আগুন জ্বলতে শুরু করেছে। বাড়ীতে কোনো খাবার নেই। এক কোনে ব্ল্যাক-ব্রেডের কতকগুলো স্লাইস পড়ে আছে বটে, কিন্তু তাঁরা শুকিয়ে শুকিয়ে এ্যাদ্দিনে সত্যিকার ব্ল্যাক হয়ে উঠেছেন!

আমার বাড়ীর সামনের রাস্তা চেশাম প্লেস ধরে লাউণ্ডস্ স্কোয়ারের দিকে এগিয়ে গেলে ডান দিকে সরু এক গলির ভিতরে এক বুড়োবুড়ীর ছোট্ট একটি রেস্তোঁরা আছে। অসম্ভব ভীড় হয় সেখানে।

টেকো বুড়োটি ভুঁড়িওয়ালা পালোয়ান গোছের। বুড়ীকে ঠিক বুড়ী বলা চলে না।

বুড়োবুড়ীর সামনে পাথরের লম্বা টেবিলের উপর থরে থরে সাজানো থাকে প্লেট, চায়ের কাপ, গরম চায়ের ক্যান আর গরম তাজা ছোট ছোট বান রুটি।

খদ্দেররা লম্বা লাইন দিয়ে একের পর এক টেবিল থেকে একটি করে প্লেট তুলে নিয়ে বুড়োব সামনে দাঁড়ালেই সে হাসি মুখে হেঁড়ে গলায় 'গুড মর্নিং স্তায়ার' বলে মস্ত এক ছুরী দিয়ে চোখের নিমেষে একটা বান রুটি ফ্যাঁশ করে চিরে তাতে একটু মাখন মাখিয়ে প্লেটে রেখে দেবে। তার পর আর এক হাতে চায়ের কাপ নিয়ে বুড়ীর সামনে ধরলেই সে তাতে সঙ্গে 'সঙ্গে ঢেলে দেবে গরম চা। ভিতর দিকে সাজানো আছে ছোট ছোট

টেবিল চেয়ার। এক হাতে রুটির প্লেট আর এক হাতে চায়ের কাপ নিয়ে ভিতরে গিয়ে সেই টেবিলে বসে খেতে হবে। বুড়ো ফ্যাঁশ ফ্যাঁশ করে রুটি চিরছেই—চিরছেই, আর বুড়ী অনবরত চা ঢালছেই।

আমরো আজ সেই দোকানে গিয়ে লাইন দেওয়া ছাড়া উপায় নেই।

তাড়াতাড়ি সাজগোজ করে বেরিয়ে পড়লুম।

বৃষ্টি, বৃষ্টি, আর বৃষ্টি! আবহাওয়ায় যেন রাতারাতি আরো বেশী কালো রং লেগে গিয়েছে। বেশ বুঝতে পারলুম দীপক আজকে দীপক শোনাবে না।

ভিজতে ভিজতে, ধারালো হাওয়ার সাঁই সাঁই চাবুক খেতে খেতে গিয়ে দেখলুম লম্বা লাইন বুড়োর দোকান থেকে রাস্তায় বেরিয়ে এসেছে। বৃষ্টি মাথায় করেই সবার পিছনে দাঁড়ালুম।

এমন সময় মনে হল কে যেন আমার কোট ধরে টানছে। পিছনে চেয়ে দেখি অবিনাশবাবু।

হাসিমুখে ফিশফিশ করে বললেন, 'আপনার কাছেই যাচ্ছিলুম। তার পর দূর থেকে আপাকে এইদিকে আসতে দেখে আপনার পিছনে এসে লাইন দিয়েছি।'

প্লেট আর চায়ের কাপ সামনে মেলে ধরে বুড়োবুড়ীর কাছ থেকে বান রুটি আর চা নিয়ে আমরা ভিতরে গিয়ে বসলুম।

অবিনাশবাবু বললেন, 'আমার মশাই, এই পাউডারের পাফের মত এতটুকুন একটি বান রুটি খেয়ে কিছু হয় না।'

আমি বললুম, 'আমারই কী হয়! কিন্তু লজ্জায় বেশী নিতে পারি না। একটার বেশী দু'টো রুটি খেলেই তো আশপাশের সাহেব মেমগুলো এমন হাঁ করে তাকাবে যেন আপনি কী ভয়ানক একটা অদ্ভুত কাণ্ড করে ফেলেছেন! যেন আপনি একটি আস্ত রাক্ষস

আর কী! নইলে প্রথম প্রথম এসে, জানতুম না বলে আমি একেবারে গ্রোগ্রাসে দু'তিনটে রুটিই খেয়ে ফেলতুম।'

অবিনাশবাবু মৃদু হেসে বললেন, 'দেখুক গে। আমি আর একটা রুটি নিয়ে আসছি।' প্লেটটি হাতে করে তিনি বুড়োর কাছে উঠে গেলেন।

রুটি নিয়ে ফিরে এসে বসতেই দোকানভর্তী একপাল ইংরেজ ছেলেমেয়ে আড়ে আড়ে আমাদের দিকে তাকাতে লাগল!

লজ্জায় লাল হয়ে দোকান থেকে বেরিয়ে শুধোলুম 'এত সকালে আমার কাছে যাচ্ছিলেন কেন?'

অবিনাশবাবু গম্ভীর হয়ে বললেন, 'কতকগুলো পরামর্শ আছে। তাই সকাল হতেই আপনার কাছে ছুটে এসেছি। আমার আর তর সইছে না।'

অবাক হয়ে বললুম, 'কী?'

তিনি তেমনি গম্ভীরভাবেই বললেন, 'চলুন, বাড়ীতে গিয়ে বলব।'

হীটারের পাশে একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসে ভিজে টুপিটা খুলতে খুলতে বললেন, 'আমি ভাবছি—'

'থেমে গেলেন কেন? কী ভাবছেন?'

লজ্জা পেয়ে বললেন, 'না, ভাবছি—'। ফের থেমে গেলেন।

আশ্চর্য হয়ে বললুম, 'কী?'

খানিক চুপ করে থেকে শেষে যেন মরিয়া হয়েই বলে ফেললেন, 'মেয়েটাকে আমি ভীষণ ভালোবেসে ফেলেছি। আমাকে আপনারা পাগলই ভাবুন আর যাই ভাবুন, আমার মনে হচ্ছে আমার হারিয়ে-যাওয়া নিজের মেয়েকে যেন বহুকাল পরে খুঁজে পেয়েছি। তাই ভাবছি—'

আবার থেমে গেলেন।

'কী?' আমি অবাক হয়ে পাগলা বুড়োর মুখের দিকে চেয়ে আছি।

ফের সঙ্কোচ কাটিয়ে যেন খানিকটা মরিয়া হয়েই বলে উঠলেন, 'দেখুন মশাই, আমি বুড়ো হয়ে গেছি, আমি ব্যাচিলর, আমার ছেলেমেয়ে নেই, তাই আপনাদের আমি জানিয়ে দিতে চাই, আপনারা আমায় পাগলই ভাবুন আর যাই ভাবুন, শুভ্রাকে আমি এত ভালোবেসে ফেলেছি যে, কাল সারারাত ধরে ভেবে ভেবে ওকে আমি পোষ্যকন্যা হিসাবে নোব বলে ঠিক করেছি।'

বললুম, 'এ্যাঁ!'

বললেন, 'হ্যাঁ। এইবার আমি লণ্ডনে একটা বাড়ী কিনব। অবশ্য আমার শুভ্রারাণীর জন্যেই কিনব। এ্যাদ্দিন মনে হ'ত কী হবে ও সব করে! তার পর পোষ্যকন্যা হিসাবে নিয়ে ওকে স্কুলে ভর্তি করে দোব। ওকে আর কিছুতেই ফুল বিক্রী করতে দোব না। ওর ফলওয়ালা দাদুকেও আমার ঘরে নিয়ে এসে রাখব। তার পর আমার টাকা পয়সা, বাড়ী সব কিছু শুভ্রার নামেই লিখে দিয়ে যাব।'

অবাক হয়ে তাঁর মুখের দিকে চেয়ে বললুম, 'রাতারাতি এত কিছু ভেবে ঠিক করে ফেলছেন!'

অবিনাশবাবু বললেন, 'হ্যাঁ। এ রকম একটা ব্যবস্থা করতে পারলে মরেও সুখ আছে। কাউকে কিছু দিয়ে যে এত আনন্দ তা আমি জানতুম না'।

মনে হল তিনি যেন স্বর্গসুখ অনুভব করেছেন!

তিনি বললেন, 'তাড়াতাড়ি সব ব্যবস্থা করে ফেলতে হবে। আপনি কী বলেন'?

আমি বললুর, 'এ ব্যাপারে আমার পক্ষে কিছু মত দেওয়া ঠিক নয়। এটা সম্পূর্ণভাবে আপনার ব্যাক্তিগত ব্যাপার। তা ছাড়া আপনি আমার চেয়ে অনেক বেশী অভিজ্ঞ, আমার চেয়ে অনেক বেশী জ্ঞানী।'

'আমার জায়গায় আপনি হলে কী করতেন? আমারই মতন আপনারো মাথা খারাপ হত না?'

'সে কথা বলা মুস্কিল। আমার বয়েস অনেক কম,—তা ছাড়া আপনার মত আমার অত টাকাপয়সাও নেই।'

'আচ্ছা, সত্যি করে বলুন তো পুতুলের মত মেয়েটাকে দেখে ভালোবেসে পাগল হতে হয় না?' স্নেহের আলোয় তাঁর গোলাপি মুখখানি একেবারে আলোকিত হয়ে উঠেছে।

আমি বললুম, 'তাতে তো কোন সন্দেহই নেই।'

বুড়ো অবিনাশবাবু বললেন, 'এরকম মেয়ে আমি আগে কখনও দেখিনি!'

তিনি কিছু ভুল বলেননি ঠিকই, কিন্তু বুড়োর মাথা একদম খারাপ হয়ে গিয়েছে। ব্যাচিলর থাকলে, ছেলেমেয়ে না থাকলে বুড়ো বয়সে মানুষের বোধহয় এমনিই হয়!

তার পর আরো নানান কথাবার্তার পর শুধোলেন, 'আপনার এখন কোন কাজ আছে?'

'একবার পুডিং লেনে যেতে হবে।'

অবিনাশবাবু হেসে বললেন, 'পুডিং লেন? সে অনেক দূর। মনে রাখবেন পুডিং লেনে পুডিং পাওয়া যায় না। ওই পুডিং লেনেরই এক রুটিওলার দোকানের তন্দুর থেকে হঠাৎ একদিন রবিবারে সেই ১৬৬৬ সালের ভয়ঙ্করী great fire of London শুরু হয়েছিল —যাতে সমস্ত শহর পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছিল।'

'তাই না কী?'

'হ্যাঁ। পুডিং লেনে পরে গেলে চলবে না?'

'চলবে'।

'তবে আমার সঙ্গে চলুন'।

'কোথায়'?

একটু লজ্জা পেয়ে বললেন, 'ট্রাফালগার স্কোয়ার। মেয়েটাকে কতক্ষণে দেখতে পাব সেই আশায় আমি একেবারে ছটফট করতে থাকি। রাতে ঘুমোতে পারি না।'

বাধা না দিয়ে বললুম, 'চলুন'।

রাস্তায় নেমে একটা ট্যাক্সি দাঁড় করিয়ে তাতে আরাম করে বসে অবিনাশবাবু বললেন, 'আমার মনে এখন অনেক স্বপ্ন। আজ হয়তো আমার এ সব আপনার কাছে পাগলামী বলে মনে হবে, কিন্তু যদি আমার মত ব্যাচিলর থাকেন, তাহলে যেদিন আমার মতন বুড়ো হবেন সেইদিন আমাকে বুঝবেন। আমি বাজি রেখে বলতে পারি আপনিও সেদিন আমারই মতন পাগলামী করবেন।'

আমি আর কী জবাব দোব, তাই চুপ করে রইলুম।

তিনি গর্ব, আনন্দ আর স্নেহের আলোয় ঝলমল করতে করতে বললেন, 'To be father of a blooming daughter—it's a luxury, indeed it's a great luxury !'

ট্রাফালগার স্কোয়ারে পৌঁছে ট্যাক্সি থেকেই দেখতে পেলুম শুভ্রা আর তার ফলওয়ালা দাদু ফুলের সাজি আর ফলের ছোট গাড়িটা নিয়ে এসে ওই ওদিকের রাস্তার ধারে ঠিক জায়গায় বসে আছেন।

ট্যাক্সি থেকে নামতেই আমাদেরকে দেখতে পেয়ে শুভ্রা খুশীতে দৌড়ে এসে কলমুখর পাখির মত কী সব একগাদা বলে আমাদের দু'জনের কোটে দুটো গোলা 'ফুল পরিয়ে দিয়ে তার পর আমাদের হাত ধরে টেনে নিয়ে চলল।

বুড়ো ফলওয়ালা বললেন, 'কাল আপনি আসেননি কেন ?'

শুভ্রাও বলল, 'হ্যাঁ—কাল তুমি আসনি কেন দাদু ? তোমার জরিমানা করা হবে।'

অবিনাশবাবু তার কপালে একটা চুমু খেয়ে বললেন, 'কাল আমায় একটা বিশেষ কাজে সকালবেলায় বার্মিংহাম যেতে হয়েছিল।'

বুড়ো ফলওয়ালা বললেন, 'তাই ভালো। আমরা ভাবছিলুম হঠাৎ কোন অসুখবিসুখ করল না কী! এমন তো হয় না কোনদিন!'

শুভ্রা তার সাজির ফুলগুলো গুছোতে গুছোতে বলল, 'সেই তো। তোমার ঠিকানাও জানিনা যে খোঁজ করব। চল না বুড়োদাদু, একদিন আমাকে তোমার বাড়ীতে নিয়ে যাবে?'

অবিনাশবাবু তাকে আদর করতে করতে বললেন, 'নিশ্চয়ই নিয়ে যাব। আমার বাড়ী তো তোমারই বাড়ী, মা।'

শুভ্রা খুশীতে নেচে উঠে মাথার দুষ্টু চুলে ঢেউ খেলিয়ে বলল, 'চল দাদু, আজ বিকেলেই যাব।'

অবিনাশবাবু বললেন, 'আচ্ছা।'

'আমি এইখানে থাকব, তুমি আমাকে এইখান থেকে নিয়ে যেও।'

অবিনাশবাবু বললেন, 'বেশ। আমাকেও একদিন তোমাদের বাড়ীতে নিয়ে চল না? বাড়ীটা চিনে রাখি?'

ওইটুকু একফোঁটা মেয়ে হলে কী হবে! যেমন কাঠবেড়ালীর মত দুষ্টু, পাখির মত আদুরে তেমনি বুদ্ধিমতী। তাই একগাদা লজ্জার রং মেখে তার সাজির গোলাপগুলোর মতই লাল টুকটুকে হয়ে বলল 'আমাদের বাড়ী তুমি যাবে! আমরা গরীব, আমাদের ঘর ভালো নয়, জিনিষপত্র কিছু নেই। গলিটাও নোংরা। তোমার সেখানে অসুবিধে হবে। আমরা যেমন তেমন করে থাকি। তোমার সেখানে গিয়ে কাজ নেই দাদু। মিছিমিছি আমরা লজ্জা পাব।'

তার ফলওয়ালা দাদুও মাথা নীচু করে বসে রইলেন। অবিনাশবাবু তার মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে বললেন, 'পাগলী মেয়ে কোথাকার! লজ্জা কিসের?'

'না দাদু, থাক—ও কথা বোলো না।'

অবিনাশবাবু বললেন, 'আচ্ছা, আচ্ছা, থাক '

শুভ্রা আমার দিকে চেয়ে বলল, 'আঙ্কেল, তোমার বাড়ীতে আমাকে একদিন নিয়ে যাবে ?'

আমি তার গালদুটো ধরে বললুম, 'যেদিন তুমি বলবে সেইদিনই নিয়ে যাব।'

শুভ্রার মুখখানা দুষ্টুমির আভায় ঝকঝক করে উঠল। একবার আমার দিকে একবার অবিনাশবাবুর দিকে তাকিয়ে বলল, 'আমি তোমাদের দু'জনের দুটো নতুন নাম ঠিক করেছি।'

আমরা একসঙ্গে বললুম, 'কী ?'

একগাদা দুষ্টুমি তার প্রাণ-চঞ্চল মুখেচোখে উপচে পড়ল। কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থেকে বলল, 'নাইটসব্রিজ-আঙ্কেল আর লাইমগ্রোভ দাদু !' সঙ্গে সঙ্গে মিষ্টি সুরে খিলখিল করে হাসতে হাসতে সারা ট্রাফালগার স্কোয়ারটিকে যেন আলো করে তুলল।

আমরাও তার সঙ্গে হাসতে লাগলুম।

আমি তাকে আদর করে বললুম 'দুষ্টু কোথাকার।'

অবিনাশবাবু বললেন, 'দাও দিদিমণি শুভ্রারাণী, তোমার এক গোছা এস্টার ফুল।'

শুভ্রা তার সাজি থেকে একগোছা এষ্টার ফুল তুলে দিল। তার পর বললেন, 'এইবার এক পাউণ্ড আপেল, এক পাউণ্ড পীচ আর এক পাউণ্ড আঙুর দাও।'

শুভ্রা তার ফলওয়ালা দাদুকে বলল, 'দাদু, ওজন ক'র দাও।'

ফলগুলো নিয়ে তিনি শুভ্রার হাতে এক পাউণ্ডের তিনখানা নোট গুঁজে দিলেন।

শুভ্রা বলল, 'এত টাকা দিচ্ছো ? ফলের বারো শিলিং আর ফুল এক শিলিং—মোট তের শিলিং হয়েছে।'

অবিনাশবাবু তার গাল ধরে একটু নেড়ে দিয়ে বললেন, 'সে আমি জানি। বাকী টাকাটা তোমার। তুমি চকোলেট কিনে

খেও। বিকেলে ঠিক চারটের সময় আমি এইখানে আসব, তুমি থেকো।'

তার ফুল কেনবার জন্যে সায়েব মেমদের ভীড় ততক্ষণে বেশ জমে উঠতে শুরু করেছে। এমন সময় সেই ভীড়ের ভিতর থেকে মাঝ বয়সী এক ভদ্রমহিলা বলে উঠলেন, 'ওমা, শুভ্রা, তুই এখানে ফুল বিক্রী করছিস! আমি ভেবেছিলুম তুই বোধহয় লণ্ডনে নেই। অন্য কোথাও চলে গেছিস।'

ভদ্রমহিলা যেন ফণা-তোলা কেউটে। মুখে বিষাক্ত হাসি। বিশ্রী একরকম পোড়া কালো রং। গোল মুখ। গোল গোল লাল চোখ। একেকজন লোক আছে তারা যতই স্নান করুক তবু বেশ পরিষ্কার ঝকঝক দেখায় না, কী রকম যেন নোংরামি তাদের গায়ে লেগেই থাকে। এই ভদ্রমহিলাও সেইরকম। দেখলে গা ঘিন ঘিন করে। মনে হয় যেন গা থেকে বিশ্রী গন্ধ বেরোবে। কুটিল মনটা সারা মুখে একেবারে মাখানো। চুল পাকতে শুরু করেছে, রূপেরও বালাই নেই, তবু সখ আছে। ঠোটে গালে রং। লাল শাড়ী। নীল ওভারকোট। হাতে রঙীন ব্যাগ। রঙীন ছাতা।

শুভ্রা চমকে উঠে বলল, 'আরে, আন্টি!'

অনুমান করলুম ইনিই শুভ্রার সেই বেজওয়াটার-আন্টি। যাঁর বাড়ীতে ও থাকত। যিনি ওই ছোট্ট পাখিটিকে তার সোনার ডিমগুলির লোভে পুষেছিলেন।

ভদ্রমহিলা নাকি নাকি সুরে ন্যাকামী করে লাল চোখ ঘুরিয়ে বললেন, 'লণ্ডনেই আছিস, আর একবার দেখা করতে নেই মাসীর সঙ্গে, এ্যাঁ? আমি তোকে কত ভালোবাসতুম বল দিকিনি, মা? তুই ঘর থেকে চলে এসেছিস, ঘরখানা যেন খাঁ খাঁ করে। তুই'ই আমার ঘরখানা আলো করে রেখেছিলি। আমি কী তোর নিজের মাসীর চেয়ে কিছু পর—হ্যাঁ রে পাগলী? তোর মা আমাকে নিজের বোনের মতই জানত। কোথায় থাকিস আজকাল?'

শুভ্রা তার ফলওয়ালা দাদুকে দেখিয়ে বলল, 'আমার এই দাদুর সঙ্গে থাকি।'

ভদ্রমহিলা বাঁকা চোখে একবার বুড়োর দিক চেয়ে কাঠহাসি হেসে বললেন, 'ও। তা বেশ—বেশ। উনি বুঝি তোর দাদু?'

শুভ্রা বলল, 'নিজের দাদু নন্—তুমি যেমন আমার পাতানো মাসী—'

'আমী তোর পাতানো মাসী—হ্যাঁরে পাগলী? এমন কথা তুই বলতে পারলি, মা!' বলতে বলতে তাঁর চোখ দুটি ছল্‌ছল্ করে উঠল।

শুভ্রা নিজের কথার খেই ধরেই বলল, 'ইনিও তেমনি আমার পাতানো দাদু।' তার পর ফলওয়ালা বুড়োকে বলল, 'দাদু, ইনিই আমার সেই বেজওয়াটার-আন্টি—যাঁর কথা তোমায় অনেক বলেছি।'

আমার অনুমান ভুল নয়।

বুড়ো ছোট্ট একটুখানি উত্তর দিলেন 'সে আমি আগেই বুঝেছি।'

আমাদের ইশারা দেখে শুভ্রা আমাদের সঙ্গে তার বেজওয়াটার-আন্টির পরিচয় করিয়ে দিল না।

বেজওয়াটার-আন্টি রুমালে চোখ মুছে পাররালো চোখে বুড়োর দিকে চেয়ে বললেন, 'আপনার বুঝি ফল বিক্রী করা হয়?'

বুড়ো গম্ভীর উত্তর দিলেন, 'হুঁ।'

বেজওয়াটার-আন্টি বললেন, 'তা বেশ, তা বেশ। বুঝলেন, শুভ্রা মা-মণিকে আমি বড্ড ভালোবাসি। পাগলীটা রাগ করে একদিন আমার বাড়ী থেকে চলে এলো। আর গেল না। সেই থেকে আমার বুকখানা একেবারে খাঁ খাঁ করে। আমি ভেবে ভেবে মরতুম পাগলীটা গেল কোথায়! আপনার কাছে আছে শুনে বড় নিশ্চিন্ত হলুম। যেখানেই থাক, ও ভালো থাকুক এই আমি চাই। তা, হ্যাঁরে পাগলী, তোর ফুলটুল আজকাল ভালো বিক্রী হচ্ছে তো?'

শুভ্রা বলল, 'হ্যাঁ।'

'বেশ—বেশ। কিছু জমাটমা করছিস তো?'

'হ্যাঁ।'

বেজওয়াটার-মাসীর গোল চোখ দুটোতে বিদ্যুৎ খেলে গেল। বললেন, 'তা এ ক'দিনে বোধহয় বেশ কিছু জমিয়েছিস বল ?'

'হুঁ।'

খুব ভালোমানুষ সেজে বললেন, 'টাকাকড়ি আজকাল কার কাছে রাখছিস ? তোর দাদুর কাছেই রাখছিস তো ?'

'হুঁ।'

'বেশ, বেশ, খুব ভালো কথা। যার কাছেই রাখিস, টাকাগুলো জমা থাকলেই হ'ল, তোর দরকারের সময় ঠিক মত পেলেই হ'ল ! আগে আমার কাছে রাখতিস, আমি কত নিশ্চিন্ত থাকতুম, যাক, আমার কাছে আছে, অনাথ মেয়েটার কষ্টের টাকা কেউ মারতে পারবে না। টাকা পয়সার ব্যাপারে কাউকে বিশ্বাস করতে নেই। তুই মা, বাপ মরা ছেলেমানুষ মা, এ সব তুই জানিস না। তা—তোর দাদু নিশ্চয়ই সে রকম লোক নন্ বলেই আমার বিশ্বাস ?'

শুভ্রা একটু রাগের স্বরেই বলল, 'দাদু দেব্‌তার মত !'

বেজওয়াটার মাসীর চোখ দুটো হেসে উঠল। বললেন, 'তা বেশ, তা বেশ। খুব ভালো কথা। আমি তোর মায়ের মত, তাই ভিতরের খবর সব জানতে চাইছি। মায়ের মন তো তোরা বুঝবি না ! তুই আমার নিজের মেয়ের চেয়ে কিছু কম নোস। যেখানেই তুই থাকিস ভালো লোকের কাছেই থাকিস, তোর টাকাপয়সা খুব জমুক এই আমি চাই। তবেই আমার শান্তি। ভগবান করুন মা, তোর যেন কারো কাছে কোনোরকম বিপদ না হয়। অনাথ মেয়ে তুই, তোর বিপদ হয়েছে শুনলে আমি মা হয়ে শান্তিতে থাকব কী করে ? তোর মা আমার হাতেই তোকে তুলে দিয়ে গিয়েছিল। কিন্তু কী করব বল্ মা ? আমার কপাল খারাপ তাই মার চেয়ে বেশী ভালোবেসেও তোকে ধরে রাখতে পারলুম না।' আবার তাঁর চোখদুটি ছলছল করে উঠল। তার পর

রুমালে চোখ মুছে তার সাজি থেকে মস্ত একগোছা গোলাপফুল টেনে তুলে নিয়ে বললেন, 'এই গোলাপের তোড়াটি নিয়ে যাচ্ছি মা, কাল-পরশু দাম দিয়ে যাব, আজ একগাদা জিনিষ কিনে সব পয়সা ফুরিয়ে ফেলেছি, কেবল বাস ভাড়াটি আছে।'

শুভ্রা লজ্জা পেয়ে বলল, 'আচ্ছা।'

'তুই ভালো লোকের সঙ্গে আছিস দেখে কত যে শান্তি পাচ্ছি মা, সে আর কী বলব! ভগবান করুন, তুই ভালো থাক, তোর ফুল খুব বিক্রী হোক, তোর অনেক টাকাপয়সা জমুক, সে টাকা তুই তোর পাতানো দাদুর কাছে জমা রাখ, তোর টাকা যেন কেউ না মেরে নেয় আমি শুধু এই চাই—'বলতে বলতে রুমালে চোখ মুছতে মুছতে তিনি চলে গেলেন।

অবিনাশবাবু বললেন, 'আমরাও এখন যাই মা, কাজ আছে, তুমি তাহলে বিকেলে ঠিক এইখানে থেকো?'

শুভ্রা বললে, 'আচ্ছা।'

অবিনাশবাবু আমায় বললেন, 'আপনিও বিকেলবেলায় আসুন না আমার ওখানে?'

বললুম, 'কথা দিতে পারছি না, চেষ্টা করব।'

শুভ্রা আমার হাতদুটি ধরে বলল, 'না যেতেই হবে। আমার কথা তোমার শোনা উচিত, আঙ্কেল! তুমিই নাম দিয়েছ হার ম্যাজেষ্টি, দি কুইন! রাণীর কথা সব্বাই শোনে।'

আমি হেসে উঠে বললুম, 'আচ্ছা গো হার ম্যাজেষ্টি, আচ্ছা—যাব।'

॥ পঁচিশ ॥

পিকাডিলের মোড়ে এসে অবিনাশবাবু বললেন, 'মেয়েটা আজ বাড়ীতে আসবে, চলুন ওর জন্যে কিছু কেক্‌টেক্‌ কিনে নেওয়া যাক।'

তাঁর কথার সুরে বেশ বোঝা গেল আনন্দে তিনি বড্ড বেশী উত্তেজিত হয়ে পড়েছেন।

'কিছু কেক্‌টেক্‌ কিনে নেওয়া যাক'—বলে তিনি এ দোকান সে দোকান ছুটোছুটি করে দোকান উজাড় করে কেক্‌, চকোলেট, বিস্কুট নানারকম ফল আর রেশম পশমের হরেক রকমের ফ্রক, কোট, পুলোভার ইত্যাদি কিনে সে সব ট্যাক্সিতে চাপিয়ে তার পর বললেন, 'কিছু পুতুল টুতুল কিনে নিলে হত না?'

আমি হেসে বললুম, 'ওর কী আর পুতুল খেলার বয়েস আছে!'

একটু লজ্জা পেয়ে বললেন, 'ঠিক বলেছেন। তাহলে আর কী কেনা যায়? হ্যা মনে পড়েছে, চলুন কতকগুলো ছবির বই কিনে নেওয়া যাক।'

ট্যাক্সিওয়ালাকে হুকুম করলেন ফয়েল্‌সের দোকানে নিয়ে যেতে। আমায় বললেন, 'কারো জন্যে খরচ করে যে এত সুখ আগে জানতুম না!' তিনি যেন উৎসাহে, উল্লাসে, নাচছেন।

ছবির বই কিনে তাঁর কাছ থেকে যখন ছুটি পেলুম তখন আবহাওয়ার রং আরো কালো হয়ে ছুরীর চেয়েও ধারালো, বরফের চেয়েও ঠাণ্ডা হাওয়া শিস্‌ দিয়ে দিয়ে ছুটে চলেছে। আকাশে ধোঁয়াটে মেঘ। কিন্তু বৃষ্টি নেই।

সে হাওয়ায় দেওয়ালে আঁকড়ে-ধরা মরা আঙুরের লতা থরথরিয়ে কেঁপে উঠল। চেরীর শেষ পাতা ঝরে পড়ল। আপেলের পাতা ঝরা নগ্ন ডালে ডালে কতকগুলো সবুজের ছিটেফোঁটা ছিল, তাও মুছে গেল। পিয়ার শিউরে উঠে মাটিতে গালচে পেতে দিল। প্লাম, বেরি আর পীচের গা থেকে রঙীন ওড়নাগুলো উড়ে গেল। এ্যাপ্রিকটের শাখায় শাখায় লাগল কাঁপন, জাগল কাঁদন। পপলার আর ওকের চামড়া ফেটে চৌচির। ফুলগাছগুলো এতদিন সব মাথায় নানান রঙের মুকুট পরে ও ওকে আড়াআড়ি করে কত ভঙ্গীতে দোল খাচ্ছিল। তাদেরও সব মুকুট খসে গিয়ে দেখতে দেখতে মাথা লুটিয়ে পড়ল মাটিতে। কিট্‌সের নাইটিঙ্গেল, শেলীর স্কাইলার্ক, ওয়ার্ডসওয়ার্থের কাক্—নিখোঁজ সব নিরুদ্দেশ। হাইড-পার্কের সাদাকালো খরগোশ-গুলো আর সেণ্ট জেমসেস্ পার্কের রং বেরঙের পাখিগুলো কে কোথায় লুকিয়ে লুকিয়ে প্রহর গুনছে ঠিকানা নেই। শুধু ট্রাফালগার স্কোয়ারের লোভী পায়রাগুলোর নীল পাখা হিম হল না।

সে হাওয়া চাপড় মেরে মেরে লাল লাল সায়েব-মেম গুলোর মুখ আরও লাল করে দিল। তার ধারালো ছোবল থেকে বাঁচবার দায়ে সায়েবমেমরা সব দেখতে দেখতে টুপিতে, পশমে দস্তানায় আরো ফুলে উঠল, আরো রঙীন হয়ে উঠল

বাইরে বেরোবার কথা ভাবলে মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ে। দাঁতের কপাল, হাড়ে হাড়ে ঠোকাঠুকি থামতেই চায় না। মুখের চামড়া আরো গভীর ভাবে কুঁচকে কুঁচকে ঝুলে পড়ে বুড়ো-বুড়ীরা সব দেখতে দেখতে বড্ড বেশী বুড়িয়ে গেল—বসলে আর উঠতে পারে না। ঠাণ্ডায় অবশ পা দুটোকে কোন রকমে জোর করে টেনে টেনে কোমর ভেঙে ঝুঁকে পড়ে টলমল করতে করতে পথ চলতে চলতে বিড়বিড় করে অনবরত যেন এ হাওয়াকে অভিশম্পাত করছে আর মরণের হাতেপায়ে ধরে কাকুতি মিনতি করছে।

দুপুর থেকে হঠাৎ হাওয়া থেমে গিয়ে শুরু হল শিলাবৃষ্টি। সঙ্গে সঙ্গে আরো হাজার গুণ ঠাণ্ডায় রক্ত শুদ্ধ জমে যাবার উপক্রম। যেন সারা গায়ে বরফের চাদর জড়িয়ে গেছে।

তখন লক্ষ টাকার লোভ দেখিয়েও ফায়ারপ্লেসের ধার থেকে টেনে তোলে কে! ব্যাবিলনের নেবুচ্যাডনেজার, মিশরের ফেরাউন, শেবার রাণীর ধনরত্নও তখন ঘরের কোনের ওই একটুখানি আগুনের কাছে তুচ্ছ।

একটু পরেই শিলাবৃষ্টি থেমে গেল। কিন্তু ঠাণ্ডা বেড়ে গেল আরো সহস্র গুণ।

শুনি দরজায় ঠক্‌ঠক্।

দরজা খুলে দেখি বড়দা!

তাঁর গায়ে রাশিয়ান ওভারকোট। কাঠের লম্বা লম্বা বোতাম দিয়ে বুকটা আটকানো। ঘোমটাটা ঘাড় থেকে মাথায় তুলে দেওয়া। কালো গ্লাভস্ পরা হাতে সেই ক্যামেরা আর এক কোলে ঘন লোমশ একটা কালো বেড়ালের ছানা।

অবাক হয়ে বললুম, 'একি, আপনি ব্রাসেল্‌স যাননি?'

বললেন, 'আরে, আমি তো সব ঠিক করেই রেখেছিলুম, যত ফ্যাসাদে ফেলল এই বেড়ালছানাটা। ব্যাটা কোথা থেকে যে মাঝ রাতে উড়ে এসে জোর করে ঘাড়ে চেপে জুড়ে বসল কে জানে! এক মিনিটের তরে আর ঘাড় থেকে যদি নামছে। এ'কে কার কাছে রেখে যাই বল? যত ঝঞ্ঝাট এড়িয়ে চলতে চাই তত আমারই ঘাড়ে যত ঝঞ্ঝাট এসে চাপে! ব্যাটা বাথরুমে পর্যন্ত ল্যাজে ল্যাজে যাবে। কা বিপদেই যে পড়েছি! তুমিই বল না, নিজে থেকে এলো যখন কাছে—ফেলি কী করে? এখন আমাকেই বয়ে বেড়াতে হবে। নিরীহ জীব।'

তার পর ফায়ারপ্লেসের ধারে একটা চেয়ার টেনে আরাম করে বসে বললেন, 'তোমার কাছে এলুম।'

হাসতে গিয়েও বহু কষ্টে হাসি চেপে বললুম, 'তা তো দেখতেই পাচ্ছি। কিন্তু এই দুর্যোগের মাঝে হঠাৎ কী মনে করে বলুন তো?'

একটু রহস্যচ্ছলে বললেন, 'বলছি, বলছি—সব বলব। আসার গভীর কারণ ঘটেছে তাই দুর্যোগ মাথায় করেও বেরোতে হয়েছে। প্রয়োজনের কাছে কা আর দুর্যোগটুর্যোগ আছে?' কথার ধরণ শুনে আমি ভয় পেয়ে গেলুম।

বড়দা পকেট থেকে বার করে পাইপটি মুখে দিয়ে তামাকের ব্যাগটি খুলেই খানিকক্ষণ থ হয়ে বসে থেকে বলে উঠলেন, 'ওঃ, এই রাস্কেল সেনটা আমাকে ফতুর করে ছাড়বে দেখছি! সব তামাক সরিয়ে ফেলেছে! আর যদি ও'কে আমার ঘরে ঢুকতে দিই তো আমার নাম বড়দা নয়।'

শুধোলুম, 'ঘড়ি ফেরত পেয়েছেন?'

বড়দা বললেন, 'না। আরে সেইজন্যেই তো আমার ব্রাসেল্‌স যাওয়া যাচ্ছে না। ঘড়ি না পেলে ট্রেন ধরি কী করে? ঘড়ি তো দেয়ইনি, উপরন্তু আরো পাঁচ পাউণ্ড ঘাড় মুড়িয়েছে।'

'আপনি দেন কেন?'

'ছেলেটা দোষে-গুণে মানুষ—বুঝলে না? চাইলে না বলি কী করে? বিশেষ করে এই বিদেশে। অবশ্যি বলেছে ড্রাফট্‌ এলেই দিয়ে দেবে।'

'সে ড্রাফট্‌ কী ওর সত্যিসত্যিই আসবে কোনদিন?'

'আসবে, আসবে। না এলে ও বাঁচবে কী করে? একটা বিচার নেই? তুমিই বল না, সুবিচার বলে একটা জিনিষ কী নেই? আর না এলে দোষে-গুণের মানুষকে আমাকেই দিতে হবে। সবাই মিলে বড়দা করলে কি না। এখন আমার ঘাড়েই তো সকলের সব দায়িত্ব পড়েছে। তুমিই বল না, বড়দা হওয়া তো আর মুখের কথা নয়?'

তার পর পাইপটি পকেটে পুরে বললেন, 'ওই যা, তোমাকে

বলতে ভুলেই গেছি কেন এসেছি! তোমার ছোট সুটকেসটা কয়েকদিনের জন্যে দিতে পারো?'

এই কারন!

বললুম, 'কেন বলুন তো?'

'আজ বিকেলের চারটের গাড়ীতেই আমি ব্রাসেল্স যাচ্ছি কি না। আমার আবার ছোট সুটকেস নেই, সব বড় বড় ট্রাঙ্ক। আরে ওই ছোট সুটকেস কোথাও যোগাড় করতে পারলুম না বলেই তো এ্যাদ্দিন যাওয়া হলো না। নইলে এ্যাদ্দিন তো আমি ব্রাসেল্স গিয়ে ফিরে আসতুম। এই দেখ টিকিট শুদ্ধ করে ফেলেছি।'

টিকিট দেখে একটু ভরসা হলো! বললুম, 'সুটকেস আমি দিচ্ছি, কিন্তু ওই বেড়ালটা? ওকে কোথায় রেখে যাবেন?'

'কার কাছে আর রেখে যাব? ও ব্যাটা কারো কাছে কী আর থাকবে! সঙ্গেই নিয়ে যেতে হবে।'

আমি সুটকেস খালি করে দিলুম। সুটকেস পেয়েই বললেন 'এখন তবে ব্রাসেল্স যাই, ফিরে আবার দেখা হবে।'

বহু কষ্টে হাসি চেপে বললুম, 'আর একটু বসুন, এই তো মোটে এলেন।'

অবাক হয়ে আমার দিকে খানিকক্ষণ চেয়ে থেকে বললেন, 'তুমি তো আচ্ছা লোক! তোমার একটা আক্কেল বলে জিনিষ নেই! শুনছ একটা লোক আজ চারটের গাড়ীতে ব্রাসেল্স যাচ্ছে আর তুমি কি না তাকে ধরে রাখতে চাইছ! তাকে এখন বাড়ী গিয়ে গোছগাছ করতে হবে না?'

বড়দা চলে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে যে মূর্তি ঘরের মধ্যে প্রবেশ করেই কিচ্ছু না বলে সোজা ফায়ারপ্লেসের ধারে হুমড়ি খেয়ে পড়ল সে আর কেউ নয়, ফৈজাবাদী ভায়া।

গায়ে এক পাঁচমণি ওভারকোট, গলায় ইয়া-বাহারি কম্ফর্টার—

বোধহয় বিবির বোনা। মাথায় সবুজ ফেল্টের টুপি। দুই হাতে বাদামি উলের দস্তানা। এও বোধহয় বিবির বুনে দেওয়া।

গোলমাল করে বলে উঠলুম, 'আরে ফৈজাবাদী ভাইয়া, এ সময় কী মনে করকে? বিবিকা খত্‌ উৎ মিলা?'

সে সব কথার কোনো জবাব না দিয়ে বলল, 'ইমাম সাব, হম পহেলে জানূনেসে ই সালে লোগকো মুলুকপে নেই আতা. খালি বারিস, খালি বারিস—ইস্‌কা উপ্পর ফের এত্‌না ঠাণ্ডা, বাপরে বাপ! হাড্ডি য্যায়সা মালুম হোতা কী চুর চুর হো গিয়া। আওর নাকসে সালা হর বখ্‌ত্‌ সর্দি কি ফোয়ারা ঝর্‌ রহা; সালেকো টিসু পেপার মোলতে মোলতে ফকির হো গ্যায়া। আওর উ সালা টিপ্‌স্‌ কো জো রেওয়াজ হ্যায় এ মুলুকপে, আদমীকা উপর ইয়ে এক জুলুম হ্যায়—সালা ট্যাক্সিপে চঢ়, মোটিয়া কর, হোটেলপে যাও—যাঁহা ভি যাও, যো কুছ ভি কর, সালা নিকালো টিপ্‌স্‌। টিপ্‌স দেতে দেতে হাম তো একদম জলিল হো গ্যায়া। ঘরপে মেরা বিবি পাকাতি থি, আওর ইঁহা দেখিয়ে আপনা হাঁথসে পাকানে হোতা—সালা এ্যায়সি করকে মালুম হোতা ইমাম সাব, কী, হম নেই বাচেগা। দোকানপে যাও, বাসপে চঢ়—সালা যাঁহাভি যাও, ই সালে লোগ খালি ভারি ভারি কোইন দেতা হ্যায়—ও কোইন রাখতে রাখতে মেরা কোটপাতলুনকা জেব সব ফুট গ্যায়া। বিবিকো টিলিগিরাফ ভেজ দিয়া কী, তুম যেত্‌না জল্‌দি স্কাকো পাস্‌পুট বানাকে উঢ়কে মেরা পাস চল আও। আগার উও আয়েগি তো বাচেগা, নেই তো হাম নেই বাচেগা ইমাম সাব। দিলপে দিনরাত আগ লে কে কোই বাচ স্কাকতা—আপই বাতাইয়ে? উস্‌কি উপ্পর ফের রাতপে নিন্‌ভি নেই হোতা।'

মনে মনে বললুম, তা তো হলো, কিন্তু ইরাক থেকে সাপের ওষুধ আনতে আনতেই যে, যাকে সাপে কামড়েছে তার দফা রফা হয়ে যাবে!

একটু চুপ করে থেকে বলল, 'আপকো পাস এক এ্যাডভাইস লেনে আয়া ইমাম সাব।'

'ফের লণ্ডনমে কেয়া হুয়া যে, ফের এ্যাডভাইসকা দরকার হুয়া?'

'লণ্ডনপে নেই। আপকো ইয়াদ হ্যায় না, জাহাজপে বাতায়া থা, লণ্ডনপে পৌঁছকেই উ সালা নাউয়া আওর জাহাজ কাঁপনিকো নাম পে এক কেস করেগা?'

'হ্যাঁ তো—হ্যায় তো?'

'তো ওই এ্যাডভাইস লেনে আয়া কী, কোর্টপে সচ্ এক কেস চালু করেগা-য়া?'

গোঁয়ার্তুমি আছে দেখি! এখনো সে কথা ভোলেনি!

বললুম, 'আচ্ছা, সোঁচকে বোলেগা।'

'উ সালা নাউয়াকো হাম কভ্‌ভি নেহি ছোড়েগা। সালা হামকো রেড আঁখে দেখায়া। আচ্ছা ইমাম সাব, আভি তব্ চলেঁ—আপ সোঁচিয়ে। ভুলিয়ে মাত্। হিঁই সে পাস করতা থা—স্লোন স্ট্রীটপে জারা কাম থা, ওই লিয়ে সোঁচা কী, ইমাম সাবসে জারা এ্যাডভাইস লে লেঁ।'

বললুম, 'খুব ভালো কিয়া। জারা ঠৈরিয়ে। হামভি বাহার যায়গা। হামারা কুছ্ মালপত্র গোল্ডহক রোডমে এক বন্ধুকা ঘরমে রয়ে গিয়া, উস্‌কো আভি লে আয়গা।'

গোল্ডহক রোড থেকে মালপত্র নিয়ে বাস থেকে নাইস্‌ব্রিজে নেমে বইঠাসা ভারি বোঝা একটা বড় চামড়ার ব্যাগ কোনোরকমে বগলদাবা করে আর দুই হাতে প্রকাণ্ড দুই সুটকেস ঝুলিয়ে স্লোন স্ট্রীট ধরে কোনো-রকমে টলমল করতে করতে হিমসিম খেতে খেতে ঘরের দিকে এগিয়ে

চলেছি, এমন সময় কানে এলো পেছন কে বলছে 'কতদূর যাবেন ?' চেয়ে দেখি মাঝ বয়সী বিরাট এক অচেনা ইংরেজ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মুচকি মুচকি হাসছেন।

থতমত খেয়ে গিয়ে বললুম, 'এই একটু দূরেই আমার বাড়ী।'

মস্ত থাবা বাড়িয়ে বললেন, 'একটা স্যুটকেস আমায় দিন, আমি পৌঁছে দিচ্ছি।' একরকম জোর করেই আমার হাত থেকে একটা স্যুটকেস কেড়ে নিলেন।

আমি হাঁ করে তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে আছি।

তিনি বললেন, 'চলুন।'

ব্যাপারটা যেন তখনো আমার ঠিক মত বিশ্বাস হচ্ছে না। এক হাতে স্যুটকেস আর বগলের ভারি ব্যাগটা আর এক হাতে ঝুলিয়ে তাঁর সঙ্গে হতভম্বের মত চলতে লাগলুম।

মনে পড়ল প্রথম দিন রাস্তা হারিয়ে ফেলে এক্ বুড়ী মেমসাহেবকে শুধিয়েছিলুম, 'ফিট্‌জ্‌রয় স্ট্রীট কী এই মুখে ?'

'ও ডিয়ার ডিয়ার নো, তুমি যেদিকে দেখাচ্ছো, ফিট্‌জ্‌রয় স্ট্রীট একেবারে তার উল্টো মুখে—সে এখান থেকে অনেক দূর'—বলে তিনি আমাকে কী ভাবে যেতে হবে তা নানান রকমভাবে বোঝাতে চেষ্টা করলেন। কিন্তু তখন আমি লণ্ডনের রাস্তার গোলোক-ধাঁধার কিছুই চিনি না, তাই কোনোমতেই বুঝতে পারলুম না বলে শেষে তিনি বললেন, 'চল, আমি সঙ্গে করে তোমাকে নিয়ে গিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছি।' অথচ তিনি নিজের কাজে একেবারে উল্টো দিকে চলেছিলেন। বেশ মনে আছে তিনি বুড়ীমানুষ, তবুও তাঁর সঙ্গে আমি হেঁটে পারছিলুম না। তাঁর সঙ্গে তাল রাখার জন্যে মাঝে মাঝে আমায় দৌড়তে হয়েছিল।

মালপত্র ঘরে তুলে ঘড়ীর দিকে চেয়ে দেখলুম লাইম-গ্রোভে অবিনাশবাবুর বাড়ীতে যাবার সময় প্রায় হয়ে এসেছে।

একটু গা গরম করে নেবার জন্যে খানিক দূর হেঁটে গিয়ে কিংস্-গেট পার হয়ে কুইন্স গেটের কাছে বাস ষ্ট্যাণ্ডে বাসের আশায় কয়েকজন সায়েব মেমের পিছনে লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে আছি, এমন সময় সেই আবছা সন্ধ্যার আলোয় অবাক হয়ে দেখতে পেলুম বড়দা আর একজন মেম ঢুকছেন কেনসিংটন গার্ডেন্স-এর ভিতর! তাঁর গলায় ক্যামেরা আর এক কোলে সেই কালো বেড়ালের ছানা!

ব্রাসেল্স যাননি!

বাসে উঠেই বসে পড়েছিলুম। আড়চোখে চেয়ে একজন মেমকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে তাড়াতাড়ি জায়গা ছেড়ে দিলুম। মেম সায়েব বিস্তর ধন্যবাদ জানিয়ে বসলেন। কনডাকটর টিকিট দিতে দিতে বলল, 'আপনি স্তার উপরে চলে যান। উপরে অনেক সিট খালি আছে।'

উপরে গিয়েই চমকে উঠলুম। কে ওই কোণে বসে? চক্রবর্তী না? হ্যাঁ তাই তো।

তার পাশে গিয়ে বসলুম। হঠাৎ এ ভাবে আমার সামনে পড়ে গিয়ে তার মুখের যে অবস্থা হলো তার বর্ণনা আমি দিতে পারব না। কিন্তু সে শুধু মুহূর্তের জন্যে মাত্র! পর মুহূর্তেই অদ্ভুত উপায়ে নিজেকে সামলে নিয়ে বলল, 'আই এ্যাম সো সরি ভাই,—তোমার টাকাটা ব্যাঙ্ক থেকে কথা মত ঠিক সোমবারেই তুলে রেখেছিলুম, কিন্তু এত বিজি যে কিছুতেই একটু সময় করে তোমাকে দিয়ে আসতে পারিনি। কাল সকালেই আমি তোমাকে দিয়ে আসব। তুমি বাড়ীতে থাকবে তো?'

মনে মনে হেসে বললুম, 'থাকব! কিন্তু তোমার সময় হবে কী?'

লজ্জা পেয়ে কালো মুখ বেগনী করে বলল 'ও—ডেফিনিটলি। কাল পার্টনারশিপের ব্যাপারেও একটা ফাইনাল ডিসকাশন হয়ে

যাবে। আমি অনেক কিছু ভেবে রেখেছি। কাল সব তোমাকে বলব। আমি থাকতে তোমার কোনো ভাবনা নেই। আমার বিজনেস তোমারই বিজনেস। আমার টাকা তোমারই টাকা। ক্যাপিটাল ফ্যাপিটাল তোমায় কিচ্ছু দিতে হবে না, আমি শুধু চাই অনেস্টি। আমি এইখানে নামব।'

'তাই না কী? আমিও এইখানেই নামব। চল।'

দোতলা থেকে নীচেয় নেমে এসে আমরা বাস থেকে নামতে যাচ্ছি, ঠিক সেই সময় কণ্ডাক্টর এসে চোখ রাঙিয়ে আঙুল তুলে শাসিয়ে চক্রবর্তীকে বলল, 'আজ তোমাকে ছেড়ে দিলুম, কিন্তু ফের যদি তুমি কোনোদিন এ রকম কর আমি পুলিশে তোমাকে ধরিয়ে দোব।'

বাস শুদ্ধ আমরা সবাই হকচকিয়ে গিয়েছি। এ সবের মানে!

চক্রবর্তী ততক্ষণে লাফ দিয়ে বাস থেকে নেমে ছুটতে ছুটতে চোখের নিমেষে রাস্তার বাঁকে অদৃশ্য হয়ে গিয়েছে!

আমি থ হয়ে বাসেই দাঁড়িয়ে আছি!

একজন কণ্ডাকটরকে শুধোলো, 'কী হয়েছে?'

কণ্ডাকটর বলল, 'লোকটা টিকিট ফাঁকি দিয়ে পালালো।'

আমি বললুম 'তবে যে ওর হাতে একটা টিকিট ছিল?'

কণ্ডাকটর একটু হেসে বলল, 'দোতলার উপরে মেঝেয় বিস্তর পুরনো টিকিট পড়ে থাকে। ও তারই একটা কুড়িয়ে নিয়ে গম্ভীর হয়ে বসে ছিল। ভেবেছিল আমি বুঝতে পারব না! আমি দু'তিনবার ওর পাশ থেকে ঘুরে এসেছি, কিন্তু প্রত্যেকবারই ওই পুরনো টিকিটটা হাতে নিয়ে এমন ভান করে বসে রইল যেন টিকিট হয়ে গেছে, আমিই ভুলে গেছি! আমি ওর উপর লক্ষ্য রেখেছিলুম দেখি শেষ পর্যন্ত কী করে!'

মানুষকে এরা ভীষণ করে, এ দেশের কণ্ডাকটর কখনও কারো কাছে

টিকিট চায় না, নিজে থেকেই সবাই দিয়ে দেয়—সেই সুযোগ নিয়ে চক্রবর্তী এ রকম কাণ্ড করেছে!

নিজের মুখ নিজে দেখতে পাচ্ছিলুম না, কিন্তু মনে হল আমার মুখ ততক্ষণে কালির চেয়েও কালো হয়ে উঠেছে। চক্রবর্তী আমাদের সবার মুখে কালি মাখিয়েছে। দেশের মুখ কালো করেছে। বাস-শুদ্ধ সকলের দৃষ্টি আর চাপা হাসি যেন আমার সর্বাঙ্গে ভীমরুলের মত কামড়াতে লাগল।

সে কামড় থেকে বাঁচবার দায়ে এক লাফে নেমে পড়লুম।

এক কোনে ফায়ার-প্লেসের ধারে শুভ্রা ঠিক ছোট্ট ফেয়ারি-কুইনের মত ঘরখানি আলো করে বসে অবিনাশবাবুর সঙ্গে যা খুশী তাই গল্প করছিল, আমাকে দরজার কাছে দেখতে পেয়েই 'আঙ্কেল' বলে চীৎকার করে দৌড়ে এসে কোলের কাছে ঝাঁপিয়ে পড়ে আমার গালে চুমু খেয়ে নিজের গালটাও বাড়িয়ে দিল।

আমি চুমু খেয়ে বললুম, 'কেমন—রাণীর কথা শুনেছি তো?'

সে মিষ্টি সুরে খিলখিল করে হাসতে হাসতে ফের ফায়ার-প্লেসের ধারে গিয়ে নিজের চেয়ারটায় বসল। আমিও অবিনাশবাবুর পাশেই একটা চেয়ারে টেনে নিয়ে বসলুম।

অনেক রকম দুষ্টুমীর পর শুভ্রা আব্দারের সুরে বলল, 'চল দাদু, ঘরে ভালো লাগছে না, ট্যাক্সি করে একটু বেড়াই। অনেকদিন ট্যাক্সি করে ঘুরিনি।'

অবিনাশবাবু বললেন, 'বেশ, তুমি যা বলবে তাই হবে।'

শুভ্রা খুশীতে হাততালি দিয়ে বলল, 'কী মজা, না আঙ্কেল? ট্যাক্সি

চাপতে আমার ভারি ভালো লাগে। আমার যদি নিজের একটা গাড়ী থাকত!' একটা নিঃশ্বাস ফেলল।

অবিনাশবাবু তার মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে বললেন, 'তোমার সব হবে—গাড়ী, বাড়ী সব হবে। তোমার কিচ্ছু অভাব থাকবে না।'

শুভ্রা বলল, 'কী করে হবে? ফুল বিক্রী করে আর ক'পয়সাই বা হয়! জানো দাদু, আমার অনেক কিছু সখ আছে, কিন্তু পয়সা নেই বলে মনে মনে সব চেপে রাখতে হয়। আমার বয়েসের ছেলে-মেয়েরা সব স্কুলে লেখাপড়া করে, আর আমায় সে জায়গায় রাস্তায় রাস্তায় ফুল বিক্রী করতে হয়! আমার মা, বাবা থাকলে এ রকম হত না।' তার চোখদুটি অশ্রুতে টলমল করে উঠল।

অবিনাশবাবু তার চোখদুটি মুছিয়ে দিতে দিতে বললেন, 'তোমার লেখাপড়া করতে ইচ্ছে করে?'

'করে না?'

'তুমি লেখাপড়া করবে?'

'কী করে করব?'

তিনি তাকে কোলের কাছে টেনে নিয়ে বললেন, 'আমি তোমাকে টাকা দোব।'

সে অবাক হয়ে তাঁর মুখের দিকে চেয়ে থেকে বলল, 'সত্যি!'

'হ্যাঁ গো শুভ্রারাণী, হ্যাঁ। আমি তোমাকে আমার যা কিছু আছে সব দোব। তুমি থাকবে আমার সাথে?'

একরাশ বিস্ময় তার বড় বড় চোখদুটি থেকে উপচে পড়ল। 'আমাকে তুমি তোমার যা কিছু আছে সব দেবে!'

'হ্যাঁ'

'তাহলে আমাকে আর ফুল বিক্রী করতে হবে না?'

'না।'

একগাদা খুশীর আলো তার চোখেমুখে পড়েই মিলিয়ে গেল।

তার শিশু মন থেকে দ্বিধা কিছুতেই কাটছে না। বলল, 'আমি তো তোমার কেউ হই না, কেন আমাকে তুমি তোমার যা কিছু আছে সব দেবে?'

অবিনাশবাবু তাকে বুকে জড়িয়ে ধরে বললেন, 'কে বলে তুমি আমার কেউ নও? তুমি আমার মেয়ের চেয়েও বেশী। আমার তো আর কেউ নেই—কী করব এত টাকা? তুমি আসবে আমার কাছে? আমি তোমাকে লেখাপড়া শেখাব, বাড়ী কিনে দেব, গাড়ী কিনে দোব, তার পর তুমি যখন বড় হবে মস্ত বড়লোকের ছেলের সঙ্গে বিয়ে দিয়ে দোব।'

শুভ্রা লজ্জায় লাল হয়ে বলল, 'যাও তুমি ভারি দুষ্টু।'

অবিনাশবাবু বললেন, 'আসবে শুভ্রামনি, তুমি আসবে আমার কাছে?'

সে খুশীতে ঝলমল করতে করতে বলল, 'হ্যাঁ আসব।' কিন্তু পরমুহূর্তেই ম্লান হয়ে গিয়ে বলল, 'তা'হলে তো আমার ফলওলা দাদুকে ছেড়ে আসতে হবে। দাদু তাহলে বাঁচবে কি করে? দাদু যে ভয়ানক একা! কে তাহলে দাদুকে যত্ন করে খাওয়াবে, কে ঘুম পাড়িয়ে দেবে! দাদুকে ছেড়ে আমি চলে এলে তো দাদুর আবার আর একটাও ফল বিক্রী হবে না!'

অবিনাশবাবু বললেন, 'তোমার ফলওলা দাদুকেও আমার বাড়ীতে নিয়ে এসে রাখব। তাঁকেও আর ফল বিক্রী করতে হবে না। বুড়োমানুষ! ক'দিনই বা আর বাঁচবেন!'

ছোট্ট শুভ্রা আনন্দে হাততালি দিয়ে বলে উঠল, 'হ্যাঁ, সে খুব ভালো হবে। চল দাদু, আজ রাতেই ফলওলা দাদুকে নিয়ে আসি। আমিও আজ থেকেই তোমার এখানে থাকব।'

অবিনাশবাবু একটু অপ্রস্তুতে পড়ে গিয়ে বললেন, 'আজ নয় মা, আজ রাতটুকুর মত তুমি ঘরে ফিরে যাও। কাল সকালে আমি

তোমাদের নিয়ে আসব। এ বাড়ীতে আমার এই একখানি মাত্র ঘর। কাল সকালে আমি এই পাশেই আর একটা বাড়ী পাব, তাতে দু'তিনটে ঘর থাকবে। তা ছাড়া আজ রাত্রে আমায় একবার ল্যুটন যেতেই হবে। টেলিফোন পেয়েছি আমার এক বন্ধু মৃত্যুশয্যায়ে। মাঝ রাতের আগে ফিরতে পারবে বলে মনে হয় না।'

শুভ্রা বলল, 'আচ্ছা। ভালোই হ'লো। দাদুর কিছু ফল রয়ে গেছে, সেগুলো কাল সকালে বিক্রি করে দোব।'

অবিনাশবাবু বললেন, 'চল মা, তোমায় তাড়াতাড়ি একটু ট্যাক্সি করে বেড়িয়ে নিই. তার পর আমায় আবার ল্যুটন যেতে হবে। আর দেরী করলে চলবে না।'

শুভ্রা বলল, 'আঙ্কেল চল।'

আমি বললুম, 'আমার এখন তোমাদের সঙ্গে বেড়ালে চলবে না। আমায় এক্ষুনি একবার এ্যালপার্টনে আমার এক বন্ধুর কাছে যেতে হবে। খুব দরকার। আজ রাত্রে সে লণ্ডন ছেড়ে ব্রিস্টল চলে যাচ্ছে। অন্যদিন তোমাদের সঙ্গে বেড়াব।'

শুভ্রা দুষ্টুমীর ছলে বলল 'আবার হার ম্যাজেষ্টি, দি কুইনের কথার অবাধ্য হচ্ছ? তোমার সাজা হয়ে যাবে!'

আমি তার থুতনিটা ধরে একটু নেড়ে দিয়ে বললুম, 'রাণীর আঙ্কেল সবসময় রাণীর কথা শোনেন না। বরং আঙ্কেলের কথাই রাণী শোনেন!'

শুভ্রা হেসে উঠল। তার পর কৌতুক আর বুদ্ধির আলোয় ঝলমল করতে করতে বড় বড় চোখ দুটো নাচিয়ে বলল, 'আমার কিন্তু হার ম্যাজেষ্টী, দি কুইন নাম দেওয়া তোমার ঠিক হয়নি, আঙ্কেল। আমি কী রকম রাণী? একটা বাড়ী নেই, গাড়ী নেই। রাণী কী ফুল বিক্রী করে?'

আমি তাকে আদর করতে করতে বললুম, 'এইবার তো তোমার

বাড়ী গাড়ী সবকিছু হবে। আর তোমায় ফুল বিক্রী করতেও হ'বে না। প্রথম দিন আমি তোমার হার ম্যাজেষ্টি, দি কুইন নাম দিয়েছিলুম বলেই কোথা দিয়ে কী ভাবে নামটা ঠিক ঠিক লেগে গেল!'

শুভ্রাও হাসল। অবিনাশবাবুও হাসতে লাগলেন।

অবিনাশবাবু বললেন, 'আমাদের সঙ্গে বেড়াতে না'ই পারুন—চলুন আপনাকে খানিকটা এগিয়ে দিই।'

এ্যালপার্টন থেকে গেলুম ল্যাডব্রোক গ্রোভে আর এক বন্ধুর কাছে। সেইখানে ভাত খাবার লোভে অনেক রাত হয়ে গেল।

বাইরে বেরিয়ে দেখি নাইট্‌স্‌ব্রিজের শেষ বাস অনেকক্ষণ হলো চলে গিয়েছে। হাঁটা ছাড়া উপায় নেই। কিন্তু হাঁটব যে, কোন্ পথ ধরে হাঁটব? রাস্তা তো চিনি না।

ল্যাডব্রোক গ্রোভের বাস-স্ট্যাণ্ডের কাছে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে এই কথা ভাবছি। দেখি, সামনেই দাঁড়িয়ে এক মেয়ে তার নীল চোখের সকৌতুক দৃষ্টি মেলে আমাকে দেখছে। তার গায়ে লাল ওভারকোট। হাতে মাঝারি গোছের একটা স্যুটকেস। এ মেয়ে যেন মাটি ফুঁড়ে সামনে বেরল।

জিগেস করলুম, 'এখান থেকে নাইট্‌স্‌ব্রিজ কোন পথ ধরে যাওয়া যায় বলতে পারেন?'

তার নীল নাল চোখ দুটোয় রাজ্যের বিস্ময়। বলল, 'নাইট্‌স্‌-ব্রিজ? সে তো অনেক দূর। সোজা পথ তো নয় যে, বলে দোব। আসুন আমার সঙ্গে, আমিও ওইদিকেই কেন্‌সিংটনে যাব।'

অনেকক্ষণ চুপচাপ পথ চলার পর মেয়েটি অদ্ভুত নয়ন মেলে

খানিকক্ষণ আমার মুখের দিকে চেয়ে থেকে বহু দ্বিধায় প্রশ্ন করল, 'কিছু যদি মনে না করেন—একটা কথা শুধোতে পারি?'

'কী?'

'আপনি বাঙালী?'

বললুম, 'হুঁ।'

খানিক আবার চুপ ক'রে কী ভাবল। তার পর শুধোলো, 'আপনি সিলেট চেনেন?'

অবাক হয়ে বললুম, 'হুঁ।'

রুমালে নাকটা মুছে শুধোল, 'সে কত বড় জায়গা?'

আশ্চর্য হয়ে বললুম, 'কেন বলুন তো? অনেক বড়।'

ঠাণ্ডায় নাকটা একেবারে খসে যাবে বলে মনে হচ্ছে।

আর একবার রুমালে নাকটা মুছে বলল, 'না, এমনি। আমি ভেবেছিলুম সিলেট বোধহয় খুব ছোট্ট জায়গা, লোকজনও বোধহয় খুব কম—আব্দুল জব্বারকে বোধহয় সেখানে সবাই চেনে। আপনিও বোধহয় তার ঠিকানাটা আমায় দিতে পারবেন।'

অবাক হয়ে শুধোলুম, 'আব্দুল জব্বার কে? আপনি তাকে চিনলেন কী করে?'

তার মুখে একটা বিষাদের ছায়া নামল। কয়েক নিমেষ চুপ থেকে বলল, 'তার সাথে আমার বিয়ে হয়েছিল। জাহাজে খালাসীর কাজ নিয়ে লণ্ডনে পালিয়ে এসেছিল। তার পর আমার সঙ্গে তার কী ভাবে আলাপ হয় সে আর নাই বা শুনলেন। তার থাকার জায়গা ছিল না, খাবার পয়সা ছিল না। রাস্তায় রাস্তায় ঘুরত। আমি দোকানে কাজ করে টাকা পয়সা দিয়ে তার থাকার ব্যবস্থা করে দিই, দর্জির কাজ শেখাই। শেখা হয়ে গেলে আমি তাকে বিয়ে করি। আমাদের এক মেয়ে হয়। ছ'বছরের মধ্যে দর্জির কাজ করে সংসার খরচের পরেও সে অন্তত পাঁচ হাজার পাউণ্ড জমায়।

এতদিন চিঠিপত্র কিছু ছিল না, একদিন বলল দেশ থেকে মায়ের চিঠি পেয়েছি, মা মৃত্যুশয্যায়, আমি মায়ের একমাত্র ছেলে, অনেকদিন দেখা হয়নি, একবার দেশে গিয়ে মায়ের সঙ্গে শেষ দেখা করে আসি। তাকে আমি ভীষণ ভালোবাসতুম, আর বিশ্বাস করতুম, তাই বাধা দিলুম না। বলল দু'এক মাসের মধ্যেই ফিরে আসবে। কিন্তু সেই যে গেছে আজ তিন বছর হয়ে গেল আর ফিরেও এলো না, কোন খবরও দিল না। সে আর আসবে না আমি জানি। সে চুপিচুপি তার ব্যাঙ্কের টাকাপয়সাও নিয়ে চলে গেছে, ব্যাঙ্কে আমি খোঁজ নিয়ে জেনেছি। আমায় যে ঠিকানা দিয়েছিল সে ঠিকানায় চিঠি দিয়ে ফিরে এসেছে। মিথ্যে ঠিকানা! এত বড় ঠক্ সে! সে পালিয়ে গেছে তাতে আমার কোনো দুখু নেই, কিন্তু আমার সবচেয়ে বড় দুখু কী জানেন? মাকে দেখিয়ে আনবে বলে সে আমার ছোট্ট মেয়েটাকে পর্যন্ত নিয়ে চলে গেছে। তার কথা ভেবে ভেবে একদিন ঠিক আমি পাগল হয়ে যাব। রাতে ভালো ঘুম হয় না, ঘুমোলেও শুধু তাকেই স্বপ্ন দেখি। তাই মাঝে মাঝে ভাবি সিলেট যাব, কিন্তু আবার ভয়ও হয়—সম্পূর্ণ অচেনা জায়গা। যদি মেয়েকে না খুঁজে বার করতে পারি! তা ছাড়া খর্চাও বিস্তর। কী যে করব আমি কিছুই ভেবে পাই না। তাই বাঙালী দেখলেই আমি শুধোই— যদিও পাগলামী জানি—তোমরা কেউ সিলেটের আব্দুল জব্বারকে চেনো?'

কী জবাব দেব ভেবে পেলুম না। চুপচাপ শুনে চুপ করেই রইলুম।

মানুষের এই আনন্দোজ্জ্বল বাইরেটা একটা মস্ত রঙীন ছদ্মবেশ! সবাই বাইরে চকচকে মুখোশ পরে ঘুরছে। নইলে ভিতরে ভিতরে কেউ সুখী নয়। একটা মানুষকেও আমি সুখী দেখলুম না।

দেখি কুইন্স্ গেটের কাছে এসে পড়েছি। এইখানে সে বিদায় নিয়ে চলে গেল।

আকাশের দিকে চেয়ে চমকে উঠলুম। চাঁদ উঠেছে! শুভ্র চাঁদের আলোয় আকাশ, হাইড পার্ক, কেনসিংটন গার্ডেন্‌স্ সব একেবারে মরীচিকার মত স্বপ্নময়, মায়াময় হয়ে উঠেছে—কাছের জিনিষ সব যেন হঠাৎ অত্যন্ত দূরে সরে গেছে। মৃণ্ময় পৃথিবী যেন চিন্ময় হয়ে উঠেছে—দেখা যাবে কিন্তু স্পর্শ করা যাবে না।

বাড়ী ফিরে দেখলুম বিকেলের ডাকে একটা চিঠি দিয়ে গেছে। উপরে ফ্রান্সের টিকিট। রায়ের চিঠি। লিখেছে, 'আমি আর গিন্নী দশ তারিখে লণ্ডন পৌঁছচ্ছি। লণ্ডনে বেকার স্ট্রীটের একটা নাম করা দোকানে আমি চাকরী পেয়েছি। তাই মাত্র এই কয়েকদিনের মধ্যেই আমরা প্যারিস ছেড়ে চলে যাচ্ছি।'

যাক! 'এশিয়া'র দৌলতে রায় আর জয়া চতুষ্পদ হয়ে গেল!

॥ ছাব্বিশ ॥

ইউসটন টিউব ষ্টেশনের সিঁড়ি দিয়ে তর তর করে উপরে উঠছি, দেখি বড়দা এক বুড়ী মেম সায়েবের একগাদা মালপত্র ঘাড়ে করে নীচের নামছেন।

আমায় বললেন, 'একটু দাঁড়াও, এঁকে রেলে চাপিয়ে দিয়েই আমি এক্ষুনি আসছি। আমি না দেখে ফেললে বুড়ী এই রাজ্যের মালপত্র ঘাড়ে করে সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে এক্ষুনি মুখ থুবড়ে পড়ে মরতেন। রীতিমত টাল খাচ্ছিলেন।'

তাঁর কাঁধে সেই ক্যামেরা। কিন্তু আজ কালো বেড়ালের ছানাটা নেই!

ফিরে আসতেই শুধোলুম, 'কী বড়দা, আপনি কাল ব্রাসেল্‌স গেলেন না?'

পাইপটা ধরাতে ধরাতে বললেন, 'আর বল কেন ভাই, তোমার ওখান থেকে স্যুটকেস এনে দেখি আমার wife এসে হাজির। নইলে আমি তো যাবার জন্যে এক পা হয়ে ছিলুম।'

ওয়াইফ! কথাটা শুনে বড় অবাক লাগল। বড়দা বিবাহিত জানতুম না তো! সঙ্গে সঙ্গে কাল সন্ধ্যার সেই ছবিটা চোখের সামনে ভেসে উঠল। ভুল ধারণা করেছিলুম বলে মনে মনে বড় লজ্জা পেলুম।

'আপনার সেই কালো বেড়াল গেল কোথায়? আজ যে সঙ্গে নেই?'

বড়দা স্নিগ্ধ হেসে বললেন, 'আমার ওয়াইফকে পেয়ে সে ব্যাটা আমাকে একদম ভুলে গেছে। দিনরাত আদুরে খুকীর মত তারই কোলে কোলে ঘুরছে।'

তার পরেই হঠাৎ অত্যন্ত গম্ভীর হয়ে গিয়ে বললেন, 'দেখ, একটা

কথা তোমায় বলি। সেন যদি কখনো তোমার কাছে কিছু ধারটার চায় তো দিও। ড্রাফ্‌ট্‌ ওর আসবে আমি জানি, I have no doubt about it.—না হ'লে আমার কাছ থেকে পাবে। সবাই মিলে বড়দা করেছে যখন তখন আমাকেই সকলের সব ভার নিতে হবে। ওর সত্যিই দরকার, ওটা ওর স্বভাব মনে করে অবিশ্বাস করো না। সবাই ও'কে ভুল বোঝে। কিন্তু আমি ও'কে চিনি। এই আমি তোমাদের বলে রাখছি, দশ বছরের মধ্যে ওই সেনের নাম একটা ইণ্টার ন্যাশানাল নাম হয়ে দাঁড়াবে। আগুনকে কেউ চেপে রাখতে পারে না। ও'র মধ্যে জিনিষ আছে। আমি তার সন্ধান পেয়েছি। আর কেউ তা পায়নি। এটা জেনে রেখে দিও, এই বড়দা লোকটির মানুষ চিনতে কখনো ভুল হয় না। মানুষের দুঃসময়ে সবচেয়ে আপনজন যারা তারাই সবচেয়ে বেশী সুযোগ নেয় জানো তো ? সেন সেই যাঁতাকলে পড়ে গিয়ে পিষে মরছে। শফিক শাবানকেও একটু কথাটা আমার হয়ে ব'ল দিও।'

আশ্চর্য হয়ে তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে রইলুম। আমাকে পাকড়াও করে হঠাৎ এ সব বলার মানে কী!

বড়দা পাইপে একটু টান দিয়ে শুধোলেন, 'কোথায় যাচ্ছো ?'

'এখানে একটা কাজ সেরেই একটু ট্রাফালগার স্কোয়ারে যাব।'

'বেশী তাড়া আছে ?'

'না।'

'তবে চল আমার সঙ্গে—ওয়ারেন স্ট্রীটে একজনের সঙ্গে দেখা করে যাই। ছেলেটার অনেকদিন খোঁজ খবর নেওয়া হয়নি। আর আজ-কালকার এই ছেলেগুলোও এমন হয়েছে যে, একটু যে দেখা করে খবর-টবর দেবে তা নয়। অবশ্য ছেলেদেরও দোষ দেওয়া যায় না,—ছেলেমানুষ সব, এ বয়েসে কতটুকুই বা কর্তব্যজ্ঞান হয়েছে! আর ছেলেমানুষ বলেই না সবাই মিলে আমাকে বড়দা করেছে।'

তাঁর সরল মুখে স্নেহ আর গর্বের আভার খেলা দেখতে লাগলুম।

বড়দা বললেন, 'চল। পরিচয় হয়ে যাবে। বিমল আর ওর স্ত্রী অরুণা—ওরা দু'জনেই ভারি ভালো।'

ওয়ারেন স্ট্রীটে পৌঁছে অনেকক্ষণ ধরে কলিং বেল টেপার পর বড়দার সমবয়সী—অথচ বড়দার ভাষায় এরাই সব ছেলেমানুষ!—এক কিম্ভুতকিমাকার মূর্তি দরজা একটুকু ফাঁক করে উকি মেরে বড়দাকে দেখে কালো মুখে একগাদা বিশ্রী সাদা দাঁত বার করে কাঠহাসি হাসতে হাসতে বলল, 'হেঁ, হেঁ—আরে বড়দা—'

দরজার ফাঁক তারচেয়ে আর একটুও বড় হলো না।

সরল বড়দা গোলমাল করে বলে উঠলেন, 'তোমরা কী রকম ছেলে বল দিকিনি? মাঝে মাঝে দেখাটেখা করে একটু খবর-টবর তো দিতে হয়? চিরকাল কী ছেলেমানুষ থাকলে চলে? আমি ওদিকে তোমাদের খবরের জন্যে ভেবে ভেবে মরছি।'

দরজাটা একটু ভালো করে খুলে আমাদেরকে যে ভিতরে ডেকে নেবে তা পর্যন্ত করল না।

বড়দার ও সব কথার কোনো উত্তর না দিয়ে সেই ছোট্ট ফাঁকের ভিতর থেকেই উকি দিয়ে তেমনি দাঁত বার করে কাঠহাসি হাসতে হাসতে বলল, 'হেঁ হেঁ, ভেরি বিজি বড়দা, এখন একটুও সময় নেই,—হেঁ হেঁ, অরুণা, ও অরুণা, দেখে যাও কে এসেছেন।'

অরুণাও সেই ফাঁকের ভিতর থেকে উঁকি দিয়ে টেনে টেনে হেসে হেসে বলল, 'বড়দা! হেঁ হেঁ, সো সরি বড়দা, বড্ড বিজি বড়দা,—একটুও টাইম নেই,—ভেরি বিজি—হেঁ হেঁ—'

অপমানে বড়দার কান দুটো ততক্ষণে লাল হয়ে উঠতে শুরু করেছে; আমি ততক্ষণে রাগে রীতিমত কাঁপছি।

বড়দা বোমার মত ফেটে পড়ে বললেন, 'ঠিক আছে, আমি চলে যাচ্ছি'—তার পরেই আমার হাত ধরে টানতে টানতে চোখের নিমেষে উঁচু সিঁড়ি বেয়ে রাস্তায় নেমে এলেন।

নিজেকে একটু সামলে বললেন, 'দেখ, লোকের ভালো কক্ষনো করতে নেই—কক্ষনো না। কী রকম ব্যাভারটা করল দেখলে তো? অথচ এই বিমল আর অরুণা যখন তিন মাস আগে হঠাৎ লণ্ডনে এসে পড়েছিল কেউ ওদের চিনত না, আমিও চিনতুম না—ওদের খাবার, থাকার কিছুরই সংস্থান ছিল না। They were completely pennyless. এখানে চাকরী পাওয়া সহজ, প্রচুর earn করা যায়, শুধু তাই শুনে কোনরকমে জাহাজ ভাড়াটা যোগাড় করে ওরা এসে পড়েছিল। তুমি বিশ্বাস করবে, আমি নিজের ঘরে ওদেরকে থাকতে দিয়েছিলুম, নিজের পয়সা খর্চা করে, নিজের হাতে রান্না করে এক মাস ওদেরকে খাইয়েছিলুম। তার পর সারা লণ্ডন শহর ঘুরে ঘুরে একে ধরে তাকে ধরে অরুণাকে এক ইহুদীর দোকানে টাইপিস্টের চাকরী আর বিমলকে পিকাডিলির একটা দোকানে ক্যাশিয়ারের চাকরী ঠিক করে দিয়েছি। চাকরী পেয়ে ওরা সেই যে আমার ওখান থেকে চলে এসেছে তার পর আর একদিনও আমার সঙ্গে দেখা করেনি। আমার দৌলতে লণ্ডন শহরে established হয়ে গিয়ে আজ ওরা এত বিজি যে, আমায় একটু ঘরে ডেকে বসাবার ওদের সময় নেই! স্কাউণ্ড্রেল! সবাই আছে কেবল নিজের কাজটি উদ্ধার করে নেবার মতলবে! একটা মানুষকেও আমি দেখলুম না তার মধ্যে সত্যিকার কৃতজ্ঞতা বলে কিছু আছে! কেবল জানে সব স্বার্থ, স্বার্থ আর স্বার্থ! এই আমি তোমাকে বলে রাখছি আর কক্ষনো আমি কারো জন্য কিছু করব না। আজ আমি সত্যি সত্যিই রেগে গিয়েছি। আর আমি কারো বড়দা নই।'

মনে মনে হেসে বললুম, 'মুখে আপনি যতই বলুন, আপনি কোনদিন আপনার স্বভাব পালটাতে পারবেন না। দু'দিন পরেই সব ভুলে গিয়ে আবার লোকের জন্যে করবেন, তার পর আবার আঘাত পাবেন।'

বড়দা বললেন, 'ঠিক বলেছ। আমি কিছুতেই মনে করে রাখতে

পারি না। কতবার এ রকম দুঃখু পেয়ে মনে মনে প্রতীজ্ঞা করেছি আর কতবার যে ভুলে গিয়ে ওই একই ভুল করেছি তার ঠিক নেই। এই রকম প্রচণ্ড আঘাত পেয়ে পেয়েই আমার জীবনটা কাটবে—যা বুঝতে পারছি। This is my lot. আর একজনের কথা তোমায় বলি। ভদ্রমহিলা বিধবা, পাঁচ ছেলের মা, বয়েস পঞ্চাশের কাছাকাছি। বিয়ের আগে থেকেই আর এক ভদ্রলোকের সঙ্গে তাঁর প্রেম ছিল। বহুকাল পরে এই লণ্ডন শহরে তাঁদের দু'জনে আবার দেখা হয়েছে। কিন্তু তাঁদের দু'জনের দেখা করার কোনো জায়গা ছিল না। ভদ্রমহিলার বাড়ীতেও ছেলেমেয়েরা রয়েছে, আর ভদ্রলোক এখন বিপত্নীক হলেও তাঁরও ঘরে একপাল ছেলেমেয়ে। আর এই বুড়োবয়েসে তো আর অল্প বয়সী ছেলেমেয়েদের মত পথে ঘাটে, পার্কেটার্কে দেখা করতে পারেন না। কে কোথায় দেখে ফেলবে! ছেলেমেয়েদেরও চোখে পড়ে যেতে পারেন। আমি তাই আমার ঘরে তাঁদের দু'জনের দেখা করার ব্যবস্থা করে দিয়েছিলুম। তুমি বিশ্বাস করবে, ডুপ্লিকেট চাবি আমি তাঁদেরকে দিয়ে দিয়েছিলুম, আমি না থাকলেও তাঁরা যাতে যখন ইচ্ছে এসে দেখা করতে পারেন। প্রায় এক বছর ওঁরা যখন সুযোগ সুবিধে পেয়েছেন, আমার ঘরে এসে দেখা করেছেন। কোনো সময় অসময় ছিল না। আমার ঘরে ওঁদের এই আসাযাওয়া নিয়ে আমাকে যে কত নিন্দে, কত বিশ্রী কথা সহ্য করতে হয়েছে তার ঠিক নেই। তার পর যেই ওঁদের দেখা করার আর একটা জায়গা ঠিক হয়ে গেল আর ওঁরা একদিনের জন্যেও আমার সঙ্গে দেখা করেন না। মরলুম না বাঁচলুম একটা খবর পর্যন্ত নেন্ না। আমার সামনাসামনি পড়ে গেলে দৌড়ে গিয়ে বাসে উঠে পড়েন! ভদ্রলোক একদিন ধরা পড়ে গিয়েছিলেন। বললুম, কী ব্যাপার, গরজের সময় দু'বেলা আমার বাড়ীতে আসতেন আর এখন একদম আর ও পথের ছায়া মাড়ান না, দেখলেও এড়িয়ে চলতে চান! একদম ভুলে গেলেন? তাতে ভদ্রলোক

বেহায়ার মত কী জবাব দিলেন, জানো? বললেন, মানুষের স্বভাবই তা'ই—গরজ ফুরিয়ে গেলে আর সেখানে সে যায় না।'

বললুম, 'বলেন কী! মুখের উপরে এই কথা বলতে পারল!'

বড়দা ব্যস্ত হয়ে বললেন, 'ওঃ তোমাকে অনেকক্ষণ ধরে রাখলুম। ভেরি সরি। তুমি কোথায় যেন যাবে বলছিলে? ট্রাফালগার স্কোয়ার না? আচ্ছা, তুমি এখন যাও। তবে সেন সম্বন্ধে আমি যা বললুম সেটা ভুলো না। আমি একটু প্রেস্টন রোডে যাব। আমি চলি, আমার বাস এসে গেছে'—দৌড়ে গিয়ে তিনি বাসে উঠে পড়লেন।

বাস থেকে পেল্‌মেলে নেমে চোখে পড়ল অল্প দূরেই একটা ফুলের দোকানে সেন আর একজন বাঙালী মেয়ে! সেন তাকে একগোছা ফুল কিনে উপহার দিচ্ছে। মেয়েটির মুখে লজ্জা, গর্ব, হাসি।

পাছে তাদের চোখে পড়ে যাই তাই তাড়াতাড়ি একটা গলির ভিতরে ঢুকে গিয়ে অন্যদিক থেকে ঘুরে ট্রাফালগার স্কোয়ারে এলুম।

'আঙ্কেল!'

শুভ্রা।

ঠিক যেন ছোট্ট জল-পরীর মত ফোয়ারার ধারে পায়রাগুলোকে খাওয়াতে খাওয়াতে তাদের সঙ্গে দুষ্টমী করছিল। তাদের উড়িয়ে দিয়ে হাসতে হাসতে স্কোয়ারের ভিতর থেকে দৌড়ে রাস্তার উপরে উঠে এসে আমার হাত দুটো ধরে শরতের কাশফুলের মতো খুশীতে ঝলমল করতে করতে বলল, 'আঙ্কেল, আজ সকালেই আমার শেষ ফুল বিক্রী—কী মজা, না?'

আমি বললুম, 'হ্যাঁ'

বলল, 'তোমার খুশী লাগছে?'

বললুম, 'হ্যাঁ। ফুলওলি আজ সত্যি সত্যি হার ম্যাজেস্টি, দি কুইন হবে—খুশী লাগবে না?'

সে মধুর স্বরে খিলখিল করে হাসতে লাগল। সে কী আদুরে হাসি! কানদুটো যেন সুধায় ভরে গেল।

আমি বললুম, 'আজকেও তুমি ফুল নিয়ে এসেছ?

'আজকেই আমার শেষ ফুল বিক্রী—তাই নিয়ে এসেছি!'

তার পর একটু চুপ করে থেকে বলল, 'ফলওলা দাদুকেও সব কথা বলেছি। দাদুও খুব খুশী।'

আর একটু থেমে বলল, 'বুড়োদাদু কখন আমাদেরকে নিয়ে যেতে আসবে?' সে যেন অস্থির হয়ে উঠেছে।

'তোমায় কিছু বলে দেননি?'

'বলেছিল সাড়ে দশটার মধ্যে আসবে।'

'সাড়ে দশটা বাজতে এখনো বাকী আছে। উনি ঠিক সময়েই এসে পড়বেন।'

'আমার আর তর সইছে না।'

'সে তো বুঝতেই পারছি!'

একটু লজ্জা পেয়ে বলল, 'চল আঙ্কেল, ফলওলা দাদুর কাছে চল। বুড়োদাদু আসার আগেই দাদুর ফল আর আমার ফুলগুলো বিক্রী করে ফেলতে হবে।'

'চল!'

আমার হাত ধরে টেনে নিয়ে যেতে যেতে বলল, 'তুমি এখানে কোথায় এসেছিলে আঙ্কেল?'

'তোমাকেই দেখতে।'

লজ্জায় রাঙা হয়ে বলল, 'যাঃ।

'হ্যাঁ গো! তোমার যেমন রোজ সকালবেলায় ট্রাফালগার স্কোয়ারের পায়রাগুলোকে না আদর করলে দিনটাই সেদিন তোমার ভালো যায় না,

'আমারো ঠিক তেমনি সকালবেলায় তোমাকে একবার না দেখতে পেলে দিনটাই সেদিন ভালো যায় না।'

লজ্জা পেয়ে বলল, 'যাঃ, বানিয়ে বলছ।'

তার পর বলল, 'তাহলে আজ বুড়োদাদুর ওখানে চলে গেলে ও'খানেও রোজ সকালে আমাকে একবার করে দেখতে যাবে?'

বললুম, 'হ্যাঁ।'

তার পর কী একটু ভেবে নিয়ে বলল, 'আজ দাদু আমাদের নিয়ে যাবে, আমাকে আর ফুল বিক্রী করতে হবে না বলে আমার খুশী লাগছে খুবই, কিন্তু মাঝে মাঝে আবার খারাপও লাগছে। এ্যাদ্দিন ফুল বিক্রী করেছি, তাই ফুল বিক্রীর উপর কেমন যেন একটুখানি মায়া পড়ে গেছে! এই জায়গাটায় আমরা রোজ সকালে ফল আর ফুল নিয়ে এসে বসতুম, তাই এই জায়গাটার উপরেও একটা মায়া পড়ে গেছে। ছাড়াতে হবে ভাবলে বেশ কষ্ট লাগছে।'

বুড়ো ফলওয়ালা ফুটপাথের উপর বসে বসে ঝিমোচ্ছিলেন। তাঁর সামনে ফলের গাড়ী। আজ বেশী ফল নেই। আর তাঁর পাশে শুভ্রার ফুলের সাজি।

শুভ্রা খিলখিল করে হেসে উঠে বলল, 'দাদুর কাছে কেবল ঘুম!'

বুড়ো ধড়মড় করে জেগে উঠে লজ্জা পেয়ে বললেন, 'আমি যে বুড়ো হয়ে গেছি মা।'

শুভ্রা তার সাজি থেকে নিয়ে আমার কোটে একটা গোলাপ ফুল পরিয়ে দিল।

'এই যে মা, তুই এসেছিস? এই পথ দিয়েই যাচ্ছিলুম, তাই ভাবলুম আমার ছোট পাগলী মেয়েটাকে একবার দেখে বুকটা জুড়িয়ে যাই। মায়ের মন তো তোরা বুঝবি না মা। যেদিন মা হবি সেদিন বুঝবি।'

বেজওয়াটার-আন্টি! তাঁর মুখে সেই বিষাক্ত হাসি খেলা করছে।

তিনি তাঁর লাল গুলি গুলি চোখদুটো দিয়ে আমার সর্বাঙ্গে একবার ধারালো দৃষ্টি বুলিয়ে নিলেন। কিন্তু আমার সম্বন্ধে কোনো প্রশ্ন না করে শুভ্রার মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে বললেন, 'তুই আমার ঘর থেকে চলে এসেছিস বলে আমি যে তোর উপর রাগ করেছি—তা করিনি। কথায় বলে বুড়ো শালিখ পোষ মানে না। কিন্তু শালিখের ছানাও যে পোষ মানে না, এই তোকে দেখেই বুঝলম, মা। তা হোক, তবু রাগ আমি তোর উপর করতে পারব না। মা কী কখনো মেয়ের উপর রাগ করতে পারে! তুই ভালো থাক, তোর ফুল খুব বিক্রী হোক, দাদুর কাছে তোর অনেক টাকা জমুক, কেউ যেন না তোর টাকা মেরে নেয় আমি শুধু এই চাই। তবেই আমার শান্তি। তার পর তুই যেখানেই থাক, আমার বলবার কিছু নেই। আমি যে তোর টাকা পয়সা আমার কাছে রাখতে বলছি—তা বলছি না। ফুল তাহলে আজকাল খুব বিক্রী হচ্ছে—কী বল্?'

শুভ্রা কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে থেকে মৃদু উত্তর দিল 'হুঁ।'

বেজওয়াটার-আন্টির চোখদুটোয় বিদ্যুৎ নেচে উঠল। বললেন, 'বেশ, বেশ,—টাকাকড়িও তাহলে খুব জমাচ্ছিস বল?'

শুভ্রা চুপ।

বেজওয়াটার-আন্টি আরো জোরে জোরে তার মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে বললেন, 'তা বেশ—বেশ। আমি যে আমার ঘরে তোকে ফিরে যেতে বলছি বা আমি যে তোর টাকাপয়সা আমার কাছে জমা রাখতে বলছি তা মনেও করিস না, মা। আমি শুধু এই বলতে চাই, যে, যত পারিস দাদুর কাছে—আমার কাছে না—জমিয়ে নে মা, নইলে পরে বিপদে পড়বি। সবসময় বুড়ীর এই কথাটা মনে রাখিস, দিনে বাতি যার ঘরে তার ভিটেয় ঘুঘু চরে। কালকের ফুলের পয়সাটা তোকে আজকেও দিতে পারলুম না, মা। মোটেই ভাঙানো পয়সা নেই। কালকে দিয়ে যাব। এক কাজ কর না মা? আজ সন্ধ্যেয়

আমার বাড়ী আয় না? রেবার আজ জন্মদিন। তুই গেলে রেবাও খুব খুশী হবে।'

শুভ্রা বুদ্ধি করে উত্তর দিল, 'আজ সন্ধ্যেয় আমার সময় হবে না, অন্য জায়গায় যেতে হবে।'

'তা বেশ—বেশ। রেবার জন্মদিন আজ, ফুল লাগবে,—তা তোর কাছ থেকেই ফুল নিয়ে যাই'—বলতে বলতে তার এক সাজি ফুলই ছোঁ মেরে তুলে নিয়ে বললেন, 'তোর কালকের ফুলের পয়সা আর আজকের ফুলের পয়সা একসঙ্গে কাল দিয়ে যাব, মা। আজ একদম ভাঙানো পয়সা নেই। মা আর মেয়েতে কী আর ব্যবসার সম্পর্ক! এখন তবে চলি মা? তুই ভালো থাক, তোর ফুল খুব বিক্রী হোক, দাদুর কাছে তোর অনেক টাকা জমুক, তোর টাকা কেউ যেন না মেরে নেয়,—চলি মা।'

সংসারে অনেকখানি নির্লজ্জ হ'তে না পারলে এখানে সবার উপরে টেক্কা মেরে চলা যায় না। তাই যাদের লজ্জা আছে তারা কেবলই হারতে থাকে। আর বেজওয়াটার-আন্টির মত লোকেরা কখনো হারে না!

ট্যাক্সি থেকে অবিনাশবাবু নামলেন।

শুভ্রা দৌড়ে গিয়ে তাঁর কোলের কাছে ঝাঁপিয়ে পড়ল।

আমি শুধোলুম, 'নতুন বাড়ীটা পেলেন?'

অবিনাশবাবু বললেন, 'হ্যাঁ। বাড়ী বদল করতেই তো একটু দেরী হয়ে গেল।'

শুভ্রার চোখে মুখে যেন আলো জ্বলে উঠেছে। বলল, 'তোমার দেরী দেখে আমি মনে মনে ভাবছিলুম তুমি বোধ হয় আমাদের নিয়ে যেতে আসবে না।'

অবিনাশবাবু তাকে বুকের ওপর চেপে ধরে আদর করে মাথায় একটা চাঁটি মেরে বললেন, 'দুষ্টু, কোথাকার।'

আমি শুধোলুম, 'ল্যুটন থেকে কখন ফিরলেন?'

'কাল মাঝ রাতেই ফিরেছি।'

'আপনার বন্ধু কেমন আছেন?'

'একটু ভালোর দিকে। এ যাত্রা বোধহয় বেঁচে যাবে।'

'কী হয়েছে?'

'টাইফয়েড।' তার পর শুভ্রাকে বললেন, 'তাহলে চল শুভ্রারাণী, আর দেরী নয়। দেখবে তোমার জন্যে কী সুন্দর বাড়ী নিয়েছি।'

শুভ্রার ছোট্ট মুখখানিতে আনন্দের সঙ্গে বড় চমৎকার একটুখানি গর্ব ফুটে উঠেছে। বলল, 'হ্যাঁ, চল।'

আজ বৃষ্টি নেই, কিন্তু লণ্ডনের আকাশ মেঘে মেঘে কালো হয়ে আছে। সেই কালোর তলায় আনন্দে, গর্বে ছোট্ট শুভ্রাকে ঠিক এক ঝাড় আলোর মতো দেখাচ্ছে।

অবিনাশবাবু একটু চুপি চুপি শুধোলেন, 'দাদুকে সব কথা বলেছ? কাল যে শিখিয়ে দিয়েছিলুম?'

শুভ্রাও তেমনি কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে ফিসফিস করে বলল, 'হ্যাঁ। দাদুও খুব খুশী।'

অবিনাশবাবু বুড়ো ফলওয়ালাকে বললেন, 'তা'হলে চলুন?'

বুড়ো ফের ঝিমোতে শুরু করেছিলেন। চমকে উঠে বললেন, 'হ্যাঁ—চলুন।'

অবিনাশবাবু একটু ভেবে একটু থতমত করে বললেন, 'কিন্তু বাড়ী থেকে তোমাদের জিনিষপত্র তো নিতে হবে?'

শুভ্রা লজ্জা পেয়ে বলল, 'নেবার মত তেমন কিছু জিনিষপত্র আমাদের নেই।'

অবিনাশবাবু বললেন, 'তাহলেও কিছু কিছু তো—'

শুভ্রা লজ্জায় রাঙা হয়ে বলল, 'হ্যাঁ, কিছু কিছু নেওয়া যাবে। সব একটা বাক্সের মধ্যে গুছিয়ে রেখে এসেছি। কিন্তু একটি শর্ত দাদু।

গলির মুখে তুমি ট্যাক্সিতে বসে থাকবে, নামতে পাবে না। আমরা যা যা নেবার ঘর থেকে নিয়ে আসব। আমাদের ঘরের অবস্থা, কী ভাবে আমরা থাকতুম তোমাকে তা কিছুতেই দেখতে দোব না।'

অবিনাশবাবু হাসতে হাসতে বললেন, 'আচ্ছা—আচ্ছা।' তার পর বললেন, 'ফলের ওই গাড়ীটা কী করবে ?'

শুভ্রা কিছু বলার আগেই বুড়ো ফলওয়ালা বললেন, 'আমাদের জানাশোনা একজন বুড়ী ফলওলি আছে। তাকে দিয়ে দোব। তাকে বলে রেখেছি। সে এখনি এসে নিয়ে যাবে বলেছে।'

শুভ্রা বলল, 'আমার ফুলের সাজিটা কিন্তু আমি ঘরে নিয়ে গিয়ে যত্ন করে রেখে দোব, দাদু। ওটার সঙ্গে আমার ছোট্ট জীবনের অনেক স্মৃতি জড়িয়ে আছে। অনেকদিন পরে বড় হয়ে সাজিটার দিকে চেয়ে চেয়ে আমি আজকের দিনগুলোর কথা ভাবব—ভাবব একদিন ছোট বেলায় এই লণ্ডন শহরে ট্রাফালগার স্কোয়ারে আমি ফুল বিক্রী করতুম ! অনেকদিন পরে এ সব দিনের কথা ভাবতে আমার খুব ভালো লাগবে।'

অবিনাশবাবু বললেন, 'আচ্ছা বেশ, বেশ—সাজিটা তুমি সঙ্গে করে নিয়ে গিয়ে খুব যত্ন করে রেখে দিও।'

তার পর আমায় বললেন, 'আপনিও চলুন না আমাদের সঙ্গে ?'

আমি বললুম, 'আমার এখন একদম সময় হবে না। আমায় এখন প্রথমে যেতে হবে কিং উইলিয়ম ষ্ট্রীট। সেখান থেকে যাব বার্কলে স্কোয়ার। তার পর কুইন ষ্ট্রীট। কুইন ষ্ট্রীট থেকে যাব কেনিংটন। আপনারা তিনজনে গিয়ে নতুন জীবন শুরু করুন। আমি বরং সন্ধ্যেবেলা একবার সময় করে আপনাদের ওখানে যেতে চেষ্টা করব।'

শুভ্রা বলল, 'চেষ্টা করব নয়, সন্ধ্যেবেলা ঠিক আসা চাই। নইলে আমি খুব রাগ করব। কথাই বলব না আর কোনোদিন।'

আমি বললুম, 'এখন ও কথা বলছ বটে, কিন্তু আজ সত্যি সত্যি

হার ম্যাজেষ্টি, দি কুইন হয়ে সন্ধ্যেবেলায় আমায় হয়তো আর চিনতেই পারবে না।'

শুভ্রা বলল, 'ইশ!'

বুড়ী ফলওলি এসে ফলের গাড়ীটা নিয়ে গেল।

অবিনাশবাবু একটা ট্যাক্সি দাঁড় করালেন।

দাহুর সঙ্গে ট্যাক্সিতে বসে জানালা থেকে মুখ বাড়িয়ে শুভ্রা চিৎকার করে বলল, 'আঙ্কেল, সন্ধ্যেবেলা আমাদের বাড়ীতে ঠিক আসা চাই।'

ওইটুকু মেয়ে গর্বে একেবারে ঝলমল্ করছে। ঠিক যেন ছোট্ট রাণী।

'আমাদের বাড়ী'—কথাটা একটা বিশেষ সুরে আমার ছুই কানের মধ্যে খেলা করতে লাগল।

সবই হলো মানুষের ভাগ্য! এই ভাগ্যের খেলায় কখন যে কোথা দিয়ে কার কী হয়ে যায় কিচ্ছু বলবার জো নেই! শুভ্রা লণ্ডনের রাস্তায় ফুল বিক্রী করছিল—তার পর হঠাৎ কোথা থেকে কী হয়ে গেল! ফুলওলি থেকে রাণী! এখন তার বাড়ী হবে, গাড়ী হবে, লেখাপড়া শিখবে—জীবনের সব কিছু পাল্টে যাবে।

সকালবেলায় আর কোনোদিন দেখতে পাব না সারা ট্রাফালগার স্কোয়ারকে আলো করে শুভ্রা তার ফুলের সাজি নিয়ে এসে রাস্তার ধারে এই কোনটিতে বসেছে। সে এখন মস্ত বড়লোকের একমাত্র আছুরে মেয়ে।

হন্ হন্ করে পা চালালুম। মনে হলো আজ থেকেই যেন ট্রাফালগার স্কোয়ার অন্ধকার হয়ে গিয়েছে। ট্রাফালগার স্কোয়ারকে এর আগে আমি আর কোনোদিন এত কালো দেখিনি।

প্রথম যেদিন সে এইখানে কোথা থেকে দৌড়ে এসে অবিনাশবাবুর হাত জড়িয়ে ধরে বলেছিল, 'বুড়ো দাছু, বুড়ো দাছু, একটা আপেল কেনো না, বুড়ো দাছু'—সেই দিনটার কথা আমার মনে পড়ল।

॥ সাতাশ ॥

সন্ধ্যাবেলা লাইমগ্রোভে অবিনাশ বাবুদের বাড়ীতে যাবার আগে ভাবলুম একবার শেফার্ডশ বুশে শফিক শাবানের ও'খানে ঢু দিয়ে যাই।

শাবান বাঁশি বাজাতে বাজাতে ফায়ারপ্লেসের ধারে বসে আগুন পোয়াচ্ছিলেন। আমাকে দেখেই লাফ দিয়ে উঠে হাত বাড়িয়ে দিয়ে নাটুকে ঢঙে বললেন, 'আরে আসুন, আসুন। বসে বসে আপনারই পায়ের শব্দ শুনছিলুম। আপনি আসবেন আমি জানতুম। আমার টেলিপ্যাথি ভয়ানক ঠিক হয়। যার কথা ভাবি সেই এসে পড়ে! একেই বলে প্রেমের মাধ্যাকর্ষণ! আপনার কথাই ভাবছিলুম! আর একটু পরে এলেই আর আমাকে খুঁজে পেতেন না। আমি হঠাৎ ছুঁচস্নুতো হয়ে যেতুম!'

বুঝতে না পেরে থতমত খেয়ে গিয়ে বললুম, 'ছুঁচস্নুতো হয়ে যেতুম মানে?'

হা হা করে হেসে উঠে বললেন, 'বুঝতে পারলেন না তো! একটু পরেই আমি এক বন্ধুর সঙ্গে দেখা করতে থ্রেড্‌নিড্‌ল্ স্ট্রীটে চলে যেতুম।'

বুঝতে পেরে বললুম, 'অঃ, তাই বলুন!'

তার পর ভিজে ওভারকোটটা খুলে সামনেই একটা মোড়া টেনে বসে পড়ে ঠাণ্ডায় হিম হাত দুটোকে তাতাতে তাতাতে বললুম, 'বড়দা বিবাহিত বলে জানতুম না তো?'

শাবান বললেন, 'আমিই কী ছাই জানতুম! এই কাল মোটে জানলুম। এক আইরিশ মেয়ের সঙ্গে উনি দুয়ে মিলে এক, একে মিলে দুয়ের খেল খেলেছেন! বড়দা থাকেন লণ্ডনে, বৌ থাকেন এডিনবরায়। সেখানে তিনি ইস্কুল মাষ্টারণী। কখনো বৌ আসেন

লণ্ডনে, কখনো বড়দা যান এডিনবরায়। এমনি করে বিচ্ছেদ দিয়ে প্রেমের কই মাছকে ওঁরা চির নতুন করে জীইয়ে রেখেছেন।' হাসতে হাসতে খণ্ড বিখণ্ড হয়ে ফায়ারপ্লেসের চারিদিকে ছড়িয়ে পড়লেন।

তার পর হাসি সামলে নিয়ে বললেন, 'আর একটি সন্দেশ খান। আজ সকালে বর্মিংহামের মামাবাড়ীর খাঁচা ছেড়ে আল্‌হাজ্‌ ফয়জুর আহমদ বোগদাদী সায়েব লণ্ডনে শেফার্ডস বুশের খাঁচায় আবার উড়ে এসেছেন। মগরেবের নামাজটি শেষ করেই তিনি আমার ফায়ারপ্লেসে আগুন পোয়াতে এসে আমাকে সরফরাজ করবেন সে ভরসাও দিয়েছেন। তাঁর ফায়ার প্লেস এখনো না কি ঠিক করা হয়নি! বুঝলেন তো?' একটু চোখ টিপিলেন।

বললুম, 'না।'

হাড় কিপটে তো, তাই যদ্দিন কয়লা না কিনে অন্যের ঘাড়ে চালানো যায় আর কী! কিন্তু বোদগাদী চিড়িয়া অত্যন্ত গভীর বনের চিড়িয়া, সোজাসুজি ধরা দেয় না। অনেক লুকোচুরি খেলে তবে ধরা দেয়। তাই আগুন পোয়ানোর ব্যাপারেও ঘোরপ্যাঁচ খেলে রেখেছেন! জানেন তো, যে সবচেয়ে বোকা হয় সে নিজেকে সবচেয়ে বুদ্ধিমান মনে করে, আর ওই রোগেই সে সব সময় মরে?'

'তা আর জানি না!'

কবে কত শত বর্ষ আগে—খলিফা হারুন-আল রশীদের সময়, না, তাঁর ঠিক পরেই আমার সে কথা ঠিক মনে নেই—বাগদাদের বাজারে এক বুড়ো কুমড়ো বেচতেন। তিনি মহা ধার্মিক লোক ছিলেন। সবসময় না কী সে পাগলের মুখে এক বুলি লেগে ছিল 'আইনুল-হক; আইনুল হক্‌।' সবসময় মন্ত্রোচ্চারণের মতো তার মুখে ওই আইনুল হক্‌, আইনুল হক্‌'—শুনে তখনকার লোকে না কী তাঁর ওই মন্ত্রোচ্চারণের আসল অর্থ হৃদয়ঙ্গম করতে না পেরে তাঁকে ভুল বুঝে বিধর্মী মনে করে পুড়িয়ে মারে।

আল্‌হাজ্‌ ফয়জুর আহমদ বলেন, তাঁর 'বাপজীর' দিক থেকে সেই ধর্মপ্রাণ দার্শনিক বৃদ্ধের সঙ্গে তাঁর কী রকম যেন একটা বংশগত সম্পর্ক আছে। সেটা কী রকম, অবিশ্যি তিনিও ঠিকমত জানেন না—তবে 'নানী'র মুখে শুনেছেন, আছে; মিথ্যে বড়াই তিনি হাজী মানুষ হয়ে 'লেবেন না।'

আর সেইজন্যেই তাঁর নামের শেষে 'বোগদাদী' কথাটার লেজুড় না জুড়লে ভয়ানক চটে যান,—যদিও, তিনি বর্ধমানের এক থমকে যাওয়া বৰ্দ্ধমান!

বার্মিংহামে তাঁর এক 'মামু' লোহার ব্যবসা করেন। হঠাৎ একদিন রাত্রে তিনি স্বপ্ন দেখেন 'মামু' মারা গিয়েছেন। তাই তাঁর 'দেল্‌' ভয়ানক 'বে-চায়েন' হয়ে ওঠে। সেইজন্যেই ভক্ত ভাগে মামুর খবর করতে গিয়েছিলেন বার্মিংহামে।

শাবানের ঘোরতর সন্দেহ, ও সব স্বপ্ন-টপ্ন বাজে। গভীর জলের মাছ আসলে বার্মিংহামে সাঁতরে গিয়েছিলেন মামুর মাথায় কাঁঠাল ভেঙ্গে পকেটটা একটু ভারি করে আনতে।

তাই শাবান বললেন, 'মামুর কাছে বোধহয় সুবিধে করতে পারেননি। দেখলুম মামুর উপর ভয়ানক চটে গেছেন!'

ঠিক সেই সময়েই বাইরে শুনি কোরাণ শরীফের সুরা। দরজা খুলে গেল। ধীর পদক্ষেপে, গম্ভীর মূর্তিতে ঘরে ঢুকলেন ঘোরতর মৌলবী আল্‌হাজ ফয়জুর আহমদ বোগদাদী। সুর্মাপরা চোখ দুটি বন্ধ। এক হাতে লাঠি। গায়ে সায়েবী পোশাক,—তবে মাথায় লাল তুর্কি টুপ। তার ভিতর থেকে কাঁচাপাকা বাবরী চুল বেরিয়ে আছে। কাঁচাপাকা ছাগল দাড়ী। মুখখানি পাকা আমের মত। মুখে অনবরত কোরাণ শরীফের সুরা উচ্চারিত হচ্ছে।

তিনি শুধুই হাজী নন্‌, একজন হাফেজও। সমস্ত কোরাণ শরীফ তাঁর মুখস্ত আছে। এবং সর্বক্ষণ আবৃত্তি করেন।

শাবান বললেন, 'আসুন হাজী সায়েব, আপনার জন্যেই আগুন জ্বালিয়ে দিয়েছি, বসুন।'

সুর করে কোরাণ শরীফের সুরা আবৃত্তি করার ঘোরে কথা কানে গেল বলেই মনে হলো না।

আমি শুধোলুম, 'বার্মিংহামের মামু কেমন আছেন?'

বোগদাদী সায়েব বন্ধ চোখ অল্প একটুখানি খুলে আমাকে দেখে নিয়েই ফের বন্ধ করে আরো জোরে জোরে সুরা পড়তে লাগলেন! যেন শুনতেই পাননি!

শাবান বললেন, 'আরে ও'দিকে নয়, এইদিকে আসুন, এইদিকে চেয়ার আছে।'

ভাবখানা যেন তিনি চোখ বন্ধ অবস্থায় সুরা পড়তে এমনি মত্ত আছেন যে, কোন্‌দিকে কী আছে কিছু দেখতেই পাচ্ছেন না!

শাবান সব বুঝেসুঝেও তাঁকে ধরে এনে আগুনের ধারে চেয়ারে বসিয়ে দিলেন। বোগদাদী সায়েব বসেই তুর্কী টুপির ল্যাজ দুলিয়ে বললেন, 'আইনুল হক।'

তার পর যেন মত্ত ভাব একটু কাটল। ভাবে ঢুলু ঢুলু চোখ একবার আমার দিকে একবার শাবানের দিকে মেলে তার পর ফের বন্ধ করে বললেন, 'চারিদিকেই 'তিনি'। মাটির ঘাস থেকে আকাশের তারা পর্যন্ত সেই 'তিনি' ছাড়া কিছু নেই। আমি কে? তিনিই আমি, আমিই তিনি। নিজেকে চেনা মানেই তাঁকে চেনা। নিজেকে যে চিনেছে সে তাঁকেও চিনেছে।'

শাবান বললেন, 'তা আর বলতে!'

আমি শুধোলুম, 'মামুর খবর সব ভালো?'

তিনি দু'চোখ বন্ধ করে ফের জোরে জোরে সুর করে সুরা পড়তে শুরু করলেন।

শাবান শুধোলেন, 'বার্মিংহাম কেমন লাগল?

বন্ধ চোখ ধীরে ধীরে খুলে গেল। মনে হলো এইবার বোধ হয় করুণা হবে। হলোও।

সুর্মাপরা চোখ ছলছল করে কাঁদো কাঁদো হয়ে বললেন, 'ভালো না। চারিদিকে 'কুফরিয়া' কাণ্ডকারখানা দেখে দেখে 'দেল্' বহুত ঘাবরাঘাবরি করছে। কিন্তু সবই আল্লাহতায়ালার মেহেরবাণী, সবই তাঁর ইচ্ছা—পালালে তো চলবেনে। যে কাজের ভার 'লিয়ে' এসেছি তা খতম করতেই হবে।'

কৌতূহল চেপে রাখতে না পেরে শুধোলুম, 'কী কাজ?'

চোখ বন্ধ করে বোগদাদী সায়েব বললেন, 'একদিন, সে তখন রোজারোমজানের মাস, অনেক রাতে তারাবির নামাজ খতম করে নিদ গিয়েছি, এমন সময় খা'বে আমার পীর সায়েব হুকুম করলেন, বান্দা যাও, ইংল্যাণ্ডকো মুসলমান বানাও, সারে ইংল্যাণ্ড মুসলমান হো যায়গা—উস্‌কে বাদ সারে ইয়োরোপ, এশিয়া, আফ্রিকা। মগর কাম শুরু কর ইংল্যাণ্ডসে। যাও বান্দা, হাম তুমারা সাথ হ্যায়। তাঁর হুকুম পেয়েই আমি অধম বান্দা ইংল্যাণ্ডে এসেছি সারা ইংল্যাণ্ডকে মুসলমান করতে।'

মুখ থেকে আপনাআপনি বেরিয়ে গেল, 'এ্যাঁ।'

'সবই আল্লাহতায়ালার মর্জি। ওই মহৎ কারনের কাছে বিবি, ছেলে সব এখন আমার কাছে 'তুশ্চু' হয়ে গেছে—নইলে দেশে আমার চার বিবি, তিশ ছেলেমেয়ে আর এক বিধবা 'বুন' আছে। তাদের মায়া 'কেটিযে' আসা কী এতই সোজা! জান কোরবান করতেও আমি রাজি, তবু সারা ইংল্যাণ্ডে আমি ইসলামের আগুন 'লেগিয়ে' যাব,—স্বয়ং খোদাতায়ালা আমার সহায়। আমার ভয় কী!' তার পর চোখ বন্ধ করে বুকে হাত দিয়ে বললেন, 'ইসলাম! ইসলাম! ইসলাম!'

আমি বললুম, 'খুব মহৎ উদ্দেশ্যেই আপনার তাহলে ইংল্যাণ্ডে আগমন দেখছি।'

তিনি বাবরী চুল নাচিয়ে, তুর্কীটুপির ন্যাজ দুলিয়ে দু'হাত তুলে বললেন, 'সবই রহমানুর রহিম, মালেকুল্ মুল্‌ক্, আল্ হাইউল্ কাইউমের দয়া! আমি কে? আমি তো তাঁর যন্ত্র মাত্র। তিনি যে ভাবে চালাবেন তাঁর দাসানুদাস আমি সেইভাবেই চলতে বাধ্য। সবই তাঁর ইচ্ছা।'

শাবান বললেন, 'কাজ তবে শুরু করে দিন। আর দেরী কেন?'

বোগদাদী সায়েব বললেন, 'পীর সায়েব খা'বে বলেছিলেন, বান্দা তুম ইংল্যাণ্ডমে যাও, উঁহা হাম ফের তুমারা সাথ খা'বমে মোলাকাত করে গা; উস্ খা'ব কো পহেলে কাম মাত্ শুরু কর। আমি তাঁর অধম বান্দা সেই স্বপ্নের আশায় আছি। কবে তাঁর মর্জী হবে জানি না।'

তার পর ধ্যানস্থের মত বসে থেকে সুর করে কোরাণ শরীফের খানিক সুরা পড়ে নিয়ে চোখ বন্ধ অবস্থাতেই মওলানা সায়েব বললেন, 'এ কাফেরদের কথাই বা আর কী বলব! নিজের দেশের কথা যখন ভাবিরে 'ভেয়েরা' আমার, দেল্‌টা তখন 'চাক্‌নাচুর' হয়ে যায়! কেউ কী ইসলাম মেনে চলে? ইসলাম মেনে চলছেনে বলেই দুনিয়াময় আজ মসুলমানের এই দুর্দশা! আহা-হা! ইসলামের মতো এমন স্পর্শমাণিক হাতে পেয়েও মসুলমান চিনছেনে! মসুলমান আজ এমনি বেহুদা হয়ে গেছে! হায়রে মসুলমান, হায়! আমরা মোল্লামৌলুবীরা যারা ইসলামকে জান কবুল করে বুকে করে আঁকড়ে ধরে রেখেছি তাদেরকেও বাঁকা চোখে দেখতে শুরু করেছে—সে আর কেউ নয়, মসুলমান ভেয়েরাই আমার! হায়রে মসুলমান, হায়! আল্লা, এদের সুমতি তুই দে আল্লা, মসুলমানের সুমতি তুই দে'—বলতে বলতে প্রায় হাউ হাউ করে কেঁদে ফেললেন।

আমি বললুম, 'আপনার কাজ শুরু হয়ে গেলেই 'মসুলমানের'ও সুমতি আপনা-আপনিই হবে, কান্নাকাটির কিছু দরকার নেই, ঠেলার

নাম বাবাজী! বিশেষ করে আপনার মতো মৌলবী যখন সেই ঠেলু-গোপাল! তা ইংল্যাণ্ডকে কী ভাবে মুসলমান করবেন? জেহাদ করে?'

হাজীসায়েব ততক্ষণে সুর্মা পরা ভিজে চোখ মুছে নিয়ে ফের জোরে জোরে সুর করে কোরাণ শরীফের সুরা পড়তে শুরু করেছেন।

বললুম, 'না কী সেও পীর সাহেবের কাছ থেকে স্বপ্নে আদেশ হবে?'

মত্তভাবের তখন চরম অবস্থা! কথা কানে গেলে তবে তো উত্তর দেবেন! সুর আরো সপ্তমে চড়ল! বন্ধ দু'চোখ দিয়ে অশ্রুর ধারা গড়াতে শুরু করল।

মানুষের সহ্যের একটা সীমা আছে। সে সীমা ছাপিয়ে যখন ওই গন্‌গনে ফায়ারপ্লেসটার মতোই তেতে উঠতে যাচ্ছি এমন সময় ঠিক যেন দরজা ফুঁড়ে ঝড়ের বেগে ওথেলো ঢুকেই উন্মত্ত দরবেশের মতো ঘরময় বন্‌বন্ করে ঘুরতে লাগল আর বলতে লাগল, 'আপনারা দেখে নেবেন, ঠিক আমি কোন্‌দিন এক ব্যাটা ইংরেজকে খুন করে তার মাথা চিবিয়ে খাবো, কেউ আমায় আটকাতে পারবে না। শূয়োরের মাংস খাওয়া আমার ধর্মে হারাম নয়।'

ব্যারিস্টারী পড়ছে, এক বছর পরেই আইনের লড়াই লড়ে কত অপরাধীকে জেলে পাঠাবে, আর নিজেই আজ খুন করবে বলছে! ব্যাপার কী!

বোগদাদী সায়েব তখন আরো জোরে জোরে সুরা পড়তে শুরু করেছেন। এবং দাঁতভাঙা আরবী উচ্চারণ তখন তাঁর মুখে গলার ভিতর থেকে বিশুদ্ধ থেকে বিশুদ্ধতম হয়ে সারা শেফার্ডস বুশের পিলে চমকে দিচ্ছে!

ওথেলোর চেহারাটা সাধারন নিগ্রোদের চেহারার চেয়ে অনেক সুশ্রী। সাটিনের মতো চকচকে কালো রং। চোখদুটি ঘোর লাল। রাগে সে দুটি লাল চোখ তখন দপদপ করে জ্বলছে নিভছে। গায়ে এক

মস্ত ঢিলে লাল রেশমী ড্রেসিং গাউন। তাতে ইয়া বড় বড় ফুল কাটা। লম্বায় চওড়ায় শাবানও তার কাছে বুড়ো আঙুল! ও'র ওই লাল চোখ দুটোর এমন আশ্চর্য এক সম্মোহনী-শক্তি আছে যে ওকে এড়িয়ে যাবার উপায় তো নেই'ই, বরং ক্রমশ ওর সঙ্গে মন্ত্রমুগ্ধের মত মোহাচ্ছন্ন হয়ে কী রকম একটা নেশার জালে জড়িয়ে পড়তে হয়!

আমরা জাপটে ধরে ফেলে বললুম, 'কী হয়েছে, আপনি হঠাৎ এমন করছেন কেন?'

তবু সে তুর্কী নাচ কী থামে! আমায় আর শাবানকে খড়কুটোর মত গা থেকে ঝেড়ে ফেলে দিয়ে রাগে, উত্তেজনায় লটপটে ড্রেসিং গাউন উড়িয়ে বাঁই বাঁই করে ঘরময় ঘোরে আর বলে 'ঠিক, ঠিক, ঠিক আমি কানো এক ব্যাটা ইংরজের মাথা চিবিয়ে খাবো, শূয়োরের মাংস খাওয়া আমার ধর্মে হারাম নয়।'

একটু পরে হঠাৎ নিজেকে একটু সামলে নিয়ে বোগদাদী সায়েবের পাশেই একটা চেয়ার টেনে বসে পড়ল। কিন্তু রাগে তখনো ফুলছে। সঙ্গে সঙ্গে আল্‌হাজ ফয়জুর আহমদ বোগদাদী ঘর থেকে অদৃশ্য!

শাবান ধীরে ধীরে তার সামনে বসে শুধোলেন, 'কী হয়েছে কী?

ওথেলো চেয়ারে বসে রাগে ফুলতে ফুলতে বলল, 'না, কিছু না।'

হঠাৎ যেন তার মুখ থেকে কিসের একটুখানি গা-মাতানো গন্ধ নাকে এসে ধাক্কা মারল। রাগ আর নেশা একসাথে মিলেচে! তাই এতখানি বেসামাল অবস্থা!

শাবান নাছোড়বান্দা। বললেন, 'না আপনি আমাদের বলুন কী হয়েছে?'

হঠাৎ তার লাল চোখদুটো দপ্‌ করে আবার জ্বলে উঠল। গর্জন করে বলল, 'ঠিক, ঠিক, ঠিক আমি একদিন কোন এক সাদা চামড়া-ব্যাটাকে খুন করে ফেলে তার মাংস চিবিয়ে খেয়ে আমার গায়ের জ্বালা মেটাব।'

শাবান বললেন, 'তা তো বহুবার শুনলুম, কিন্তু কেন? কী হয়েছে?'

ওথেলো বললো, 'কালো চামড়া দেখলেই ব্যাটারা তাকে জন্তু-জানোয়ারের মতো মনে করে। এই এখন বাসে করে বাড়ী আসার সময় একটা মেম জায়গার অভাবে দাঁড়িয়ে আছে দেখে ভদ্রতা করে তাকে জায়গা ছেড়ে দিলুম। মেমটা তো অবাক হয়ে খানিকক্ষণ মুখের দিকে চেয়ে থেকে বসল। তার পরে চেয়ে দেখি সারা বাস শুদ্ধ সায়েব মেম হাঁ করে মুখ চাওয়া চাওয়ি করছে। যেন পূবের সূর্য পশ্চিমে উঠেছে আর কী! ইচ্ছে করছিলো আমার এই থাবার বাড়ি মেরে দিই জানোয়ারগুলোর মুখ চ্যাপটা করে। কেন? ওরা ভাবে কী? চামড়ার কালো রং হলেই সে মানুষ নয়? তার ভদ্রতাজ্ঞান থাকতে পারে না? সর্বাঙ্গে হুল ফোটার জ্বালা নিয়েও তাদের সব অপমান আমাকে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সইতো হলো। বাসে কোন সিটে একটা কালো লোক বসে থাকলে নিতান্ত দায়ে না পড়লে ওরা কিছুতেই তার পাশে বসবে না। বাড়ী ভাড়া নিতে যান, মিথ্যে করে বলবে ভাড়া হয়ে গেছে। অথচ তারপরেও দেখবেন সেই বিজ্ঞাপন ঝুলছেই। মানুষের কালো রংকে ওরা এত ঘেন্না করে। এই সেদিনের সাদায় কালোয় দাঙ্গার কথাটাই ভেবে দেখুন। কালোদের কী অপরাধ? না, তাদের গায়ের রং সাদা নয়। তাই তারা অত্যাচার করবে! বেজ্‌ওয়াটারে আমার মা থাকেন। তাঁকে ওরা দাঙ্গার সময়ে যে ভাবে অপমান করেছে অসভ্য জংলীরাও কোনোদিন কারো উপর তা করতে পারবে না। কী অপরাধ তাঁর? না, রং তাঁর কালো। এরাই আবার গর্ব করে প্রেমের অবতার যীশুর শিষ্য বলে! আসলে এরা সব Devil's desciple. তার পর--'

হঠাৎ সে থেমে গেল।

আমি আর শাবান প্রায় একসঙ্গেই উৎসুক হয়ে বলে উঠলুম, 'কী তার পর?'

লাল চোখ দুটো মেলে একবার আমার দিকে একবার শফিক শাবানের দিকে চেয়ে হেসে উঠে বলল, 'একদিনেই আমার সব খবর বলে দোব!'

বুঝতে পারলুম নেশাটা আরো চড়ছে।

হঠাৎ চেয়ে দেখি তার আগুনের মত জ্বলন্ত চোখদুটো একটু ছলছলিয়ে উঠেছে। কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থেকে বলল, 'তার পর শুনুন তবে। আমি তখন জেরুজালেমে। এক পাদ্রীর মেয়েকে আমি ভীষণ ভালবাসতুম। সাদা চামড়ার মেয়ে হয়েও সে বাস্তবিকই দেবী। তার রূপের বর্ণনা? আমার ভাষায় তা ফুটবে না! বাইবেলে রাজা সলোমনের ভাষায় তার রূপের বর্ণনা আছে—Thy neck is as a tower of ivory ; thine eyes like the fishpool in Heshbon, by the gate of Bath-rabbin ...y nose is as the tower of Lebanon which looketh toword Damascus. আমাদের দু'জনের মধ্যে সব ঠিকঠাক আমাদের বিয়ে হবে। এ কথা ছড়িয়ে পড়ল সেখানকার ইংরেজ সমাজে। তারা কী করল জানেন? সে যখন কিছুতেই শুনবেনা, আমাকে বিয়ে করবেই ; তখন তারা সবাই মিলে তাকে বোঝালো আমি একটা বদ্ধ উন্মাদ! সব জায়গায় রটিয়ে দিল আমি পাগল! সবাই মিলে একজনকে যদি পাগল বলে কে না বিশ্বাস করে! যেখানে যাই আমার পিছনে কুকুর লেলিয়ে দেয়। শেষে জেরুজালেম ছেড়ে আমাকে পালিয়ে আসতে হলো। কী আমার অপরাধ? না, রং আমার কালো! কিন্তু আমি জানি সে তাদের কথা মনে মনে বিশ্বাস করেনি। সে মানুষ নয়, সে দেবী। নিশ্চয়ই সে চিরকুমারী ব্রত নিয়েছে। বিশ্বাস করবেন কি না জানি না, মাঝে মাঝে গভীর রাতে আমি যেন শুনতে পাই, বহু দূর প্রান্তর, সমুদ্র পর্বত পার হয়ে তার করুণ সুর ভেসে আসছে—সে পথে পথে জেরুজালেমের মেয়েদের ডাক দিয়ে সলোমনের গান গেয়ে বলছে, I charge you, O

daughters of Jerusalem, if ye find my beloved, that ye tell him, that I am sick of love!'

তার ছলছলে চোখদুটো আবার দপ্‌ দপ্‌ করে জ্বলতে নিভতে শুরু করল। বলল, 'দিনের পর দিন অপমান, ঘৃণা অবিচার আর অত্যাচার সয়ে সয়ে আমার মনের মধ্যে আগুন জ্বলছে। বহুদিনের এই চাপা আক্রোশের আগুন যেদিন একসাথে ঠেলে বেরোবে, আপনাদের আমি বলে রাখছি, সেদিন সব ব্যাটা সাদা চামড়ার মাংস চিবিয়ে খেয়ে আমি গায়ের জ্বালা মেটাব— শূয়োরের মাংস খাওয়া আমার ধর্মে হারাম নয়। আমাকে ওরা ক্ষেপিয়ে তুলছে।'

আমরা স্তব্ধ হয়ে ফায়ার প্লেসের ধারে বসে রইলুম।

সেদিন সমস্ত রাত তার সেই স্ফুরিত অধরের মৃদু গুঞ্জন আমার দুই কান পূর্ণ করে বাজতে লাগল—Thy neck is as a tower of ivory; thine eyes like the fishpool in Heshbon, by the gate of Bath-rabbin. Thy nose is as the tower of Lebanon which looketh toward Damascus. আর তারি মাঝে মাঝে অনেক সাগর, অনেক মরু পর্বত পার হয়ে দূর জেরুজালেমের এক মেয়ের করুণ কণ্ঠস্বর বারবার ভেসে এলো: I charge you, O daughters of Jerusalem, if ye find my beloved, that ye tell him, that I am sick of love.—ওগো জেরুজালেমের মেয়েরা, বোলো, বোলো যদি তার দেখা পাও তাকে এই কথাটি বলে দিও, আমি তারই প্রেমে পাগল হয়ে আছি।

॥ আটাশ ॥

শাবানের সন্ধানে গিয়ে দেখতে পেলুম দরজা বন্ধ। বড়দার ঘরের দরজা খোলা দেখতে পেয়ে গিয়ে দেখলুম তিনি খাঁচার বাঘের মতন রাগে ফুলতে ফুলতে এদিক ওদিক জোরে জোরে পায়চারি করে বেড়াচ্ছেন।

মুখে পাইপ। কাঁধে ক্যামেরা। কালো বেড়ালটা সোফায় আরাম করে ঘুমোচ্ছে। স্ত্রী নেই। বোধহয় বাইরে গিয়েছেন।

ভয়ে ভয়ে শুধোলুম, 'বড়দা, শফিক শাবান কখন বাইরে গেছেন কিছু জানেন?'

তিনি তেমনি দুমদাম করে পায়চারি করতে করতে পাইপে ঘনঘন কতকগুলো দম দিয়ে রেগেমেগে বললেন, 'না। আমি আর কারো খবর জানি না। কারো খবর রাখি না। আর আমি কারো বড়দা নই। আজ থেকে আমি শুধু নিজের আর আমার স্ত্রীর। ব্যস।'

বলার ধরণ দেখে হাসি পেলো। বহু কষ্টে হাসি সামলে শুধালুম, 'কেন, কী হলো কী?'

'কী হলো সে কথা আবার শুধোচ্ছো! বরং কী হলো না তাই বল? ওই যত চিঠি দেখছ সব তাগাদার।'

চেয়ে দেখলুম ছোট একটা গোল টেবিলের উপর একটা কাগজ-চাপা দিয়ে অন্তত ন'দশটি চিঠি চেপে রাখা আছে। অবাক হয়ে বললুম, 'তাগাদার মানে? কিসের তাগাদা?'

তিনি পায়চারি করতে করতে বললেন, 'কাবুলীর তাগাদা—কাবুলীর।'

ধাঁধা আরো বেড়ে গেল। বললুম, 'কাবুলীর তাগাদা! কে দিচ্ছে?'

মনে হলো যেন সারা শেফার্ডস বুশ কাঁপিয়ে চিৎকার করে বললেন, 'শাইলক—শাইলক। আবার কে? বাঙালী শাইলক।'

সহস করে বললুম, 'আমি কিছুই বুঝতে পারছি না। খুলে বলুন।'

দাঁড়িয়ে পড়ে বললেন, 'খুলে বলব? তুমি বলছ এমন কথা? বোসো তা'হলে।'

হতভম্বের মত একটা সোফায় বসে পড়লুম।

বড়দা সামনে আর একটা সোফায় বসে বললেন, 'মাস খানেক আগে কয়েকদিনের জন্যে একটা বিশেষ কাজে আমায় প্যারিস যেতে হয়েছিল। আমার টাকা হঠাৎ ফুরিয়ে যাওয়ায় ফিরে আসার সময় অমলেন্দু দাশগুপ্ত বলে আমার এক বন্ধুর কাছ থেকে কয়েক হাজার ফ্রাঙ্ক—ধর পাউণ্ড পাঁচেকের মত হবে—ধার নিয়ে এসেছিলুম। মাত্র পাঁচ পাউণ্ডের জন্যে রাতে তার ঘুম হচ্ছে না! এই এক মাস ধরে রোজ তাড়া দিয়ে ডাকে তো চিঠি লিখছেই, উপরন্তু প্রায় প্রত্যেক দিন তাগাদা দিয়ে একজন করে নতুন নতুন মক্কেল পাঠাচ্ছে! লণ্ডনে তার অনেক বন্ধুবান্ধব আছে। এই তুমি আসার একটু আগেই এক মক্কেল চলে গেল! শেষ চিঠিতে কী লিখেছে জানো? শাসিয়েছে এইবার টাকাটা না দিলে কেস করে আদায় করবে!'

বললুম, 'বলেন কী!'

পাইপে গোটাদুই টান দিয়ে বললেন, 'আর বল কেন? মানুষ এক আজব জীব! এর পর কারো জন্যে কিছু করতে ইচ্ছে করে, না, করা উচিত, তুমিই বল?'

আমি চুপ করে রইলুম।

বড়দা বললেন, 'সে এত তাগাদা দিচ্ছে বলেই আমিও ইচ্ছে করে কারো হাতে টাকাটা দিচ্ছি না। আজকে প্যারিসে আমার

আর এক বন্ধুর কাছে চিঠি লিখে দোব সে যেন চিঠি পাওয়ামাত্র দাশগুপ্তকে টাকাটা দিয়ে দেয় আর দিয়ে যেন একটা রশীদ লিখিয়ে নেয়। আমিও তাকে অপমান না করে ছাড়ছি না। চালাকী নয়! অথচ, বুঝলে, হিসেব করলে আমিই দাশগুপ্তর কাছ থেকে বোধহয় শ'খানেক পাউণ্ড পাব। ওর যখন চাকরীবাকরি ছিল না আমার কাছেই থাকত—তা প্রায় মাস তিনেক ছিল। তার পর চাকরী পেয়ে প্যারিসে চলে গেল। তিন মাসে এই লণ্ডন শহরে একটা লোকের পেছনে শত্‌খানেব পাউণ্ড নিশ্চয়ই খরচ হয়েছে। ও যে সাক্ষাৎ শাইলক তা কে জানত!'

তার পর একটু থেমে বললেন, 'এখন যা দেখছি, বুঝলে, অনেক দিন ব্যাবহার না করলে কোন মানুষকেই চেনা যায় না'

আমি বললুম, 'তাই তো চীনে ভাষায় একটা প্রবাদ আছে, ঘোড়াকে চেনা যায় দীর্ঘ পথে আর বন্ধুকে চেনা যায় দীর্ঘ মেলামেশায়।'

বড়দা লাফিয়ে উঠে বললেন, 'তাই না কী? আছে না কী এ রকম একটা প্রবাদ? এ প্রবাদ আমাকে লিখে নিতে হবে। লিখে নিয়ে আমি রোজ দু'বেলা জপ করব। তবু যদি শিক্ষা হয়!'

তার পর ফের পায়চারী করতে করতে পাইপে দম দিতে দিতে বললেন, 'আমার যে অভিজ্ঞতা হয়েছে, তাতে আমি তোমাকে জোর করে বলতে পারি, কোন অবাঙালী এতখানি অকৃতজ্ঞ, এতখানি নীচ কখনোই হতে পারত না। এই বাঙালী জাতটার আজ চতুর্দিক থেকে এত অধঃপতন হয়েছে যে, সে আর বলবার নয়। নীচেয় নামতে নামতে শেষ পর্যন্ত কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে তাই আমি ভাবি! এ জাত মরেছে নিজেদের দোষে! কথাটা শুনতে খারাপ হলেও, এই আমি তোমাকে বলে রাখছি, তুমি দেখে নিও—সবার কাছ থেকে লাথি-জুতো খেতে খেতে শেষ হয়ে যাওয়াই এই বাঙালী জাতটার কপালে লেখা আছে। শুধু নীচতা, অসততা নিয়ে একটা জাত কখনোই টিকে থাকতে পারে না।'

উনি যে রকম উত্তেজিত হয়ে পড়েছেন তাতে তর্ক করা বৃথা। তাই চুপ করে রইলুম। তা ছাড়া উনি কী খুব বেশী ভুল বলেছেন?

বললুম, 'এখন চলি, বড়দা, একটু তাড়া আছে, একবার কিংস ক্রসে যেতে হবে।'

বড়দা চমকে উঠলেন। বললেন, 'কিংস ক্রসে যাবে? একটু সাবধান থেকো। কিংস ক্রস লণ্ডনের বড় খারাপ জায়গা—যত রাজ্যের টেডি ছেলেমেয়েদের আড্ডা।'

বললুম, 'বলেন কী? কিংস ক্রস নাম—কোথায় সব রাজাটাজাদের আড্ডা হবে,—তা নয়, টেডিদের ভীড়!'

বড়দা হাসলেন।

সিঁড়ির মুখে দেখা হয়ে গেল ওথেলোর সঙ্গে। মুখোমুখি পড়ে গিয়ে একটু লজ্জা পেয়ে বলল, 'কাল আমি রাগের মাথায় আর নেশার ঘোরে অনেক কিছু বলে ফেলেছি। কালকের অস্বাভাবিক আচরনের জন্যে আমি বড় লজ্জিত। সত্যি বলছি, রাগে আমার মাথার ঠিক ছিল না।'

তার লজ্জা কাটিয়ে দেবার জন্যে ইচ্ছে করেই বললুম, 'কাল আপনি কী বলেছেন, কী করেছেন আমি একদম ভুলে গিয়েছি। কোথায় চলেছেন?'

বলল, 'চলুন, যাবেন না কী?'

অবাক হয়ে বললুম, 'কোথায়?'

সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে বলল, 'ভিক্টোরিয়া ষ্টেশনে।'

'হঠাৎ ষ্টেশনে কেন?'

'আমার এক বন্ধু রায় আর তার স্ত্রী জয়া আজ প্যারিস থেকে আসছে। তাদেরকে রিসিভ করতে যাচ্ছি।'

আমি অত্যন্ত আশ্চর্য হয়ে তার মুখের দিকে চেয়ে থেকে বললুম, 'আপনি রায় আর জয়াকে চিনলেন কী করে ?'

ওথেলো আমার দিকে আরো অবাক হয়ে লাল চোখদুটো মেলে বলল, 'আপনি রায় আর জয়াকে চেনেন না কী ?'

বললুম, 'চিনি না ! আমরা এক জাহাজে এসেছিলুম।'

ততক্ষণে আমরা রাস্তায় নেমে এসেছি।

ওথেলো বলল, 'তাই না কী !'

'আপনি চিনলেন কী করে ?'

'ওরা যেদিন প্যারিসে পৌছয় আমিও সেইদিনই প্যারিসে বেড়াতে গিয়ে ওই একই হোটেলে উঠেছিলুম। আমি মাত্র চার দিন প্যারিসে ছিলুম।'

আমি আশ্চর্য হয়ে বললুম, 'ও।'

ওথেলো বলল, 'রায়কে সত্যি সত্যিই খুব লাকি বলতে হবে। জয়ার মতো মেয়ে কে খুঁজে পায় !'

বললুম, 'তা ঠিক।'

'সত্যি বলছি রায়ের উপর আমার হিংসা হয় !'

আমি হাসলুম।

ওথেলো বলল, 'আমি ওদের বিয়ের একজন সাক্ষী, চালাকী নয় !'

'তাই না কী ?'

'হ্যাঁ। প্যারিসে পৌছনোর তিনদিনের দিন ওদের বিয়ে হয়।' তার পর কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থেকে বলল, 'ওদের সঙ্গে আলাপটা অবশ্য আমিই গায়ে পড়ে করেছিলুম। কেন জানেন ? আপনি বলেই বলছি---আপনি হয়তো বিশ্বাস করবেন, কারন আপনি নিজের চোখে জয়াকে দেখেছেন। হোটেলে পা দিয়েই রায়ের পাশে ওকে দেখে আমি থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছিলুম। আমার মনে হলো প্যারিসে পৌছে আমি যেন সম্পূর্ণ একটা নতুন জিনিষ—যেন পৃথিবীর অষ্টম

আশ্চর্যকে চোখে দেখলুম। আপনিই বলুন, একটুও বাড়িয়ে বলছি? তাই মনে হয় না?'

আমি একটু হেসে বললুম, 'হ্যাঁ।'

ওথেলো বলল, 'বাস্তবিক, অদ্ভুৎ মেয়ে! এ রকম মেয়ে আমি জীবনে দেখিনি! ও মেয়ে কারো চোখে পড়বে না, ও মেয়েকে দেখে আকৃষ্ট হবে না এমন লোক পৃথিবীতে নেই! অথচ ওকে রূপসী বললেও ভুল হবে। তবু ওর মধ্যে কী আছে বলুন তো?'

বললুম, 'সেইটেই তো আমিও আজ পর্যন্ত বুঝতে পারলুম না!'

ওথেলো বলল, 'এক রহস্যময়ী মেয়ে! কথাবার্তাও বলে না, মেলামেশাও কারো সঙ্গে করে না, তবু যেন দূর থেকেই ও মেয়ে মানুষকে একেবারে যাদু করে ফেলে—তাই না?'

বললুম, 'হ্যাঁ।' তার পর বললুম, 'কিন্তু আজকেই ওরা আসছে কেন? ওরা আমায় একটা চিঠিতে লিখেছিল দশ তারিখে আসবে।'

'আমাকেও তো আগে তাই লিখেছিল। কিন্তু কাল মাঝরাতে ওদের টেলিগ্রাম পেয়েছি আজকে এখন আসবে।'

'ও। ও'রা উঠবে কোথায়?'

'ওয়ারউইক এ্যাভিন্যুতে ওদের জন্যে একটা কামরা ঠিক করে রেখেছি। ওরা আমাকে ঘরের জন্যে আগে লিখেছিল।'

'ও।'

'চলুন, ষ্টেশনে যাবেন?'

'যেতে পারলে খুবই খুশী হতুম, কিন্তু আমার এখন একদম সময় হবে না। আমায় এখন একবার কিংস ক্রস আর লিভারপুল ষ্ট্রীটে যেতেই হবে। বিশেষ কাজ আছে। রায় আর জয়াকে বলে দেবেন আপনার মুখে খবর পেয়েও আমি ষ্টেশনে গেলুম না বলে ওরা যেন রাগ না করে।'

'আচ্ছা।'

॥ উনত্রিশ ॥

সবেমাত্র দুধের বোতলের লাল টুপিটা খুলে ফেলে চুমুক দিতে যাচ্ছি, এমন সময় হাজির শাফিক শাবান।

আজ আমাদের টেটে যাবার কথা।

এসেই ভিজে কোটটা খুলতে খুলতে বললেন, 'আপনার জন্যে একটা তোফা সন্দেশ নিয়ে এসেছি—একবার খেলে আর জীবনেও ভুলতে পারবেন না।'

'দিল্লীকা লাড্ডু নয় তো ? শেষে পস্তে মরব না তো ?'

'আরে না—না।' তার পর অসাড় হাত দুটোকে হীটারে তাতিয়ে নিতে নিতে বললেন, 'পাখি উড়ে গেছে।'

'কোন পাখি ?'

'মওলানা আল্‌হাজ্ ফয়জুর আহমদ বোগদাদী !'

'তার মানে ?'

'আর বলেন কেন ! ওথেলো বলছিল কাল মাঝরাতে বোগদাদি সায়েব না কী মদে টং হয়ে বাড়ী ফিরে এসে ভীষণ হৈ-হট্টোগোল করছিলেন। ওথেলোর কামরাটা মওলানের পাশেই তো ! তা'তে অনেকেরই ঘুম ভেঙে যায়। সবাই জানত মোল্লামৌলবী হাজী মানুষ, ও সব রোগ বোধহয় নেই। কিন্তু অনেকেই জেনে ফেলেছে, কারো কাছে আর মুখ দেখাবার উপায় নেই, সবাই মিলে গায়ে থুতু দেবে, তাই আজ ভোর বেলায় কেউ ওঠবার আগেই শেফার্ডস বুশের খাঁচা ছেড়ে তস্‌বি জায়নামাজ গুটিয়ে আর কোন খাঁচায় চম্পট দিয়েছেন !'

'বলেন কী !!' থ হয়ে বসে রইলুম।

শফিক শাবান বললেন, 'মওলানার এই পালানো নিয়ে আমাদের শেফার্ডস বুশের খাঁচা আজ সকাল থেকে একেবারে সরগরম। হৈ হৈ ব্যাপার! সব্বাই অবাক। আমাদের খাঁচার আর এক পার্শী চিড়িয়ার মুখে—আজই তার সঙ্গে আলাপ হলো, এ্যাদ্দিন শুধু মুখ চেনাচিনি ছিল—মওলানা সম্পর্কে আরো কী শুনলুম জানেন? ওর আর এক পার্শী বন্ধু আর বোগদাদী একই জাহাজে এসেছিলেন। সে এক লণ্ডন শহরের একজন ঝানু জহুরী। বহুবার এসেছে, থেকেছে, ফিরে গেছে। সেই বন্ধু ওকে বলেছে তার কাছে না কী জাহাজেই মওলানা সায়েব কায়দা করে লণ্ডনের বিশেষ পাড়াটাড়া সব কোন্‌দিকে জেনে নিয়েছিলেন! বুঝলেন তো?'

'তা আর বুঝলুম না! কিন্তু এমন করে যে, বোগদাদীর খোলসটা খসে গিয়ে আসল চেহারা বেরিয়ে পড়বে ভাবতেও পারিনি!'

শফিক শাবান বাঁশিতে দু'একটা এলোমেলো সুর তুলে তার পর বললেন, 'একদিন সন্ধ্যায় বাগদাদের পথে চলেছিলুম; রঙীন মসজিদের সোনালী মিনারের আড়াল থেকে ঈদের চাঁদ উঁকি দিচ্ছে। আর বুড়ো মুয়াজ্জিন কাঁপা গলায় আজান হাঁকছেন। পাশেই ছিল এক কুমোরের দোকান। আজান শুনে কুমোর হন্তদন্ত হয়ে মসজিদের পানে ছুটে যেতেই মস্ত কালো আবা পরা শকুনের মত এক শেখ তার গলা চেপে ধরে বলল, এই ব্যাটা মদ খেয়ে তুই মসজিদে যাচ্ছিস? বুড়ো কুমোর তাকে হাফেজের কবিতা শুনিয়ে দিল,

অখ্যাতি হবে? অখ্যাতিতেই বেজে গেছে
মোর নাম;
নাম যাবে? যাক, নামই আমার
সব লজ্জার ধাম;
মত্ত, মাতাল, ব্যসনী আমি গো
আমি কটাক্ষ-বীর,

একা আমি নই, আমারি মতন
অনেকেই নগরীর।
মোল্লার কাছে মোর বিরুদ্ধে
করিও না অনুযোগ,
তাঁর আছে, হায়, আমারি মতন
সুরা-মত্ততা রোগ।*

বললে বিশ্বাস করবেন কিনা জানি না, কিন্তু একটুও রং ফলিয়ে বলছি না—পাশ দিয়ে মসজিদে ঢুকতে যাচ্ছিল লম্বা জোব্বা পরা, মাথায় তারবুশের চারিদিকে সোনালী পাগড়ী বাঁধা গম্ভীর মূর্তি এক বুড়ো মুফ্‌তি। কুমোয়ের মুখে ওই কবিতা শুনে সে আর মসজিদে না ঢুকে আড়চোখে একবার ভয়ঙ্কর শেখের দিকে চেয়ে চুপিচুপি অন্যপথে পালিয়ে গেল! আমি তো দূর থেকে তার কাণ্ড দেখে অবাক! সে ভাবল কুমোর বোধহয় তাকেই ইঙ্গিত করছে! চোরের মন তো! সেই এক মুফতিকে দেখেছিলুম আর এই এক মোল্লা দেখলুম,—একেবারে পয়সার এপিঠ ওপিঠ!'

তাড়াতাড়ি তৈরী হয়ে নিয়ে বেরিয়ে পড়লুম।

পথ চলতে চলতে বললুম, 'ও হ্যাঁ—ভালো কথা মনে পড়েছে। রায় আর জয়া পরশুদিন লণ্ডনে এসেছে, আপনি শুনেছেন?'

শফিক শাবান বললেন, 'তাই না কী? কই না তো!'

আমি বললুম, 'প্যারিসে পৌঁছেই ওরা চতুষ্পাদ হয়ে গিয়েছে!'

সঙ্গে সঙ্গে রাস্তার সায়েব, মেমগুলোকে চমকে দিয়ে শফিক শাবান এমন জোরে হেসে উঠলেন যে, মনে হলো সে হাসি চেশাম প্লেস,

* সত্যেন দত্তের অনুবাদ।

লাউণ্ডস স্কোয়ারে টক্কর খেয়ে হাইড পার্ক পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ল। তার পর শুধোলেন, 'আপনার সঙ্গে ওদের দেখা হয়েছে?'

বললুম, 'না, সময়ের অভাবে এখনো দেখা করে উঠতে পারিনি।'

শাবান বললেন, 'বলেন কী! আপনি তো আচ্ছা বেরসিক লোক দেখতে পাচ্ছি! জয়ার মতন ও রকম একটা দেখার জিনিষ লণ্ডনে আসা সত্ত্বেও এখনো দেখে আসেননি! আমি আগে জানলে তো সব কাজ ফেলে দিয়ে এরি মধ্যে দু'বেলা গিয়ে জয়াকে দেখে আসতুম! অন্যের স্ত্রীর সৌন্দর্য নিয়ে আলোচনা করতে কিম্বা দেখতে তো আর কোনো বাধা নেই!'

হাইড-পার্ক কর্ণারে আসতেই চোখে পড়ে গেলুম মরগান, দি ভাইকিং-এর।

দেখেই হাতে তুলে বলল, 'কেমন আছেন স্যাইর? অনেকদিন দেখিনি স্যাইর। ভালো তো স্যাইর? যা শীত পড়েছে স্যাইর, এতে কী কারো শরীর ভালো থাকতে পারে স্যাইর? আমারো ভীষণ সর্দি-কাশি ধরেছে স্যাইর। আর ক'দিন পরেই বরফ পড়তে শুরু হবে স্যাইর, রাস্তাঘাট সব বরফে ঢাকা পড়ে যাবে। শীতকালটা ভাবছি কেণ্টে গিয়ে কাটিয়ে আসব স্যাইর। এখানে আর ভালো লাগছে না স্যাইর।'

শাবান বললেন, 'কেণ্টে কেন?'

'কেণ্টে আমার দেশ স্যাইর। কেউ নেই স্যাইর, তবু দেশের টান, বোঝেন তো স্যাইর। গাঁয়ের লোকেরা সবাই জানে স্যাইর, তাদেরই কারো বাড়ীতে শীতকালটা কাটিয়ে আসব স্যাইর।'

শাবান বললেন, 'আমাদের একবার কেণ্টে যাবার ইচ্ছে আছে।'

খুশীতে গলে গিয়ে বলল, 'সে বড় খুশীর কথা হবে স্যাইর। ভারি সুন্দর জায়গা স্যাইর, নিশ্চই আপনাদের ভালো লাগবে স্যাইর। ঠিক একবার আসবেন স্যাইর।'

তার পর কাব্য-রসে রসিয়ে রসিয়ে যা বলল তা গুছিয়ে লিখলে এই রকম দাঁড়ায় যে, আপনারা আসবেন একবার আমার দেশে, তবে এখন নয়, এখন শীত এসে পড়েছে, গাছের সব পাতা ঝরে গেছে, দু'দিন পরেই বরফে সব ঢাকা পড়ে যাবে। শীতকালটা যাক—আসবেন গ্রীষ্মে। আহা! সবুজে, নীলে, সোনালীতে, লালে মিশে তখন যা রূপ হয় সে আর কী বলব! হঠাৎ একদিন সকালে উঠে শুনবেন, কোথায় কোন্ গাছের শাখায় ঘন পাতার মাঝখানে বসে নাইটিঙ্গেল গান জুড়ে দিয়েছে; স্কাইলার্ক মনের আনন্দে গান গাইতে গাইতে সোজা আকাশে উঠছে আর নীচেয় নামছে। গান গেয়ে গেয়ে রঙিন রেডব্রেষ্টের বুক লালে লাল হয়ে গেল। মেঘ আর কুয়াশার ঘোমটা ছিঁড়ে ফেলে কতদিন পরে নীল আকাশ থেকে চারিদিকে সোনার আলো ছড়িয়ে পড়ে এক রকম মধুর নেশা ঘনিয়ে ধরেছে। বাগানের দিকে চেয়ে দেখুন সবুজ পাতার আড়ালে আড়ালে আপেলের গাল ফেটে রক্ত ঝরছে; প্লামের মুখে কে সিঁদুর মাখিয়ে দিয়েছে; চেরী দুই গালে রঙ মেখে উঁকি দিচ্ছে; পিয়ার সোনালী মুকুট পরে হাওয়ায় দুলছে; আঙুর সোনার পাতার ফাঁকে ফাঁকে বেগুনী রেশম, ভেলভেট্ জড়িয়ে লুকোচুরি খেলছে; নেক্‌টর লজ্জায় লাল হয়ে উঠেছে। তাদের সব রঙের বাহার দেখে দেখে প্রচণ্ড গোলাপী মখমল পরে নিল। টিউলিপ আর ডেফোডিলের মুখে হাসি আর ধরছে না। আমি সে সময় গাঁয়ে না থাকলে কী হবে? গাঁয়ের লোকেরা আমায় সবাই চেনে, আমার নাম বললেই তারা আপনাদের খুব খাতির যত্ন করবে। আমার গাঁয়ের সরল লোকেরা লণ্ডনের লোকেদের মতন এমন কঠিন, এমন স্বার্থপর নয়।

আমরা বললুম, 'আচ্ছা, আচ্ছা, গ্রীষ্মকালটা আমরা কেন্টে তোমার গাঁয়ে গিয়েই কাটিয়ে আসব।'

একটু হেসে একটু লজ্জায় লাল হয়ে একটু ইতস্তত করে হাত

ত্তুটোকে জোরে জোরে ঘষতে ঘষতে বলল, 'একটা কথা বলব স্তাইর ?'

আমরা একটু অবাক হয়ে বললুম, 'কী ?'

লজ্জায় লাল টকটকে হয়ে বলল, 'হেঁ, হেঁ, এমন কিছু নয় স্তাইর। আমি স্তাইর ভিখিরী হতে পারি স্তাইর, কিন্তু স্তাইর আমি কখনো কারো কাছে কিছু চাইনি স্তাইব। আজ আপনাদের কাছে একটা জিনিষ চাইব স্তাইর, দেবেন স্তাইর ?'

শাবান বললেন, 'কী ?'

হাতত্তুটো তেমনি ঘষতে ঘষতে বলল, 'আমাকে এক পাউণ্ড দেবেন স্তাইর ? গাঁয়ে এক বুড়ী আছে, তার কেউ নেই স্তাইর, বড় গরীব স্তাইর। এইবার আসার সময় আমাকে বলে দিয়েছিল স্তাইর, শীতের মুখে গাঁয়ে যাবার সময় লণ্ডন থেকে তার জন্যে একটা কম্বল কিনে নিয়ে যেতে স্তাইর। নিজে না খেয়ে স্তাইর, তার কম্বল কেনার জন্যে এ্যাদ্দিন ধরে পয়সা জমিয়েছি স্তাইর, কিন্তু তবু এক পাউণ্ড কম পড়ে গেছে স্তাইর। এক পাউণ্ড পেলে তার জন্যে একটা কম্বল কিনে নিয়ে যাব স্তাইর।'

শফিক শাবান সঙ্গে সঙ্গে তাকে এক পাউণ্ড বার করে দিলেন।

আনন্দে, কৃতজ্ঞতায় মরগান, দি ভাইকিং প্রায় কেঁদে ফেলে বলল, 'বুড়ী খুব খুশী হবে স্তাইর। শীতে তার ভারি কষ্ট স্তাইর। দাঁড়ান স্তাইর, আমি আপনাদের মাউথ অরগান বাজিয়ে শোনাচ্ছি স্তাইর।'

শাবান তাড়াতাড়ি বাধা দিয়ে বললেন, 'না, আজ থাক, অন্যদিন শুনব।'

আমরা ফের পায়ে পাখা বাঁধলুম।

একটু এগিয়ে এসে শফিক শাবান বললেন, 'মনে হলো ব্যাপার সুবিধের নয়, মরগান, দি ভাইকিং বোধ হয় সেই বুড়ীর সঙ্গে ফেঁসে আছেন! তারই টানে টানে বোধহয় এখনো গাঁয়ে যায়! নইলে গাঁয়ের টানটা আসলে কিছু নয়!'

বললুম, 'হতেও পারে! বুড়ী কিনা তাই বা কে জানে!'

শফিক শাবান হেসে উঠলেন।

সবুজ গ্রান পার্ক, দেখি রাতারাতি লাল হয়ে উঠেছে। ঘাসের মখমল তেমনি সবুজ আছে বটে, কিন্তু বড় বড় গাছগুলোর পাতা সব ঝরে যাবার আগে লাল্‌চে হয়ে উঠে মনের আনন্দে হাওয়ায় দুলছে। দেখে মনে হয় যেন ক্ষ্যাপা বাউলের দল একতারা হাতে নিয়ে ভয়ঙ্কর নাচের তালে মেতে উঠেছে—সে নাচের তালে বারবার তাদের রুক্ষ বাবরী চুল মুখ ঢেকে দিচ্ছে, লটপটে গেরুয়া আলখেল্লা হাওয়ায় উড়ছে।

টেম্‌সের ধারে আসতেই মেঘের বুক চিরে এক ঝাঁক আলোর তীর এসে পড়ল প্রকাণ্ড পার্লামেণ্ট হাউসের সরু সরু সোনালী, কালো চূড়াগুলোর উপর।

মুগ্ধ হয়ে তাই দেখছি, কানে এলো সেনের গলা, 'কোথায় চলেছেন?'

আমরা বললুম, 'টেট। আপনি?'

'আর বলবেন না, কোথায় নয়? সারা লণ্ডনে এখন ইয়ে, মানে কাবুলী নাচ নেচে বেড়াতে হচ্ছে। একটা চাকরী না হলেই চলছে না।'

আমি বললুম, 'কেন, বড়দা যে কোন্ একটা রেস্তোরায় আপনার চাকরী ঠিক করে দিলেন?'

'ঠিক সময়ে পৌঁছতে পারলুম না বলে সে ইয়েটা হলো না। অন্য একজন পেয়ে গেল। আচ্ছা, চলি, দেরী হয়ে যাচ্ছে। খবর সব বেশ ইয়ে তো?' বলেই মহাব্যস্ত হয়ে খানিকটা এগিয়ে গিয়েই আবার ছুটতে ছুটতে এসে বলল, 'আপনাদের দু'জনের মধ্যে কেউ আমাকে পাঁচ শিলিং ধার দিতে পারবেন? ড্রাফ্‌ট্ এলেই দিয়ে দোব। কাল পরশুই ড্রাফ্‌ট্ এসে পড়বে।'

আমিও আগেই বলেছি, তা ছাড়া এ কথা সবাই জানেন, টেট্ গ্যালারীতে আধুনিক শিল্পীদের রকমারি ওস্তাদীর মারপ্যাঁচের নমুনাই

বেশী—শুধু কয়েকজন পুরনো ইংরেজ শিল্পী এই বিদ্রোহীদের মাঝে পড়ে গিয়ে বেশ সুবিধা মনে করছেন বলে মনে হয় না।

শাবান খানিক ঘোরাঘুরি করে ছবি দেখে বললেন, 'ব্যাপার বেশ সুবিধের মনে হচ্ছে না। রকমারি ওস্তাদীর ঘোর-প্যাঁচে পড়ে গিয়ে মাথাটা যেন কেমন করছে ; আর বেশীক্ষণ থাকলে পাগলা গারদে যেতে হবে। আমাদের জন্যে ন্যাশানাল আর্ট গ্যালারীই ভালো। চলুন বেরিয়ে যাই।'

তাড়াতাড়ি বললুম, 'আরে চুপ, চুপ—দেখছেন না চাদ্দিকে সব বিজ্ঞ সায়েব মেমরা শুধু চোখ দিয়েই দেখছেন না, কী রকম হাঁ করে সব গিলছেন—যদিও জানি ভিতরে ভিতরে হজমটা ঠিক হচ্ছে না—এঁরা সব শুনতে পেলে বলবেন কী ?'

শাবান হেসে বললেন, 'শুনুন একটা মজার গল্প। দামাস্কাসের বাজারে এক পাগল ছিল। একদিন আমরা এক কার্পেটওয়ালার দোকানে বসে পশমে রেশমে বোনা সব কার্পেট দেখছি, এমন সময় সেই পাগলা এসে হাজির। মাথায় লাল, সবুজ, বেগ্‌নী কাপড়ের তিনটে টুপি পরেছে। তার মধ্যে সবুজ আর বেগনী টুপি দুটো একটার উপর একটা পরেছে। আর লালটাকে সবার উপরে বাটির মত করে উল্টে বসিয়ে রেখেছে। মুখে সাদা, লাল সব রং মেখে সং সেজেছে। গায়ে এক রেশমী জোব্বা। তার উপর পরেছে মেয়েদের একটা রঙীন ফ্রক। এসেই বলল, বল্ দিকিনি তোরা, আমি কী সেজেছি ? কেউ বলল, তুই রাজা সেজেছিস। কেউ বলল, তুই সং সেজেছিস। কেউ বলল, তুই ভূত সেজেছিস। কেউ বলল, তুই ফকির সেজেছিস। কেউ বলল, তুই যাদুকর সেজেছিস। সে আমাদের সবাইকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে বলল, দূর বোকা কোথাকার ! কেউ বলতে পারলিনি ? আসলে আমি হুঁকো সেজেছি ! বুঝলেন তো ?'

বললুম 'তা আর বুঝলুম না ! কিন্তু এই সব কারণের কারণরা এখন

এখানে থাকলে যে আপনার খোঁচার ঘায়ে খেপে উঠে আপনাকে গুঁতিয়ে শেষ করে দিত!'

শাবান বললেন, 'বলেন কী, ওনাদের সব শিং আছে! তাই বলুন!'

টেট থেকে বেরিয়ে কী একটা খবরের জন্যে শাবানের একটা খবরে কাগজের দরকার পড়ল। খানিক দূর এসেই চোখে পড়ল রাস্তার ধারে ছোট একটা টেবিলের উপর খবরের কাগজ সাজিয়ে রাখা আছে, কাগজওয়ালার পাত্তা নেই। যে যার দরকার মতো পথ চলতে চলতে কাগজ তুলে নিচ্ছে আর পেনি সব জমা হচ্ছে টেবিলেরই এক পাশে। কাগজওয়ালা নেই দেখে পয়সা না দিয়ে কেউ কাগজ নিয়ে নেবে বা কিছু পয়সা সরিয়ে ফেলবে—আমাদের মতো এ ধরনের অতি সুসভ্যতা এরা আজো রপ্ত করে উঠতে পারেনি।

তার পর গেলুম এক দোকানে কিছু স্যাণ্ডউইচ, কেকটেক কিনে নিয়ে কোনো একটা বাগানে বসে দুপুরের খাওয়াটা খেয়ে নোব বলে। সেখানে সায়েবমেমের লম্বা লাইন। সব একেবারে কলের পুতুলের মতো দাঁড়িয়ে আছে। তাড়াহুড়ো নেই। গোলমাল নেই। আমরাও দাঁড়ালুম।

লাইন ছাড়া কোথাও কিছু নেই। আর, পরে এসে এ'র মাথা ডিঙিয়ে, তার বগল গলে আগে চলে যাবে, কাড়াকাড়ি করবে, হুলুস্থূল বাধাবে;—আমাদের মতো এত সভ্য এরা এই বিংশ শতাব্দীতেও হতে পারেনি।

এমন দোকানও অনেক আছে, যেখানে আলমারী থেকে দরকার মতো জিনিষ নিজেই বেছে বের করে নিয়ে তার পর ক্যাশিয়ারকে গিয়ে দাম দিতে হবে। সে বসে আছে সেই এক কোণে।

এই সুযোগে দাম না দিয়ে জিনিষ নিয়ে কেউ দোকান থেকে কেটে

পড়বে—আমাদের মতো এতখানি নৈতিক উন্নতি হ'তে এ'দের এখনো অনেক দেরী।

বাগানে বসে খেয়ে নিয়ে গেলুম চেরিংক্রশ রোডে এক বিখ্যাত সেকেণ্ডহ্যাণ্ড বইয়ের দোকানে—শাবান কতকগুলো ছবির বই কিনবেন বলে।

প্রকাণ্ড দোকানের বাইরে ভিতরে সব বই থরে থরে সাজানো। কেউ পাহারায় নেই। খদ্দেরদের কী অসম্ভব ভীড়। ভিতরে বাইরে সবাই টেবিল থেকে, র‍্যাক থেকে বই বাছতে ব্যস্ত। রঙীন রঙীন সায়েবমেমরা সব যে যার ইচ্ছে মতো বই বেছে নিয়ে ক্যাশিয়ারকে গিয়ে দাম দিয়ে আসছে। সেই এক কোণে বসা ক্যাশিয়ার যে বিরাট বিরাট অসংখ্য র‍্যাক আর লোকের ভীড়ে কোথায় আড়াল পড়ে গিয়েছে দেখাও যাচ্ছে না।

তার মাঝে অবাক হয়ে দেখি, সেই সুযোগে চাঁদমুখো এক উজ্জল-শ্যাম-নন্দন মহাফুর্তিতে হাত সাফায়ের খেল্ শুরু করে দিয়েছে! ঢেঁকি স্বর্গে গিয়েও ধান ভানে—কথাটা দেখছি ভুল নয়!

র‍্যাক থেকে বই নামাচ্ছে, তার পর একবার এদিক চাইছে, একবার ওদিক চাইছে, আর তার পরেই নিমেষের মধ্যে সে বই ওভারকোটের গভীর পকেটে নয়তো হাতের নীলরঙের স্কাফ্‌টার ভিতরে অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে! একসময় সবার নাকের উপর দিয়ে ভীষণ গম্ভীর হয়ে বেরিয়ে গেল। যেন একখানাও মনের মতো বই খুঁজে পায়নি, এতক্ষণ খোঁজা-খুঁজিটাই সার হলো—এমনি ভাবখান!

আমরা অনেক দূর এগিয়ে গিয়েছি, আমাদের আর ভাবনা নেই! কে বলে 'বিশ্ব যখন এগিয়ে চলেছে আমরা তখনো বসে?' বরং আমরা যখন এগিয়ে চলেছি বিশ্ব তখনো বসে!

'গুণতিতে মোরা বেড়ে চলিয়াছি গোরু ছাগলের মতো?'

না, তাও নয়!

নজরুল ভুল!

বই কিনে শাবান বললেন, 'আপনি এখন কোনদিকে যাবেন?'

'আমি একটু হে-মার্কেটে যাব। তার পর যাব ওয়াটারলু স্ট্রীট। আপনি?'

'আমি যাব এজেনবে রোড। সে এখান থেকে বহু দূর।'

'আপনি তাহলে যান, আমি চলি।'

'আচ্ছা।'

আমি বাসে চাপলুম।

পিকাডিলির মোড়ে এসে বাস থেকে একবার চকিতের জন্যে দেখতে পেলুম একটা দোকান থেকে একসঙ্গে বেরিয়ে আসছে ওথেলো আর জয়া! বোধহয় দোকানে ওদের হঠাৎ দেখা হয়ে গিয়েছে।

॥ তিরিশ ॥

কথা ছিল আমি শাবান আর ওথেলো সন্ধ্যেবেলায় জয়াদের ওখানে যাব।

শাবানের শরীরটা হঠাৎ অত্যন্ত খারাপ হয়ে পড়ায় যেতে পারলেন না। আমি আর ওথেলো গেলুম।

বিয়ের পর ছেলেমেয়ে—বিশেষ করে মেয়েরা—যেন আরো বেশী প্রস্ফুটিত, আরো বেশী ঝলমলে হয়ে ওঠে।

তাই কাছ থেকে প্রথম দর্শনেই চোখে পড়ল 'এশিয়া'র সেই আঁটসাঁট, লম্বা ছিপছিপে উজ্জ্বল জয়া লণ্ডনে যেন আরো বেশী প্রস্ফুটিত, ঝলমলে হয়ে উঠেছে। যেন ছিল একটা কুঁড়ি, হয়ে গেল একটা ফুল। তা হয়েছে বটে, কিন্তু সেই রহস্যময় গাম্ভীর্য আছেই।

কালো কালো গভীর চোখদুটিতে এমন চমৎকার একটুখানি স্নিগ্ধ গর্ব ঘনিয়ে উঠেছে—যা অন্যকে আঘাত তো দেয়ই না, বরং মুগ্ধ করে। আর কারো মুখে এ রকম মধুর গর্ব আমি কখনো দেখিনি। কথা প্রায় বলেই না, এত গাম্ভীর্য এবং গর্ব, অথচ স্বভাবটি যেন আরো বেশী মিষ্টি হয়ে উঠেছে।

সাজসজ্জার একটুও বদল হয়নি। সেই দিনের সোনালী বসন আর রাত্রির ঘন নীল, মাথার মাঝখানে সেই চুল উল্টে চূড়ার মত করে বাঁধা মস্ত খোঁপা; গর্বিত মুখে মোনালিসার হাসির মতন একটুখানি আবছা রহস্যের আভা—যা দেখে মনে হয় কাছে থেকেও সে অনেক দূরে, ধরা ছোঁয়ার বাইরে, সব ঠিক তেমনিই আছে।

শাবান একদিন জাহাজে জয়ার নাম দিয়েছিলেন 'পাতার আড়ালে

ফোটা ব্ল্যাক প্রিন্স গোলাপ।' ঠিকই—কালো গোলাপ তো কালো গোলাপই!

বাংলাদেশের এই উজ্জ্বল কালো মেয়েকে দেখে আবার আমার অনেকদিন পরে মনে পড়ে গেল শ্রাবণের স্নিগ্ধ শ্যাম মেঘের কথা।

জয়া আমাদের চা এনে দিল। এক খণ্ড হীরেকে নড়ালে যেমন আলো খেলা করতে থাকে, তেমনি তার প্রতিটি নড়ায় চড়ায় যেন তার ছিপছিপে লম্বা কালো দেহটি দিয়ে আলো ঠিকরে পড়ছে বলে আমার মনে হলো। কালো মেয়ের এত আলো সত্যিই দেখা যায় না।

সকলের কাপে চা ঢেলে দিয়ে রায়ের পাশে একটা সোফায় বসল। সগর্বে ঘাড়খানি তুলে যেন রাজরাণী বসলেন। একটা সিংহাসন হলেই যেন মানাতো ভালো।

রায় কাপে একটা চুমুক দিয়ে আমার দিকে চেয়ে বলল, 'মাত্র এই ক'দিনেই আমার জীবনে অনেক বদল হয়ে গেছে। রীতিমতো বিপ্লব বলতে পারেন। বিয়ে করেছি। খৃস্টান হয়ে গেছি।'

আপনাআপনি আমার মুখ থেকে অস্ফুটে বেরিয়ে গেল, 'এ্যা!'

রায় বলল, 'কেন, খৃস্টান হয়ে গেছি শুনেলো আপনাকে বলেনি?'

মাথা নেড়ে বললুম, 'কই, না তো!'

রায় জয়ার দিকে চেয়ে বলল, 'জয়ার জন্যেই খৃস্টান হয়ে গেলুম। জয়া বলল।'

লজ্জা পেয়ে জয়ার সারা মুখে একটুখানি হাসি ফুটে উঠল। মৃদু গোলাপি হাসির আভাটি, কিন্তু মনে হলো তার কোলের উপর যেন এক মুঠো গোলাপের পাপড়ী ঝরে পড়েছে।

জয়া খৃষ্টান জানতুম না তো! আমি অবাক হয়ে তার মুখের দিকে তাকালুম।

রায় বলল, 'ভালোবাসলে সবই করা যায়। আমি আর কী করেছি! ভালোবেসে এর চেয়েও অনেক বেশী পাগলামী অনেক লোক করেছে।'

আমরা চুপ।

জয়া লাল।

রায় বলল, 'আমরা যেদিন প্যারিসে পৌঁছই তার পরদিনই আমি খৃষ্টান হয়ে যাই। জাহাজেই আমাদের ঠিক হয়ে ছিল। তার পরদিনই আমরা বিয়ে করি!'

জয়া মুখে কিছু বলল না, কিন্তু পরিষ্কার বোঝা গেল এ সব কথায় সে লজ্জা পাচ্ছে।

রায় বলল, 'ওথেলো আমাদের বিয়ের একজন সাক্ষী।'

আমি বললুম, 'হ্যাঁ। শুনেছি।'

রায় আবার জয়ার দিকে চেয়ে চেয়ে বলল, 'জয়ার জন্যেই এত তাড়াতাড়ি চাকরী নিয়ে লণ্ডনে আসা। ওই দু'বেলা তাগাদা দিয়ে দিয়ে আমায় লণ্ডনে নিয়ে এলো। বলল প্যারিস ওর ভাল লাগছে না। নইলে আমি প্যারিসেই থাকব ভেবেছিলুম।' প্রেমের গর্বে তার মুখখানি আলোকিত হয়ে উঠেছে।

তার পর অনেকক্ষণ গল্পগুজব হলো। কিন্তু সেটা বেশীর ভাগই আমাদের তিনজনের মধ্যে আমাতে, রায়ে আর ওথেলোয়। জয়া যে ইচ্ছে করে গম্ভীর হয়ে ছিল তা নয়, ওর স্বভাবই কথা না বলা। আমাদের গল্প-গুজবের মাঝখানে কখনো-সখনো ওর অধর থেকে মৃদু মৃদু দু'টি একটি কথার শিউলি ঝরে পড়ল।

এক সময় আমি জয়ার দিকে চেয়ে বললুম, 'আপনার সেতার না শুনে আমি কিন্তু আজ উঠছি না।'

কালো মুখে হাসির আলো খেলিয়ে বলল, 'আচ্ছা শোনাচ্ছি।'

তার পর সেতারখানা নিয়ে এসে কোলে নিয়ে বসল। তখন সে যেন আরো রহস্যময়ী হয়ে উঠেছে। আমরা তিনজনেই অভিভূত হয়ে তার মুখের দিকে তাকিয়ে আছি আর তার টান করে চুল উল্টে বাঁধা মাথার মাঝখানের প্রকাণ্ড উঁচু খোঁপায়, নিমীলিত চোখে, নীল পাথরের

ফুলে, গলার নীল মালায়, কপালের নীল টিপে, নীল বসনে, লতানো লতানো নিটোল কালো হাতের নীল চুড়িতে, কালো মুখে আলোর খেলা দেখছি।

খানিক পরে তার বাঁধা শেষ হলে তার মায়া-আঙুলগুলোর ছোঁয়ায় হঠাৎ সেতারখানার বুক চিরে যে অপূর্ব অদ্ভুত সঙ্গীত বেজে উঠল তাতে মুগ্ধ হবে না, সব কাজ ফেলে দিয়ে চমকে উঠে অবাক হয়ে কান পেতে শুনবে না শুধু যে বধির।

শুনেছি ফেরদৌসির শাহনামা শুনে সুলতান মাহমুদ উচ্ছ্বসিত হয়ে বলে উঠেছিলেন, হে ফেরদৌসি, তুমি আমার রাজদরবারকে 'ফেরদৌস' অর্থাৎ স্বর্গ করে দিয়েছ! আমার মনে হ'ল, আজ সন্ধ্যায় দরবারির দরবারিও যেন আমাদের দরবারকে স্বর্গ করে দিয়েছে!

বাইরে বেরিয়ে দেখলুম মেঘের মাঝে আকাশে অল্প একটুখানি চাঁদের আভা ফুটে উঠেছে! মনে হলো সেও ও'ই জয়ার গানের জন্যেই।

ওথেলো পথ চলতে চলতে বলল, 'গানের সুর আমার মনে এক অদ্ভুত কাজ করে! আমাকে একেবারে পাগল করে দেয়, বিবাগি করে দেয়!'

সুরের ইন্দ্রজালে পথ হারিয়ে আমার অভিভূত অবস্থা তখনো কাটেনি, তখনো আমার দুই কান পূর্ণ করে সেই অপূর্ব ঝঙ্কার বাজছে, তাই চুপ করে রইলুম।

ওথেলো বলল, 'সত্যি করে বলুন তো অদ্ভুত মেয়ে নয়? কথা প্রায় বললই না অথচ মনে হলো ঘরখানি যেন কথায় একেবারে ভরে রেখে দিয়েছে! খুঁটিয়ে দেখলে নাক, চোখ আলাদা আলাদা করে কোনোটাই সুন্দর নয়, রংও কালো, অথচ কী আছে কে জানে, সবটা মিলে মনে হয় না যেন এক অপরূপ, অতুলনীয় সৌন্দর্য? এ রকম আশ্চর্য মেয়ে আমি সত্যিই জীবনে কখনো দেখিনি! কোনো আড়ম্বর

নেই, তবু যেন আড়ম্বরের রাণী! ঝলমলে কালো মুখের ওই গর্বটুকু, ওই হাসিটুকু, ওই গাম্ভীর্যটুকু, ওই রহস্যটুকু, ওই স্নিগ্ধ সরল ভাবটুকু— এ সব ভিঞ্চির মত শিল্পীর তুলিতেও ধরা পড়ত কিনা সন্দেহ! মুখ ছেয়ে অত গর্ব ফুটে আছে অথচ কী মিষ্টি স্বভাব! বলুন তো পৃথিবীর অষ্টম আশ্চর্য বলে কিছু ভুল করেছিলুম?'

মাথা দুলিয়ে বললুম, 'না।'

ওথেলো নিজের মনেই বলল, 'রায় সত্যি সত্যিই অসম্ভব লাকি!'

॥ একত্রিশ ॥

দিন তিনেক পরে একদিন বৃটিশ মিউজিয়ম হয়ে সেন্ট্‌পল্‌স্ ঘুরে দুপুরবেলায় ট্রাফালগার স্কোয়ারে গিয়ে চোখে পড়ল এক কোণে ঝর্ণার ধারে একটা বেঞ্চিতে বসে বসে জয়া একমনে আঙুলে কী গুণছে! আদুরে পায়রাগুলো তার চারিপাশে ভীড় করে বসে আছে।

আর একটু এগিয়ে গিয়ে মনে হলো চিরন্তন আলো-আঁধারের দ্বন্দ্বের মতো তার সমস্ত মন জুড়ে যেন কী এক দ্বন্দ্ব চলেছে। তারই আলো ছায়া খেলা করছে তার সমস্ত মুখে।

সেই সাজসজ্জা। পায়ের জুতো থেকে শাড়ী, ওভারকোট, কানের প্লাষ্টিকের পাশা, কপালের টিপ, গলার মালা, হাতের ব্যাগ সব সোনালী।

আরো সামনে গিয়ে বললুম, 'একা একা এখানে বসে যে?'

একটু চমকে উঠল। কয়েক মুহূর্ত চুপ করে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে তার পর বলল, 'আপনিই বা এখানে একা কেন?'

গম্ভীর গর্বিত চাহনী। অথচ হাসির একটা আভাস খেলা করছে সারা মুখে।

এ প্রশ্নের জন্যে প্রস্তুত ছিলুম না। একটু থতমত খেয়ে গিয়ে বোকার মতো বলে ফেললুম, 'আমি তো একাই।'

উত্তর শুনে তার কালো মুখখানি কৌতুকের আভায় ঝক্‌ঝক্ করে উঠল। খানিক চুপ করে থেকে বলল, 'একা হলেই যে জোড়া হওয়া যায় না, তা নয়—বিশেষ করে এই লণ্ডনে! আর জোড় হলেই যে সর্বদা জোড়ায় জোড়ায় থাকতে হবে এমন কোনো কথা নেই! কর্তা তো এখন অফিসে!'

জয়ার মুখে একসঙ্গে এত কথা আমি কোনদিন শুনিনি। হাঁ করে তার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলুম।

আমাকে অবাক হয়ে চেয়ে থাকতে দেখে সে মৃদু একটুখানি হাসল। সে হাসিতে যে সব ঝরে পড়ল তার বর্ণনা আমি দিতে পারব না। একটু হেলান দিয়ে বসে পায়ের উপর পা তুলে দিয়ে দোলাতে দোলাতে বলল, 'আপনি বুঝি প্রায়ই এখানে আসেন?' প্রশ্ন করার কী অপূর্ব ভঙ্গী!

বললুম, 'সময় পেলেই আসি। এ জায়গাটা আমার খুব ভালো লাগে।'

সে মুখ নামিয়ে নিয়ে চুপ করে রইল।

আমি শুধালুম, 'অত মন দিয়ে কী শুনছিলেন?'

সে মুখ তুলল। কিন্তু চমকে উঠলুম! সে মুখে তখন রাজ্যের কুয়াশা ঘনিয়ে উঠেছে।

কিছুক্ষণ চুপ করে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে মৃদুস্বরে রহস্যচ্ছলে বলল, 'গুণছিলুম!'

'কী?'

'হিসেব করছিলুম!'

'কী হিসেব করছিলেন?'

আবার খানিক চুপচাপ। তার পর বলল, 'আমরা কতদিন হলো জাহাজ থেকে নেমেছি—তাই গুনছিলুম! গত মাসের চব্বিশ তারিখে আমরা জাহাজ থেকে জেনোয়ায় নেমেছিলুম, তাই না?'

'হ্যাঁ।'

'আর আজ হলো এ মাসের চোদ্দো তারিখ। মোটমাট কুড়ি দিন। মাত্র এই কুড়ি দিনে জীবনে কতগুলো বিপ্লব ঘটে গেল বসে বসে সেই সবই হিসেব করছিলুম!'

'কতগুলো বিপ্লব মানে? একটাই তো!'

আমি যে তাদের বিয়ের কথাটা বলছি সেটা বুঝতে পেরে তার সারা মুখে লজ্জার রং ফুটে উঠল। কিন্তু কী জানি কেন, গম্ভীর হাসির আভায় রহস্যময়ী হয়ে চুপ করে গেল।

আমি তাকে বুঝতে চেষ্টা করছি, কিন্তু তার মনের ভাবটা ঠিক ধরতে পারছি না। আমার মনটাকে একটু হেঁয়ালির দোলায় দুলিয়ে দিয়ে সে যেন স্বচ্ছ কুয়াশার ওড়নায় মুখ ঢেকে অনেক দূরে পালিয়ে গিয়ে হাসছে!

'আপনার টাই কিন্তু ভালো করে বাঁধা হয়নি। সেদিনও এটা আমি লক্ষ্য করেছিলুম, কিন্তু সবাই ছিল বলে কিছু বলিনি। জাহাজেও আমি দেখতুম আপনার টাই ঠিক করে বাঁধা হয় না।'

চমকে উঠলুম। অবাক হয়ে চেয়ে দেখি তার মুখের কুয়াশা কেটে গিয়েছে। উজ্জ্বল হাসির আলোয় সে ঝকঝক করছে। দূর থেকে আবার অনেক কাছে সরে এসেছে।

উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'আসুন, আমি ঠিক করে বেঁধে দিচ্ছি। এলোমেলো জিনিষ আমি একদম সইতে পারি না।'

এর জন্যে মোটেই প্রস্তুত ছিলুম না। লজ্জায় লাল হয়ে থতমত করতে করতে বললুম, 'না থাক—ঠিক আছে—চারিদিকে লোকের ভীড়—কেউ দেখলে কী মনে করবে—তা ছাড়া—'

একটু হেসে তার স্বাভাবিক গর্বের আভায় ঝলমল করতে করতে বলল, 'এটা আমাদের সুসভ্য দেশ নয়। সাহেব মেমরা আমাদের মতন অমন কথায় কথায় কিছু মনে করে না। তাহলে আর এরা রাস্তায়ঘাটে—থাক, আর বললুম না! আসুন বেঁধে দিই।' জোর করে নিজের হাতে আমার কোটের বোতাম খুলে টাই বাঁধতে শুরু করল।

হতভম্ব হয়ে গিয়ে কাঠের পুতুলের মতো চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকা ছাড়া তখন আমার আর কোনো উপায় নেই। হঠাৎ এ রকম কাণ্ড যে সে করবে আমি ভাবতেই পারিনি।

বাংলা দেশের একজন মেয়ের কোনোরকম জড়তা বা আড়ষ্টভাব নেই দেখে ভারি ভালো লাগল। মনে পড়ল রুশ মেয়ে সোনিয়াও জাহাজে একদিন এই রকম আনাড়ি ফৈজাবাদীর কোট ইস্‌তিরি করে দিয়েছিলেন।

মনে হলো খুব বেশী সিমপ্যাথেটিক। তাই বাইরের এত গর্ব এবং গাম্ভীর্যের অন্তরালেও ও'র স্বভাবটি এত মিষ্টি।

টাই বাঁধতে বাঁধতে বলল, 'ভালো করে টাই বাঁধতে শিখে নেওয়া চাই। নইলে রোজ রোজ কে আপনার টাই বেঁধে দেবে!'

আশপাশের সায়েব মেমরা আড়চোখে চেয়ে তার কাণ্ড দেখছে, তাই আমার তখন লজ্জায় মাটির সঙ্গে মিশে যেতে ইচ্ছে করছে।

জয়া বলল, 'রায় কিন্তু ভারি হিংসুক! আপনার টাই বেঁধে দিচ্ছি দেখতে পেলে হয়তো তার মাথার ঠিক থাকত না! কাল রাত্তিরে ওথেলো গিয়েছিল আমাদের বাড়িতে। চোখে পড়ল ও'র কোটের বোতামগুলো ছিঁড়ে গিয়েছে। আমি জোর করে ও'র কাছ থেকে কোটটা চেয়ে নিয়ে বোতামগুলো সেলাই করে দিলুম। ওথেলো চলে গেলে রায় বলল, ও'র কোটের বোতাম তুমি সেলাই করে দিলে কেন? ও নিজে সেলাই করে নিতে পারে না? সেই নিয়ে ও খুব রেগে গেছে, কাল থেকে আমার সঙ্গে কথাই বলেনি! নেহাত ছেলেমানুষ! কতকগুলো বোতাম সেলাই করে দিয়েছি, তাতে কী হয়েছে বলুন তো! রায় যদি আমার কোন আনাড়ি বান্ধবীর ছাতাটা সেলাই করে দিত আমি কিন্তু মোটেই রাগতুম না!' সে কৌতুকে হেসে উঠল।

সেই জয়ার আজ হলো কী! এত কথা বলেছে! হাসছে! কত কী কাণ্ড করছে! মানুষ কখন কী 'মুডে' থাকে বলা মুস্কিল!

আমি বললুম, 'রায় যখন পছন্দ করে না তখন আমার টাই বেঁধে দেওয়া আপনার উচিত হয়নি। আমি আগে জানলে আপনাকে কিছুতেই বাঁধতে দিতুম না।'

সে হাসল।

তারপরেই গম্ভীর হয়ে গিয়ে বলল, 'আমার ফার্স্ট হাজবেণ্ড কিন্তু মোটেই হিংসুক ছিল না—'

আমি আকাশ থেকে পড়ে বাধা দিয়ে বললুম 'ফার্স্ট হাজবেণ্ড মানে? আপনি কী—' তারপর কিন্তু মুখের কথা মুখেই আটকে গেল।

জয়া তেমনি মৃদু হাসির আভায় গর্বিত মুখ উজ্জ্বল করে নিঃসঙ্কোচে বলল, 'হ্যাঁ, আমি বিধবা। এটা আমার সেকেণ্ড ম্যারেজ। বিয়ের মাত্র ছ'মাস পরেই উইলিয়াম মারা যায়। তার রূপের কোনো বালাই ছিল না, কিন্তু তার গুণের কোনো সীমা ছিল না। সবদিক থেকেই ও রকম উদার পুরুষমানুষ আমি আর দেখিনি! উইলিয়মের চেহারার সঙ্গে ওথেলোর চেহারার ভারি আশ্চর্য মিল আছে! ওথেলোর পশমী চুলটা বাদে। প্রথম দিন ও'কে প্যারিসের হোটেলে দেখে আমি চমকে উঠেছিলুম! মনে হলো উইলিয়াম যেন হঠাৎ ফিরে এসেছে! সে ছিল মাদ্রাজী, কিন্তু তার চেহারায় ও রকম ভাব পেয়েছিল কী করে কে জানে।'

এ রকম উজ্জ্বল একটা মেয়ে এত অল্প বয়সে বিধবা হয়ে গিয়েছিল জেনে মনটা বেদনায় দুলতে লাগল।

ও'র রহস্যময় মনের তলায় প্রথম স্বামী উইলিয়ামের প্রতি গভীর ভালোবাসা যে, এখনো বেঁচে আছে সেটা বুঝতে কষ্ট হলো না। আর সেইজন্যেই তার কথায় আজ ওর সব গাম্ভীর্য টুটে মুখ খুলে গিয়েছে।

মনে হলো কাল ওথেলোর কোটের বোতাম সেলাই করে দেওয়ার মতো তুচ্ছ ব্যাপার নিয়ে রায় রাগারাগি করবার পর থেকেই ও রায় আর উইলিয়ামে মিলিয়ে দেখতে শুরু করেছে। বিয়ের পর এই বোধহয় ওদের প্রথম ঝগড়া!

কিন্তু এত কথা বলে ফেলেই সে ততক্ষণে গম্ভীর হয়ে গিয়েছে। চুপচাপ কী যেন ভাবছে মনে হলো।

আমি খানিক চুপ করে থেকে বললুম, 'কী ভাবছেন?'

মুখ তুলে রহস্যচ্ছলে বলল, 'ভাবছি!'

'কী ভাবছেন?'

'না—ভাবছি!'

'কী?'

তার রহস্যাচ্ছন্ন চোখদুটো কৌতুকে ঝকঝক করে উঠল। কয়েক নিমেষ চুপ করে থেকে বলল, 'আচ্ছা বলুন তো জীবনটা নাটক, না, উপন্যাস? তা'ই ভাবছি!'

হঠাৎ এ প্রশ্ন শুনে আরো হকচকিয়ে গিয়ে বললুম, 'বেছে বেছে ভালো লোককে শুধিয়েছেন! ও সব বড় বড় কথা আমি বলতে পারব না। আমার বিদ্যে, বুদ্ধি দুটোই অত্যন্ত কম। তাই দেখবেন, সব্বাই যখন কথায় কথায় বুক ফুলিয়ে বিদ্যে ফলাতে, উপদেশ দিতে আর বড় বড় বক্তৃতা ঝাড়তে ব্যস্ত থাকে, আমি বেশীর ভাগ সময়ই চুপ করে থাকি।'

'আমার বিশ্বাস জীবনটা একটা বিরাট নাটক। জীবনে ঘটনাগুলো নাটকীয়ভাবেই ঘটে। রায় আর আমার ঘটনাটাই ভেবে দেখুন। দু'জনে যাত্রী হয়ে জাহাজে উঠলুম। কেউ কাউকে চিনি না! ছিলুম মেরী জয়া ড্যানিয়েল। তার পর কোথা থেকে কী ভাবে হয়ে গেলুম মেরী জয়া রায়!'

তার মনের কোনো একটা দ্বন্দ্বকে কেন্দ্র করেই আজ তার ভাবনা-গুলোর খেলা চলেছে। আজ এই ট্রাফালগার স্কোয়ারে দৈবাত তার অনেক খবর পেলুম, দ্বন্দ্বের একটা আভাষও তার সমস্ত কথাবার্তায় স্পর্শ করল, কিন্তু ঠিক কোন আলো-আঁধারের দ্বন্দ্ব তার মন জুড়ে শুরু হয়েছে সেটা কিছুতেই ধরতে পারলুম না।

আমাকে চুপ করে থাকতে দেখে সে বলল, 'ও হ্যাঁ, ভালো কথা মনে পড়েছে। কাল সন্ধ্যেবেলা আমি আর রায় ক্যাভেনডিশ-স্কোয়ার থেকে যাচ্ছিলুম। আপনাকে দেখতে পেয়ে আমরা কত

ডাকলুম, আপনি সাড়াই দিলেন না! গম্ভীর হয়ে কী যেন ভাবতে ভাবতে হন্ হন্ করে সোজা হ্যানোভার স্কোয়ারের দিকে চলে গেলেন!'

লজ্জা পেয়ে বললুম, 'তাই না কী! কই আমি তো একদম শুনতে পাইনি!'

সে মৃদু হেসে বলল, 'অত গম্ভীর হয়ে কী অত ভাবা হচ্ছিল?'

লজ্জিত হয়ে বললুম, 'কী জানি, একদম মনে নেই'

সে একটুখানি হাসল। কিন্তু তার পরেই হাতের ঘড়ির দিকে চেয়ে যেন বড্ড বেশী চঞ্চল হয়ে পড়ল!

ব্যস্ততা লুকোবার প্রাণপণ চেষ্টা করে থতমত করতে করতে বলল, 'আপনি এখন এখানে থাকবেন, না, যাবেন?'

লুকোবার চেষ্টা করেই তার ভিতরের অস্থিরতা আরো বেশী করে ধরা পড়ে গেল।

আমি বিস্ময়ে হকচকিয়ে বললুম, 'কেন বলুন তো?'

ধরা পড়ে গিয়েছে বুঝতে পেরে হাসবার চেষ্টা করে বলল, 'না—মানে—এমনি, আমি উঠব কী না, তাই শুধোচ্ছি।'

সে ঘন ঘন হাতের ঘড়ি দেখছে, ছটফট করছে আর উতলা হয়ে এদিক ওদিক তাকাচ্ছে দেখে মনে হলো সে যেন কারো জন্যে এইখানে অপেক্ষা করছে। তার আসার সময় হয়ে গিয়েছে। অথচ আমি থাকায় মহা অসুবিধেয় পড়ে গিয়েছে। মুখে না বললেও তার চোখের দৃষ্টি, তার মুখের ভাবভঙ্গী—সবকিছু যেন আমাকে চলে যেতে বলছে।

একবার ভাবলুম, বোধহয় আমার মনের ভুল। তার পর ভাবলুম, না, ভুল নয়। বোধ হয় রায় অফিসে গিয়ে অনুতপ্ত হয়ে টেলিফোনে খবর দিয়েছে এই সময় সে অফিস থেকে ছুটি নিয়ে এইখানে আসবে। সে যেন এইখানে থাকে। রায়ের জন্যেই বোধহয় সে এইখানে অপেক্ষা করছে। তার আসবার সময় হয়ে গিয়েছে। কালকের ঝগড়ার

পর তাদের স্বামী-স্ত্রীর মান অভিমান ভরা পুনর্মিলনের নাটকটা আমার সামনে অভিনয় হয় সেটা বোধহয় সে চাইছে না। আর কে'ই বা তা চায়? সে সময় সামনে একজন সাক্ষী-গোপাল বসে থাকলে সকলেরই অসুবিধে হয়। অথচ রায় সেইজন্যেই আসবে আর সে তারই জন্যে অপেক্ষা করছে সেটাও মুখ ফুটে বলতে পারছে না। বলা অসম্ভব।

তাই আমিও তাড়তাড়ি ঘড়ি দেখে মহাব্যস্ততার ভান করে মিথ্যে করে বললুম, 'ওঃ, এত বেলা হয়ে গেছে! আমায় এক্ষুনি একবার হোবার্ট প্লেসে যেতে হবে! একজনের সঙ্গে একটা বিশেষ জরুরী এ্যাপয়েন্টমেণ্ট আছে। আচ্ছা চলি, পরে দেখা হবে'—তারপরেই হন্ হন্ করে পা চালিয়ে একেবারে এক নিঃশ্বাসে ন্যাশানাল আর্ট গ্যালারীর সামনে এসে পড়লুম।

ন্যাশানাল আর্ট গ্যালারীর সামনে এসে নিমেষের জন্যে একবার পিছনে চেয়ে দেখতে পেলুম ওই দূরে স্কোয়ারের শেষ-প্রান্তে জয়ার সামনে দাঁড়িয়ে কথা বলছে ওথেলো!

ওথেলো বোধহয় ও পাশের রাস্তা দিয়ে কোথাও যাচ্ছিল। জয়াকে দেখতে পেয়ে স্কোয়ারের মধ্যে নেমে এসেছে। তার পরেই আর কোনোদিকে না তাকিয়ে সোজা পা চালালুম পিকাডিলির দিকে।

॥ বত্রিশ ॥

একটা দরকারে ইস্ট এণ্ডে গিয়ে রাস্তা হারিয়ে ফেলে হনহন করে হাঁটতে হাঁটতে হঠাৎ বাঁক নিয়ে একটা রাস্তায় পা দিয়েই আশ্চর্য হয়ে গেলুম। চেয়ে দেখলুম রাস্তার নাম পেটিকোট লেন!

পেটিকোট লেনে শুধু পেটিকোট-পলিটিক্স আর পেটিকোট-রেবেলিয়ানের চড়চড়ি কী না আমি জানি না, কিন্তু আজ রবিবারে পেটিকোট লেনে রাস্তার দু'পাশাড়ি যেন একেবারে রঙীন মেলা বসে গিয়েছে। পেটিকোট লেনে রোজই এ রকম মেলা বসে কী না তা'ও আমি জানি না। কত দেশের ছেলেমেয়ে, বুড়োবুড়ি। কত রকম বেরকমের দোকান। কত রকম দোকানী। দোকানে দোকানে নতুন পুরনো কত রকমারি জিনিষপত্তর থরে থরে সাজানো। কত রং! কী নেই তাই ভাবি! এমন কী ফুল ফলও আছে। এখানে যেন যা চাওয়া যায় তাই পাওয়া যাবে। দোকানগুলো যেন কোনো নিয়ম মেনে মাথা তোলেনি। যেখানে যেটা খুশী পরপর গজিয়ে গিয়েছে। কাপড়ের দোকানের পাশেই হয়তো ফলের দোকান। আবার তার পাশেই হয়তো জুতোর দোকান। কত রকম বেচাকেনা, দরদস্তুর, গোলমাল। সার্কাসের ক্লাউনের মতন দেখতে, ভুঁড়িওয়ালা ধূর্ত দোকানীদের কত রকমারী ককনী বুলির চিৎকার কানে আসছে—'লাভারলি নাইলন্‌স', 'বাই এ গুড ল্যাম্প গভর্ণর'; 'হেয়ার'জ্ ইয়োর হেয়ার পিন, পেনি এ পেনি, পিক এম্ এ্যাণ্ড চুজ এম্।'

এখানে কারো ঠকে গিয়ে মাথাটি একেবারে মুড়িয়ে যায়। কেউ মস্ত দাঁও মেরে লাল হয়। পেটিকোট লেনের এই মেলায় পকেটমার

আর পাদ্রী, সং আর ঠক, নান্ আর টেডি ছেলেমেয়ে, কাফ্রি, চীনে, জাপানি, ককনি, সর্দারজীদের কোলাকুলি। কোট, ফ্রক, শাড়ী, টুপি, পাগড়ি—সবকিছুর মেশামেশি। ঘুম থেকে জেগেই রোববারের লণ্ডন যেন এই পেটিকোট লেনের বাজারে এসে ভীড় করে জুটেছে। এরই মাঝখানে কোনো কোনো পাদ্রী ধর্মের মহিমা প্রচার করছেন; কোনো কোনো কোণে দু'একজন করে আর্টিস্ট রোববারের পেটিকোট লেনের এই জাঁকালো রঙীন ছবিটি আঁকতে বসে গিয়েছে।

এমন সময় ভীড়ের ভিতর থেকে বেরিয়ে এলেন শফিক শাবান। বললেন, 'আপনিও পেটিকোট লেনের বাজারে এসে জুটেছেন!'

বললুম, 'ইচ্ছে করে আসিনি, এদিকে একটা দরকারে এসেছিলুম, তারপর রাস্তা ভুলে এই বাজারে এসে পড়েছি।'

শফিক শাবান হাসির ফোয়ারায় বাজার শুদ্ধ সবলকে স্নান করিয়ে বললেন, 'এসেই যখন পড়েছেন তখন ভালো করে চোখকান খোলা রেখে ঘোরাফেরা করুন—বলা যায় না, কপালে থাকলে চাই কী আলাদ্দীনের প্রদীপটাও পেটিকোট লেনের এই বাজারে জুটে যেতে পারে!'

বললুম, 'আমার ঘুরলে চলবে না, একদম সময় নেই, এক্ষুণি ঘরে ফিরে যেতে হবে, দরকার আছে।'

একটু রহস্যচ্ছলে বললেন, 'তাই না কী। তাহলে যান। সন্ধ্যে-বেলায় ঘরে একটু থাকবেন, আপনাকে এক জায়গায় ধরে নিয়ে যাব।'

'কোথায়?'

'তা এখন বলব না।' তিনি ফের ভীড়ের মধ্যে মিশে গেলেন।

সন্ধ্যেবেলায় একা একা বসে বসে তাঁরই জন্যে অপেক্ষা করছি, এমন সময় শুনতে পেলুম, 'আসব।'

দরজার কাছে দাঁড়িয়ে শুভ্রা। পিছনে পিছনে অবিনাশবাবুও এলেন।

অবিনাশবাবু বললেন, 'কী ব্যাপার, তিন-চারদিন যাননি কেন? আমরা রোজ আপনার আশায় আশায় চেয়ে থাকি।'

শুভ্রা চোখেমুখে দুষ্টুমী খেলিয়ে আঙুল তুলে বলল, 'তোমার নামে কেস্ করা হবে। তবে তুমি জব্দ হবে!'

আমি হাসতে হাসতে বললুম, 'সময়ের অভাবে যেতে পারিনি।'

অবিনাশবাবু বললেন, 'তাই ভালো। হঠাৎ এমন ডুব মারলেন যে, আমরা ভাবলুম কোনো অসুখাবিসুখ করল না কী। তাই খবর নিতে এলুম।'

শুভ্রা আমার ধার ঘেঁষে বসে তেমনি ছোট্ট আঙুলটা তুলে আদুরে সুরে বলল, 'সময়টময় ও সব মিথ্যে কথা। আসলে তুমি আমাদের ভুলে যাচ্ছো, তাই আর যাও না। অথচ তুমিই না সেদিন বলেছিলে, রোজ রোজ আমাকে একবার করে দেখে আসতে যাবে? দাঁড়াও না, তোমার নামে কেস করে দোব, তবে তুমি জব্দ হবে।'

ছোট্ট হলে কী হবে—একেবারে পাকা বুড়ী! আমি আর অবিনাশবাবু তার দুষ্টুমীতে হাসতে লাগলুম।

তার পর আমি তাকে আদর করে আরো কাছে টেনে নিয়ে তার ফুলো ফুলো আদুরে লাল গালে একটা চুমু খেয়ে বললুম, 'এই সব ভালো ভালো কাপড়ে সেজেগুজে তোমায় কী রকম দেখাচ্ছে জানো? ঠিক ছোট্ট 'ফেয়ারি কুইনে'র মতো।'

শুভ্রা মিষ্টি সুরে হেসে উঠে চারিদিকে যেন সুগন্ধি আতর ছড়িয়ে দিল। তার পর আব্দারে আমার কোলের উপরে মাথা রেখে বলল, 'আগে আমার মোটে দুটো ফ্রক আর একটা ওভারকোট ছিল। এখন দাদু আমায় কতগুলো কিনে দিয়েছে জানো? কুড়িটা দামী দামী ফ্রক, পাঁচটা কোট, পাঁচটা পুলোভার, পাঁচ জোড়া জুতো—আরো কত কী! এখন আমি এ বেলা ও বেলা নতুন নতুন কাপড় জুতোয় সেজেগুজে থাকি। দাদু বলেছে আরো কিনে দেবে।' তার চোখদুটো খুশীতে নাচছে।

অবিনাশবাবু সস্নেহে হাসতে লাগলেন।

আমি বললুম, 'তাই না কী?'

শুভ্রা তেমনি করে মাথাটি আমার কোলে রেখে মুখখানি আরো আদুরে করে বলল, 'এর মাঝে আমরা গাড়ী কিনেছি। বাড়ী কিনেছি।' তার ছোট্ট মুখখানিতে বড় চমৎকার একটুখানি গর্ব ফুটে উঠল।

আমি বললুম, 'তবে আর কী, এবার তো সত্যি সত্যিই হার ম্যাজেষ্টি, দি কুইন হয়ে গেলে!'

তার পর অবিনাশবাবুর দিকে চেয়ে শুধোলুম, 'কোন্‌দিকে বাড়ী কিনলেন?'

অবিনাশবাবু বললেন, 'এ্যালপার্টন ষ্ট্রীটে।'

শুভ্রা বলল, 'কাল আমরা লাইমগ্রোভ থেকে এ্যালপার্টনে চলে যাচ্ছি।'

আমি বললুম, 'তাহলে কালকেই গিয়ে আমি তোমাদের নতুন বাড়ী দেখে আসব।'

শুভ্রা বলল, 'কাল না গেলে আর আমাদের দেখাই পাবে না।' বলার কী ভঙ্গী!

আমি তার আদুরে মুখে গর্বের খেলা দেখতে দেখতে বললুম, 'কেন?'

অবিনাশবাবু বললেন, 'পরশু আমরা স্পেনে যাচ্ছি। খৃস্‌মাসের পর ফিরে আসব। ফিরে এসে শুভ্রাকে স্কুলে ভর্তি করে দোব। ওকে আমি ব্যারিষ্টার করব।'

শুভ্রা একটু লজ্জা পেয়ে আমার কোটের বোতামগুলো নিয়ে খেলা করতে লাগল।

বুড়ো অবিনাশবাবু একটু হেসে বললেন, 'আমার নিজের ব্যারিষ্টার হবার খুব সখ্‌ ছিল। কিন্তু আমার জীবনে তো আর সে সব কিছুই হলো না। তাই শুভ্রাকে ভাবছি ব্যারিষ্টার করব। বাপ মা নিজে যা

পায় না, জীবনে নিজে যা হতে পারে না, ছেলেমেয়ের দিয়ে সেই সব আশা মেটাতে চায়।'

তাঁর কথায় শুভ্রা আরো লাল হয়ে উঠল। শুভ্রাকে নিয়ে এখন তিনি অনেক স্বপ্ন দেখছেন।

আমি বললুম, 'লজ্জা পেলে চলবে না। মস্ত বড় ব্যারিষ্টার হতে হবে।'

সে লজ্জায় আমার কোলের উপরে মুখ লুকিয়ে ফেলল।

অবিনাশবাবু বললেন, 'এখন তবে উঠি। আমাদের এক জায়গায় নেমনতন্ন আছে।'

শুভ্রা মুখ তুলে তারপর আমার মুখের সামনে সেটি আঙুলটি নাচিয়ে বলল, 'কাল ঠিক আসা চাই, নইলে আমি স্পেন থেকে ফিরে এসে ঠিক কিন্তু কেস করে তোমাকে জব্দ করে দোব।'

তাঁরা যেতে না যেতেই এসে পড়লেন শফিক শাবান।

এসেই বললেন, 'তৈরী হয়ে আছেন তো? চলুন।'

'কিন্তু—কোথায়?

শফিক শাবান একটু রহস্যচ্ছলে বললেন, 'চলুন না।'

'কোথায় বলুন।'

শাবান বললেন, 'না শুনেই ছাড়বেন না যখন, তাহলে শুনুন। সকালবেলায় পেটিকোট লেনে যাবার আগে একটু রিজেন্ট ষ্ট্রীটে গিয়েছিলুম, সেখানে হঠাৎ রায়ের সঙ্গে দেখা। সে বিশেষ করে সন্ধ্যেবেলা তাদের বাড়ীতে যেতে বলল। তাই ভাবলুম আপনাকেও ধরে নিয়ে যাব।'

আমি বললুম, 'ওঃ—রায়েদের বাড়ী! আমি ভাবছিলুম না জানি কোথায়! চলুন।'

গিয়ে মনে হলো আজ যেন পরশুকার সেই ট্রাফালগার স্কোয়ারের জয়া ফের 'এশিয়া' জাহাজের জয়া হয়ে উঠেছে। স্নিগ্ধ গবের আভার সঙ্গে কালো মুখে শুধু সেই অদ্ভুত নীরব হাসি। আমাদের তিনজনের কথাবার্তার মাঝখানে তার পাপড়ীর মত ঠোঁটে দু'টি একটি কথার কুঁড়ি ফুটল কী ফুটল না।

চুল উল্টে মাথার মাঝখানে উঁচু করে খোঁপা বেঁধে, লম্বা ছিপ ছিপে কালো দেহটিতে আঁট সাঁট করে নীল ব্লাউজ, নীল শাড়ী জড়িয়ে, কপালে নীল টিপ পরে, দুই কানে নীল পাথরের দুল আর কালো গলায় নীল মালা দুলিয়ে, হাতদুটিতে নীল চুড়ি পরে সে একেবারে নববর্ষার কলুছলে লতাটির মতো ঝক্‌ঝক্, চক্‌চক্ করছে, কিন্তু শীতের আবছা চাঁদনী রাতের মতোই গম্ভীর রহস্যের একটা স্বচ্ছ কুয়াশার ঘোমটায় নিজেকে ঢেকে রেখে সে যেন কাছে থেকেও অনেক দূরে পরাছোঁয়ার বাইরে সরে গিয়ে চুপচাপ বসে বসে আমাদের দিকে গর্বিত চোখদুটো মেলে চেয়ে চেয়ে কী এক আশ্চর্য নীরব হাসি হাসছে!

আমাদেরকে চা এনে দিল, কাছেও বসল, সবই করল— কিন্তু সবই যেন অনেক দূর থেকে। কী করে সে নিজেকে কাছে নিয়ে আসে আবার এমন করে কাছে থেকেও নিজেকে অনেক দূরে সরিয়ে নিয়ে যেতে পারে আমি জানি না।

মনের কী উচ্ছ্বাসে জানি না, পরশু দিন ট্রাফালগার স্কোয়ারে সে নিজেকে যতখানি মেলে দিয়েছিল আজ ঠিক ততখানি নিজেকে গুটিয়ে নিয়েছে।

এই মেয়েই পরশুদিন ট্রাফালগার স্কোয়ারে সবার সামনে আমার টাই বেঁধে দিয়েছিল আজ সেটা বিশ্বাস করাও কঠিন।

মনে মনে অবাক হয়ে ভাবতে লাগলুম, পরশু ট্রাফালগার স্কোয়ারে অসতর্ক মুহূর্তে নিজের স্বভাবের বিরুদ্ধে গিয়ে মৌনতার আবরণ ভেঙে

ফেলে নিজের অনেক খবর দিয়ে ফেলেছিল বলেই কী আজ এত বেশী সাবধান হয়ে নিজেকে সকলের কাছ থেকে অনেক দূরে সরিয়ে নিয়ে গিয়ে সে তার স্বাভাবিক গাম্ভীর্যে নিজেকে রহস্যময়ী করে রেখেছে! আর কেউ তাকে চিনবে না, জানবে না, বুঝবে না।

কথায় কথায় শফিক শাবান শুধোলেন, 'লণ্ডনে নতুন কোনো বন্ধুবান্ধব হলো?'

রায় বলল, 'আমার সঙ্গে কিছু কিছু লোকের আলাপ-সালাপ হয়েছে। কিন্তু জয়ার সঙ্গে এখনো কারো হয়নি। ও তো মোটেই মিশুক নয়। তার উপর আবার বড্ড বেশা চুপচাপ তো! কিন্তু জয়া নামে একটা আশ্চর্য মেয়ে যে লণ্ডনে এসেছে, সে কথা এরি মধ্যে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছে। বিশেষ বাইরেও বেরোয় না, মেশেও না কারো সঙ্গে, কিন্তু ওকে চিনে গেছে সব্বাই! ওর উপর সারা লণ্ডনের চোখ পড়েছে!'

জয়ার প্রতি তার ভালোবাসা একেবারে প্রতিটি কথায় কথায় তার মুখেচোখে ফুটে উঠল।

জয়ার মুখে কোনো কথা নেই। শুধু সেই অস্ফুট হাসির আভা।

চলে আসার সময় রায় শুধোলো, 'আচ্ছা, আপনাদের কারো লণ্ডন ভালো লাগছে?'

আমি আর শাবান দু'জনেই বললুম, 'না।'

রায় বলল, 'এ শহর যে কারো ভালো লাগতে পারে বলে আমার বিশ্বাস হয় না। প্যারিস এর চেয়ে হাজার গুণে ভালো। অথচ জয়াকে লণ্ডন শহর খুব ভালো লাগছে!'

আমরা দু'জনেই 'তাই না কী' বলে জয়ার দিকে তাকালুম।

জয়া মুখে কিছু বলল না। তার মুখে সেই রহস্যময় মোনালিসার হাসি।

॥ তেত্রিশ ॥

পরদিন সন্ধ্যায় গিয়ে দেখলুম শফিক শাবান আর একজন অচেনা বাঙ্গালী ভদ্রলোক ফায়ার-প্লেসের ধারে বসে গল্প করছেন। আমি যেতেই শফিক শাবান আমার সঙ্গে তাঁর আলাপ করিয়ে দিলেন।

বড়দার বন্ধু। মাত্র আজ সকালেই তিনি লণ্ডনে পৌঁছে শেফার্ডস বুশের এই বাড়ীতে বড়দা'র ওখানে উঠেছেন। নাম—ব্যানার্জি। ভদ্রলোক ডাক্তার। এ'র আগেও তিনি আর একবার বিলেতে এসেছেন।

শফিক শাবানের মুখে আগেই তিনি আমার কথা শুনেছিলেন।

কথায় কথায় ব্যানার্জি বললেন, 'অনেকদিন পরে আজ আবার শেফার্ডস বুশের এই বাড়ীতে বসে আমার কেবলই উর্মিলা বৌদির কথা মনে পড়ছে। আজ থেকে ঠিক দশ বছর আগে এই বাড়ীরই নীচে-তলার একটা কামরায় উর্মিলা বৌদি থাকতেন। সে এক বড় করুণ কাহিনী!'

আমি আর শাবান দু'জনেই উৎসুক হয়ে শুধোলুম, 'কী?'

ব্যানার্জি খানিকক্ষণ উদাসীন হয়ে বসে থেকে বললেন, 'শুনবেন?'

আমরা দুজনেই বললুম, 'বলুন।'

ব্যানার্জি শুরু করলেন—

'একদিন সন্ধ্যেবেলা এক বন্ধুর অপেক্ষায় এক 'পাবে' বসে আছি, এমন সময় একজন বাঙালী ভদ্রলোক ধাঁ করে পিছন থেকে এসে আমার সামনে বসেই বললেন, New comer?' চোখ দুটি ঢুলুঢুলু। বুঝলুম সুধা চলেছে। বললুম, 'হ্যাঁ, দিনদশেক হলো আমি প্যারিস

থেকে এসেছি। আপনি ?' বললেন, 'আমি অনেকদিন হলো এসেছি। আর ফিরব না ভাবছি। এ স্বর্গরাজ্য ছেড়ে কী আর আমাদের ওই নরকে ফিরে যেতে ইচ্ছে করে, আপনিই বলুন ? বীরেন চাকড়ভর্তিকে লণ্ডনে সবাই চেনে!' সঙ্গে সঙ্গে ওয়েটারকে ডেকে মদের অর্ডার দিয়ে বসলেন। বললুম, 'আমি খাই না।' হেসে বললেন, 'বসে বসে বুঝি গন্ধ শুঁকছেন!' বললুম, 'আমি আমার এক বন্ধুর জন্যে অপেক্ষা করছি। সে এইখানে আসবে বলেছে ' আমার কথা তিনি বিশ্বাস করলেন বলে মনে হলো না।

'ওয়েটার মদ দিয়ে গেলে গ্লাস দুই চালিয়ে ভোঁ হয়ে খানিকক্ষণ বসে থেকে হঠাৎ পকেটে হাত দিয়ে বললেন, 'আরে, ঘোঁড়ার ডিম ব্যাগটা গেল কোথায়! পিক্ পকেট হয়ে গেল না কি! এ শালার লণ্ডনে পিক্‌পকেটগুলো কেবলই ছোঁক্ ছোঁক করে ঘুরে বেড়াচ্ছে।'

'অগত্যা বিলটা আমাকেই শোধ করতে হলো। দেখলুম মাতাল হলেও জ্ঞান আছে টনটনে। মাথায় নানানরকম ফন্দিফিকির খেলে। নইলে এমন অভিনয়টা করলেন কী করে! আমার ঘাড় ভেঙে মদ আদায় করার জন্যেই যে গায়ে পড়ে আলাপ করেছিলেন বুঝতে বাকী রইল না।

'টলতে টলতে উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, 'আপনার কাছে যে, কী পরিমাণ কৃতজ্ঞ তা বলে শেষ করতে পারব না। মদ যে খাওয়ায় তাকে আমি ঠিক আমার ভায়ের মতন ভালোবাসি! চলুন আমার বাড়ী, আমার স্ত্রীর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দোব। উর্মিলা আপনাকে পেলে ভারি খুশী হবে। এই বিদেশে সে একেবারে হাঁপিয়ে উঠেছে। তবু একজন দেশের লোক পেলে—বুঝলেন তো ? সে আবার নিতান্তই বাংলা-দেশের অবলা মেয়ে! তার উপর আবার এমনি সেকেলে ধরণের যে, এ্যাদ্দিন যে আছে, একটু যে ইংরেজীটিংরেজী শিখে, ফ্যাসান-দুরস্ত হয়ে এখানের সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে নেবে, তা নয়। দিনরাত একা একা

ঘরে বন্দী হয়ে বসে থাকবে। কোনো সঙ্গীসাথী নেই—বড্ড একা সে। আমিও নানান কাজে বাইরে বাইরে ঘুরি, ঘরে থাকতে পারি না বেশী। ওকে এখানে এনেও এক বিপদে পড়েছি। চলুন, আর দেরী করবেন না।'

শুনে বড়ই কৌতূহল হলো। তাই বললুম, 'আচ্ছা, চলুন। আমার বন্ধু বোধহয় আর আসবে না। সময় পার হয়ে গেছে।'

বীরেনবাবু আমাকে শেফাডস বুশের এই বাড়িতে নিয়ে এসে উর্মিলা বৌদির সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিয়েই 'আপনারা গল্প করুন, আমার একটা বিশেষ কাজ আছে'—বলে বাইরে চলে গেলেন।

এই বিদেশে চারিদিকে রূপের উগ্রতা আর লজ্জাহীনতার মাঝখানে বাংলাদেশের সেই স্নিগ্ধ-শ্যাম লাজুক মেয়েটিকে যে কী ভালোই লাগল তা বোঝাতে পারব না। একেবারে খাঁটি বাংলাদেশের বৌ। তাঁর সেই কল্যাণী মূর্তি দেখে প্রথমেই যে কথা মনে হলো তা এই যে—এঁকে এ দেশে মানায় না, এঁর জন্যে দরকার আম, জাম, কাঁঠালের ছায়াঘেরা, দোয়েল, পাপিয়া, বৌ-কথা-কও ডাকা বাংলাদেশের একটি নিভৃত পল্লীগ্রাম। চোখদুটির ভয়-চকিত ভাব দেখে স্পষ্ট বোঝা গেল এ দেশে এসে পড়ে তিনি একেবারে দিশেহারা হয়ে উঠেছেন। বড় মায়া হলো। গায়ে লালপেড়ে শাড়ী, তার উপর একটা কালো কাশ্মিরী শাল, মাথায় ঘোমটা, কালো চুলের মাঝখানে টকটকে সিঁদুর অপরূপ আভায় জ্বলছে। কপালে সিঁদুরের মস্ত টিপ। হাতে শাঁখা, নোয়া, সোনার বালা। বয়েস ত্রিশের কাছাকাছি।

মুহূর্তের মধ্যে আমাদের যে কী মধুর সম্পর্ক গড়ে উঠল সেটা বিদেশে—বিশেষ করে উর্মিলা বৌদির মতো মেয়ের সঙ্গে যদি কখনো আলাপ হয়ে থাকে তবেই বুঝতে পারবেন।

আমিও উঠতে পারি না। বৌদিও ছাড়েন না। ছেলেমানুষের মতো কত কথাই বলতে লাগলেন তার ঠিক নেই। বহুকাল তিনি

কথা বলার লোক পাননি, তাই আজ তাঁর কথা কিছুতেই ফুরচ্ছে না। এ সব হচ্ছে আজ থেকে দশ বছর আগের কথা। এটা '৫৮ সাল। অর্থাৎ আমি '৪৮ সালের কথা বলছি। তখন আমাদের দেশের লোকেদের লণ্ডনে আসার এতখানি হিড়িক পড়ে যায়নি। এ বাড়িতেও তখন বীরেনবাবুরা ছাড়া আর কোনো বাঙালী ছিল না। কয়েকজন পাঞ্জাবী, কয়েকজন চীনে, জাপানি, আর একপাল নিগ্রো থাকত। যাই হোক, তার পর শুনুন। এক সময় আমি শুধোলুম, 'আচ্ছা মিঃ—চক্রবর্তী আপনার সঙ্গে আমার আলাপ করিয়ে দিয়ে কোথায় চলে গেলেন? এখনো ফিরলেন না?'

উর্মিলা বৌদির গালদুটি লাল হয়ে উঠল। বললেন, 'কী জানি। মাতালের কথা আমি কী করে জানব বলুন?' তার পরেই আবার শুরু করলেন রাজ্যের সব আজেবাজে কথা।

রাত দশটা বেজে গেল, তবু তাঁর কথা ফুরোয় না। যেন এক যুগ তিনি কথা বলেননি! আমি উঠতে চাইলেও কিছুতেই ছাড়তে চান না। আর কথার সাথে সাথে সে কী মধুর হাসি! মনে হল যেন এক যুগ তিনি হাসেনওনি। তাঁর রাঙা ঠোঁট থেকে অজস্র হাসি রঙীন মণিমুক্তোর মত চারিদিকে ছড়িয়ে পড়তে লাগল।

রাত্রি এগারোটা বেজে গেল তবু বীরেনবাবু ফিরলেন না। আমার পক্ষে আর বসে থাকাটা একান্ত খারাপ দেখায় তাই সে রাত্রে একরকম জোর করেই বাড়ী চলে এলুম। আমি তখন বেজ-ওয়াটারে থাকতুম। উর্মিলা বৌদি বারবার বললেন, 'কাল কিন্তু সকালে আবার আসবেন, নইলে আমিই আপনার বাড়িতে গিয়ে হাজির হ'ব।'

পরদিন ভোরেই ছুটলুম বৌদির বাড়ী। বন্ধ দরজায় শব্দ করতেই তিনি দরজা খুলে আমায় দেখতে পেয়ে কলমুখর পাখির মতো খুশীতে কলরব করে উঠলেন, 'আরে আপনি? আমি মনে করেছিলুম উ—'এই পর্য্যন্ত বলেই সামলে নিয়ে বললেন, 'ভোরেই চলে এসেছেন দেখে আমি

কিন্তু খু-ব খুশী হয়েছি। এত সৌভাগ্য যে হবে আমার ভাবতেই পারিনি। বসুন, আমি চা করে আনছি।'

বাইরের খুশীর আলোয় তিনি আমায় অন্ধ করে দিতে চাইলেও পারলেন না। আমি স্পষ্ট দেখতে পেলুম, কী একটা ঝাপসা কালো ছায়া যেন সুক্ষ্মতম জালের মতো সে আলোর অন্তরালে ভেসে বেড়াচ্ছে! চেয়ারে বসে অবাক হয়ে শুধোলুম, 'এত ভোরেও বীরেনবাবু বাড়ী নেই?' বৌদি আশ্চর্য হয়ে বললেন, 'বীরেনবাবু কে?' আমি আরো অবাক হয়ে বললুম, 'কেন,—মানে—মিঃ চক্রবর্তী আর কী?' তিনি বুঝতে পেরে একটু লজ্জা পেয়ে বললেন, 'উনি কি ওঁর নাম আপনাকে বীরেন বলেছেন না কী?' আমি বললুম, 'হ্যাঁ'। বৌদি লজ্জায় মুখ নত করে বললেন, 'ওঁর নাম তো বীরেন নয়।' আমি আরো অবাক হয়ে শুধোলুম, 'তবে?' লজ্জায় গাল রাঙা করে তিনি নখ খুঁটতে লাগলেন। খানিক পরে লাজুক সুরে বললেন, 'উনি যখন আপনাকে বীরেন নাম বলেছেন তখন আপনি ওঁকে বীরেন বলেই জানবেন।'

বীরেনবাবু কেন যে আমার কাছে তাঁর নাম লুকিয়েছিলেন আজো আমার কাছে সে এক রহস্য।

যাই হোক, আমি বললুম 'বেশ তাই হবে। এত সকালেও উনি বাড়ী নেই?' লজ্জায় লাল হয়ে চোখদুটি ফের নামিয়ে বললেন, 'না।' শুধোলুম, 'কখন বেরিয়ে গেলেন?' কয়েক মিনিট চুপ করে থেকে বৌদি বললেন, 'কাল রাতে উনি বাড়ীই আসেননি!'

শুনে বজ্রাহতের মতো বসে রইলুম। বৌদি সরল চোখদুটি আমার দিকে তুলে অদ্ভুত একটুখানি হেসে বললেন, 'খুব অবাক লাগছে, না? তা অবাক হবারই কথা বটে। আমার কিন্তু সয়ে গেছে! প্রায় কোনো রাতেই উনি বাড়ী আসেন না। আজ দু'বছর এমনি ভাবেই এখানে আমার জীবন কাটছে।' তাঁর চোখদুটো ছলছল করে উঠল।

শুনে স্তম্ভিত হয়ে গেলুম। কত আগুন কত স্নিগ্ধতার আবরণ দিয়ে তিনি আড়াল করে রেখেছেন! বাইরে যার হাসির ছটা ভিতরে তার চোখের জল। সংসার একটা মায়ার খাঁচা! যে ধরা দিয়েছে সে মুক্তির জন্যে পাগল, যে ধরা দেয়নি সে ধরা দেবার জন্যে খাঁচার চারিদিকে মাথা কুটে মরছে!

একটু পরে আমাকে চা এনে দিয়ে একটু রহস্যের সুরে বৌদি বললেন, 'আপনাকে পেয়ে কাল সারারাত বিছানায় পড়ে পড়ে একটা কথা ভাবছিলুম।' একটু অবাক হয়ে শুধোলুম, 'কী'? খানিকক্ষণ কী ভাবলেন। তার পর শুধোলেন, 'লণ্ডনে আপনি আর কতদিন আছেন?' বললুম, 'দিন পাঁচেক। আমার টাকা ফুরিয়ে এসেছে।'

বৌদি খানিক ইতস্তত করে শুধোলেন, 'সোজা দেশে ফিরে যাবেন, না, আর কোথাও?' বললুম, 'না, দেশেই ফিরে যাব।'

আবার খানিকক্ষণ কী ভাবলেন। তার পর বললেন, 'আমায় আপনি সঙ্গে করে দেশে নিয়ে গিয়ে বাবার কাছে পৌঁছে দিতে পারবেন? এভাবে নির্বাসিত হয়ে আমি আর এক মুহূর্ত এখানে এ রকম অভিশপ্ত জীবন কাটাতে পারছি না।'

বললুম, 'তা কী করে হতে পারে? আমার সঙ্গে চলে গেলে লোকে কী বলবে?' মরিয়া হয়ে বললেন, 'বলুক লোকে। আমি আর কাউকে ভয় পাই না।'

বললুম, 'তাতে আমার বিপদ যেমন তেমন, আপনার ক্ষতিই বেশী। জানেন তো আমাদের সমাজ কত নীচ, কত বর্বর? সবাই মিলে মিথ্যে করে এমন কলঙ্কের বোঝা মাথায় তুলে দেবে যে, বেঁচে থাকাই আপনার পক্ষে দায় হয়ে উঠবে।'

বৌদি বললেন, 'এমনিতেও তো বেঁচে থাকা দায় হয়ে উঠেছে।' আমি বললুম, 'তা হয়েছে বটে, কিন্তু তার সাথে সমাজের চাবুকের ঘা নেই, গায়ে থুতু দেওয়া নেই। আমার সঙ্গে গেলে দেখবেন, আপনার

নিজের বাবাই হয়তো আপনাকে ঘরে নেবেন না—বাইরের লোকের নিন্দে তো দূরের কথা। আমাকে মাপ করবেন বৌদি।'

নিষ্ফল আক্রোশে ফুলতে ফুলতে বললেন, 'আমার হাত-পা খোলা, তবু কী ভীষণ বন্দী আমি!' তাঁর অবহেলিত, উপদ্রুত, লাঞ্ছিত নারীচিত্তের সমস্ত চাপা কান্না যেন আমার দুই কানের মধ্যে আর্তনাদ করে উঠল। তার পর বললেন, 'আঃ! যদি মরে যেতে পারতুম! এ জগতে যারা মরে যায় তারা মহা সৌভাগ্যবান! বেঁচে থাকাটাই একটা কঠিন শাস্তি।'

খানিক পরে শুধোলুম, 'দেশে আপনার কে কে আছেন?'

বৌদি বললেন, 'শুধু বাবাই আছেন, আর কেউ নেই। বড় গরীব তিনি। সব কথা জানিয়ে আজ পর্যন্ত অন্তত পক্ষে শঞ্চাশখানা চিঠি তাঁকে লিখেছি। কত কান্নাকাটি করে লিখেছি আমাকে কোনরকমে এখান থেকে নিয়ে যাওয়ার একটা ব্যবস্থা করতে। কিন্তু কোন উত্তর পাইনি। গরীব হয়েও তিনি বড়লোকের সঙ্গে আমার বিয়ে দিয়ে দিয়েছেন এই আমার সাতজন্মের ভাগ্য! আর আমার জন্যে তাঁর কিছু করার নেই। অবশ্য সাধ্যও তাঁর নেই। তা ছাড়া অতদূর থেকে করবেনই বা কী! তাই বোধহয় জবাব দেন না।' তার পর তিনি অন্যমনস্ক হয়ে গিয়ে কী ভাবতে লাগলেন। এক সময় আমি চলে এলুম। তিনি লক্ষ্যও করলেন না। কী যে ভাবছিলেন জানি না।'

এমন সময় বড়দা এলেন। আজ আবার কোলে সেই কালো বেড়ালের ছানা। আর কাঁধে ক্যামেরা। বড়দা ফায়ার-প্লেসের ধারে একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসতে বসতে ব্যানার্জিকে বললেন, 'তোমার সেই উর্মিলা বৌদির গল্প বলছ, বুঝি? বল—বল। আমিও আর একবার শুনি।'

ব্যানার্জি আবার শুরু করলেন, 'সেইদিন মাঝরাতে আমার বন্ধ দরজায় ভীষণ জোরে ঘা পড়ল। ঘুমিয়ে পড়েছিলুম, ধড়মড় করে

উঠে দরজা খুলেই দেখি ঊর্মিলা বৌদি! এ কী চেহারা হয়েছে তাঁর! ভয়ের এমন বিকট মূর্তি এ'র আগে কখনো কারো মুখে আমি দেখিনি। বললুম, 'এ কী, বৌদি! এত রাতে! কী হয়েছে?'

তিনি আমার পায়ের উপর আছাড় খেয়ে পড়ে বললেন, 'তোমার পায়ে পড়ি, তুমি আমাকে এখান থেকে উদ্ধার করে নিয়ে যাও। তুমি আমাকে উদ্ধার কর।' আজ তিনি আমাকে 'তুমি' বললেন।

আমি বললুম, 'ছি, ছি, এ আপনি কী করছেন? আপনি আমার বৌদি, আর আপনি আমার পায়ে কী পড়ছেন?' তার পর তাঁকে তুলে দাঁড় করিয়ে শুধোলুম, 'কী হয়েছে?'

অনেকক্ষণ ধরে তিনি হাঁপালেন। তার পর বললেন, 'আগে উনি প্রায়ই দিনরাত বাইরে উধাও থাকতেন, কিন্তু কখনো এত বাড়াবাড়ি করেননি। আজ রাতে রাজ্যের মাতাল বন্ধু, আবার একটা খারাপ মেয়েমানুষকে সঙ্গে নিয়ে বাড়ী ফিরে সবাই মিলে কী যে হৈ-হল্লা, নোংরামি করছে—সে আর কী বলব! কী করে যে আমি পালিয়ে এসেছি সে আমিই জানি।' সেই প্রচণ্ড শীতেও দেখি তিনি ঘেমে উঠেছেন। বৌদি বললেন, 'আমাকে এ নরক থেকে তুমি উদ্ধার কর ভাই, নইলে আমি আত্মহত্যা করে মরব। দিক সমাজ আমার মাথায় কলঙ্কের বোঝা তুলে, তবু তুমি আমায় দেশে নিয়ে গিয়ে আমাকে বাবার কাছে পৌঁছে দাও। একা তোমায় আমি কিছুতেই যেতে দোব না। আমরা তো জানি আমরা নিষ্পাপ। লোকে বুঝলই বা আমাদের ভুল। এই নাও আমার পাসপোর্ট।'

আমি কী জবাব দোব ভেবে পেলুম না। তিনি বললেন, 'কী ভাবছ চুপ করে? টাকার কথা? আমার এই সমস্ত গয়না তোমাকে দিচ্ছি। এগুলো বিক্রী করে জাহাজ ভাড়া হবে না?'

আমি পাথরের মূর্তির মতো কয়েক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে থেকে বললুম,

'তা হয়তো হবে। কিন্তু আপনি আমায় ক্ষমা করুন বৌদি, আপনাকে নিয়ে আমি যেতে পারব না।'

হঠাৎ তাঁর চোখ দুটো দপ্ করে জ্বলে উঠল। বললেন, 'পারবে না? তুমি না পুরুষমানুষ! এত ভীতু তুমি! ছিঃ!'

বললুম, 'ভয়টা আমার জন্যে নয়, আপনার জন্যেই! আমাকে আপনি ভুল বুঝবেন না।' তিনি মুখ বিকৃত করে বললেন, 'ওঃ! আমার জন্যে! একেবারে দেবতা কিনা, তাই আমার জন্যে ভয়! কাপুরুষ! স্বার্থপর! তোমাদের চিনতে আর আমার বাকী আছে! আমার জন্যে তোমায় কিচ্ছু করতে হবে না। আমি নিজের পথ নিজেই দেখে নিতে পারব' —তিনি পাগলের মতো বেরিয়ে গেলেন। আমি একেবারে পাথর হয়ে গেছি। নড়বার ক্ষমতাও নেই। হতভম্বের মতো দাঁড়িয়ে রইলুম। ঠিক করলুম কাল ভোরেই লণ্ডন ছাড়তে হবে, এখানে আর এক দণ্ডও নয়।

কিন্তু সকালবেলা লণ্ডন ছাড়তে গিয়ে কী এক অলঙ্ঘনীয় আকর্ষণে উর্মিলা বৌদির কাছেই এসে হাজির হলুম! দেখলুম জানালার ধারে তিনি বসে আছেন। চুল উস্কোখুস্কো। চোখদুটো সজল। শূন্য দৃষ্টি। কিন্তু সেই অশ্রুপূর্ণ দুটি চোখ দিয়ে কী যেন এক জ্বালা বিচ্ছুরিত হয়ে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ছে! জিনিষপত্রও সব এলোমেলো। নিতান্ত অপরাধীর মতো তাঁর সামনে গিয়ে ডাকলুম, 'বৌদি।' তিনি ধীরে ধীরে মাথা তুলে বললেন, 'কী?' আমি বললুম, 'আমি তোমার কাছে মাপ চাইতে এসেছি।' আজ আমিও তাঁকে 'তুমি' বললুম।

তিনি বললেন, 'তুমি তো কোন দোষ করনি, তুমি কেন মাপ চাইতে আসবে?'

আমি বললুম, 'ও কী? তোমার হাত খালি কেন? গয়নাগুলো সব কী হলো?' বললেন, 'কী হলো বুঝতে পারছ না? মদের

টাকা নেই, তাই আমায় মারধোর করে সব গয়নাগুলো কেড়ে নিয়ে গেছেন। বাক্সেও আর একখানিও গয়না নেই।'

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললুম, 'আমি ভেবে ঠিক করেছি আমি তোমাকে নিয়েই যাব।'

বৌদি বললেন, 'আর তো উপায় নেই। গয়নাগুলো তো সব কেড়ে নিয়ে গেছেন। ওই গয়নাগুলোই আমার একমাত্র ভরসা ছিল।'

বললুম, 'তাই তো! কী হবে তাহলে? আমার কাছেও তো অত টাকা নেই!'

বৌদি বললেন, 'যা হবার তাই হবে। তা ছাড়া গয়নাগুলো থাকলেও আমি যেতুম না। তাতেও তো মুক্তি নেই। পরে আমি ভেবে দেখলুম, তুমিই ঠিক বলেছিলে। বাংলাদেশের মেয়ে হয়ে জন্মেছি যখন, তখন এমনি করেই আমাকে সে পাপের শাস্তি ভোগ করতেই হবে! তা ছাড়া আমার তো আর কোনই উপায় নেই ভাই! শুধু কী আমি? বাংলাদেশের প্রতি ঘরে ঘরে আমার মতো এমনি হতভাগিনী খুঁজে পাবে। নিতান্ত মেয়ে হয়ে জন্মেছি বলেই নিজের জীবন লাঞ্ছনায়, বঞ্চনায়, উৎপীড়নে, উপদ্রবে অভিশপ্ত. পঙ্গু হয়ে গেলেও দুশ্চরিত্র, অত্যাচারী. লম্পট স্বামীকেই মুখ বুজে দেবতা করে পূজো করতে হবে! সিঁথিতে পরতে হবে সিঁদুর—সৌভাগ্যের চিহ্ন! মানতে হবে পতি পরম গুরু! জানো তো ভাই, হিন্দুঘরের বৌ—তার হাত পা খোলা, তবু সে কী ভীষণ বন্দী? কয়েদী জেল থেকে মুক্তি পায়, কিন্তু বাংলাদেশের মেয়ের হাতে একবার বিয়ের শিকল বাঁধা হলে আর সারা জীবনেও তার মুক্তি নেই। পালিয়ে গিয়েই বা কী লাভ হতো বল?'

হতবুদ্ধির মতো কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে আমি শুধোলুম, 'আচ্ছা, বীরেনবাবু কী বরাবরই এইরকম?'

বৌদি বললেন, 'না। আগে উনি ভালোই ছিলেন। বিলেতে

এসেই মাথায় ভূত চেপেছে।' শুধোলুম, 'আচ্ছা, বীরেনবাবু তো চাকরীবাকরী কিছুই করেন না, তোমাদের চলে কী করে? তোমার শ্বশুর টাকা পাঠান বোধহয়?' প্রশ্নটা অশোভনীয় হলেও কৌতূহল চেপে রাখতে পারলুম না।

বৌদি বললেন, 'শ্বশুর শাশুড়ী কেউই নেই আমার। আগে উনি লণ্ডনে এসে একটা দোকানে ভালো চাকরী করতেন আর ইঞ্জিনিয়ারিং পড়তেন। তার পর চাকরীবাকরী, লেখাপড়া সব ছেড়ে দিয়েছেন। এখন এই লণ্ডন শহরে ওঁদের একটা মস্ত দল আছে, নানান কু-কীর্তি করে ওরা টাকা করে। তা সে টাকাও তো মদেই উড়ে যায়, সংসার আর চলে কই? আচ্ছা, একটা কথা তোমায় বলি। উনি তো আজকাল দিনরাতই উধাও থাকছেন, হালেহাতে ফিরবেন বলেও মনে হয় না—এদিকে বাড়ীওলি আমাকে তিষ্ঠোনো দায় করে তুলেছে। ও'র প্রায় কুড়ি সপ্তাহের ভাড়া বাকী। কাল শাসিয়ে গেছে, আগামী-কাল টাকা না দিলে কোর্টে নালিশ তো করবেই, উপরন্তু আমাকেও তাড়িয়ে দেবে। আমার তাহলে কী হবে আমি তো কিছুই ভেবে পাচ্ছি না। বাড়ীওলি আমাকে খুব বেশী ভালোবাসে বলেই এতদিন বিশেষ কিছু বলেনি। এইবার যদি সে খারাপ ব্যবহার করে তবে তাকে দোষ দেওয়া যায় না।'

মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়ে বললুম, 'বলেন কী! কুড়ি সপ্তাহের ভাড়া বাকী ফেলেছে! উঃ! লোকটা কী শয়তান! সে কত টাকা?'

বৌদি বললেন, 'তা ষাট পাউণ্ড তো বটেই। গয়নাগুলো ভরসা ছিল, সেগুলোও তো কেড়ে নিয়ে গেলেন। গয়নাগুলোর ভরসাতেই এ্যাদিন আমি বুক বেঁধে ছিলুম।'

এই বিদেশ বিভুঁয়ে তাঁর মতো সহায়-সম্বলহীনা বাংলাদেশের একজন অতি অবলা মেয়েমানুষকে বাড়ীওলি কাল যদি হাত ধরে বার করে দেয় তাহ'লে ও'র কী অবস্থা হবে ভাবতে গিয়ে মাথা গোলমাল

হয়ে গেল। বললুম, 'এখন আমার মাথায় কিছুই আসছে না। আমি সন্ধ্যেবেলা আসব। দেখি যদি ভেবে চিন্তে কিছু ঠিক করতে পারি।' আমি চলে যাচ্ছিলুম, তিনি তাঁর ভয়বিহ্বলা, অসহায়, সজল চোখদুটি তুলে বললেন, 'সন্ধ্যেবেলা ঠিক এস কিন্তু ভাই। এই এতবড় লণ্ডন শহরে এখন তুমিই আমার একমাত্র ভরসা।' সে নিরুপায়, মিনতি-মাখা, ভীতু চোখ দুটি আমি জীবনেও ভুলতে পারব না।

সন্ধ্যায় এসে দেখলুম আবছা টেবিল ল্যাম্পের আলোয় ঝুঁকে পড়ে তিনি কাকে বোধ হয় চিঠি লিখছেন— বোধ হয় তাঁর বাবাকেই হবে। কিন্তু কিছুতেই যেন মনের কথাগুলো ঠিকমতো গুছিয়ে লিখতে পারছেন না। কলম যেন ক্লান্ত আঙুলগুলো থেকে বারবার খসে পড়তে চাইছে।

আমাকে দেখেই তিনি তাড়তাড়ি চিঠি লেখা বন্ধ করে ভারি উৎফুল্ল হয়ে উঠলেন। যেন তাঁর দুঃখের কুঁড়িগুলো গোলাপ হয়ে ফুটে উঠেছে। বোধহয় ভেবেছিলেন আমি আসব না। বললেন, 'আঃ! বাঁচলুম! তোমাকে দেখলে যে কী ভরসাই পাই।'

এমন সময় একজন মাঝ বয়সী বাঙালী এসে তাঁকে প্রণাম করল। বৌদি তার সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দিলেন। লোকটির নাম বংশী, চট্টগ্রামের লোক, জাহাজে খালাসীর কাজ করত। অনেকদিন আগে একবার জাহাজ লণ্ডনে ভিড়লে কর্তাদের চোখে ধুলো দিয়ে সে বার্মিংহামে পালিয়ে যায়। সেখান থেকে শেফিল্ড্। শেফিল্ড্ থেকে এডিনবরা। তার পর লণ্ডনে এসে পেটের ধান্দায় নানানরকমের ছোটখাটো কাজ করে। কিন্তু বিশেষ সুবিধা করে উঠতে পারেনি। দৈবাত বীরেনবাবুর সঙ্গে তার আলাপ হয়। এবং তিনি না কী তাকে অত্যন্ত ভালোবাসেন। সেই সূত্রে আসা-যাওয়া। বীরেনবাবু আর বৌদি তার মা বাবা। বীরেনবাবু তাকে কোনো এক কারখানায় চাকরী করে দেবেন বলেছিলেন, সেটার কতদূর কী হলো সেই খবরটা

নিতেই তার আগমন। বৌদি বললেন, বংশীর মতো এমন নিরীহ, সৎ, পরোপকারী, ভালোমানুষ না কী আজকাল দেখা যায় না। দেখে মনেও হলো তা'ই—ভাজা মাছটি উলটে খেতে জানে না; যেন এক গালে চড় মারলে আর এক গাল ঘুরিয়ে দেবে! দেখলুম মা'র প্রতি তার ভক্তির অন্ত নেই। মা বলতে অজ্ঞান।

বংশী ফের তাঁকে ভক্তিভরে প্রণাম করে চলে গেলে বৌদি শুধোলেন, 'কী ভেবে ঠিক করলে?' আমি বললুম, 'বাড়ীওলি কাল ক'টার সময় ভাড়া নিতে আসবে?' বৌদি বললেন, 'সকাল ন'টা দশটার সময়।' আমি বললুম, 'কাল আমি সেই সময় আসব! আমি নিজে জামিন হয়ে ওর কাছে আর এক সপ্তাহ সময় চাইব। দেখাই যাক না, বীরেনবাবু তো এর মধ্যে এসেও পড়তে পারেন।'

বৌদি বললেন, 'আর যদি না আসেন?' বললুম, 'ভাড়াটা তাহলে বাধ্য হয়ে আমাকেই দিতে হবে এ ছাড়া আর তো কিছুই আমি ভেবে পেলুম না।' বৌদি লজ্জা পেয়ে বললেন, 'তুমি অত টাকা পাবে কোত্থেকে? তোমার তো টাকা ফুরিয়ে এসেছে বলছিলে?' আমি বললুম, 'আমার জাহাজ ভাড়াটা আছে, তার থেকেই দিতে হবে। তা ছাড়া আর উপায় কী?' বৌদি থ হয়ে বসে রইলেন। লজ্জায় আমার দিকে তাকাতেও পারলেন না। আমি বললুম, 'কী ভাবছ?' বৌদি লজ্জাবিকৃত কণ্ঠে বললেন 'কিছু না। ভাববার শক্তিও আর আমার নেই।'

চলে যাওয়ার সময় বললুম, 'তোমার কাছে তো টাকা পয়সা বোধহয় কিছুই নেই। এই এক পাউণ্ড সঙ্গে রাখো, নইলে চলবে কী করে?' লজ্জায় তাঁর সারামুখ গোলাপের রং মেখে নিল। ঘোমটার ভিতরে নতমুখে বললেন, 'আমার কাছে এখনো কয়েক শিলিং আছে, দিন চারেক তাতেই চালিয়ে নিতে পারব।' বললুম, 'সত্যি, না, আমাকে ফাঁকি দিয়ে বলছ?'

'যাও, আমি জানি না' বলেই তিনি লজ্জায় একমুহূর্তে আমার সামনে থেকে অন্যদিকে পালিয়ে গেলেন। সেই পালিয়ে যাওয়াটুকু চিরকাল আমার মনে থাকবে। আমি এক পাউণ্ডের নোটটা টেবিলের উপর একটা কাগজ-চাপা দিয়ে চেপে রেখে চলে গেলুম।

সাতদিন কেটে গেল। বীরেনবাবুর কোনো পাত্তাই নেই। বাড়ী ভাড়াটা আমার ঘাড় থেকেই গেল। আশি পাউণ্ড।

একদিন সন্ধ্যেবেলা বসে বসে ভাবছি জাহাজ ভাড়া তো আর নেই, এখন করা যায় কী! একটা চাকরী বাকরীর চেস্টা করতে হবে। এমন সময় ছায়ার মতো বৌদি এসে হাজির। অবাক হয়ে শুধোলুম, 'কী ব্যাপার? তুমি হঠাৎ এ সময়?'

বৌদি আমার পাশের সোফাটায় খানিকক্ষণ চুপ করে বসে রইলেন। চোখে কেমন যেন উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টি। আমার কোনো প্রশ্নের জবাব দিলেন না। খানিক পরে বললেন, 'আজ খবর পেলুম উনি মিস্ রোজি কে বিয়ে করে বন্ধুর দলবল নিয়ে রোমে চলে গেছেন।' তাঁর মুখের দিকে ভালো করে চেয়ে দেখি এই ক'দিনেই যেন ষাট বছরের বুড়ি হয়ে উঠেছেন!

বজ্রাহতের মতো শুধোলুম, 'কী করে খবর পেলে?' বৌদি বললেন, 'খবর কী আর চাপা থাকে ভাই! কানে ঠিক আসেই। মিস্ রোজি কে বুঝতে পেরেছ তো?'

আমি বললুম, 'না।'

বৌদি বললেন, 'সেই খারাপ মেয়েটা—সেদিন রাতে যে মেয়েটাকে সঙ্গে করে উনি বাড়ীতে এনেছিলেন। আর বোধহয় উনি ফিরবেন না। কারণ ওঁদের দল তো নানান কু-কীর্তি করে বেড়াত। পুলিশ ওঁদের পিছনে লেগেছে। আমার মনে হয় তাই বোধ হয় লণ্ডন ছেড়ে পালিয়েছেন।' তার পর কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থেকে বললেন, 'এর পরেও কী তুমি আমাকে এমনিভাবে এখানে থাকতে বল?'

বললুম, 'আমি কিছুই ভাবতে পারছি না।'

অদ্ভুতভাবে আমার দিকে চেয়ে আরো অদ্ভুতভাবে হেসে উঠে বললেন, 'কিছুই না?' সেই প্রশ্নের সুরে আর তাঁর মুখের দিকে চেয়ে হঠাৎ ভয় হলো ভয়ে, ভাবনায়, দুঃখে, মানসিক আঘাতে তাঁর মাথার গণ্ডগোল হচ্ছে না তো! হতভম্বের মতো বললুম, 'শুধু একটি কথা ভাবতে পারছি। বীরেনবাবু হয়তো আমাকে কঠিন বিপদে ফেলতে পারতেন, তোমারও হয়তো আর কারো কাছে মুখ দেখাবার উপায় থাকত না, তবু আমি তোমায় সঙ্গে করে দেশে নিয়ে গিয়ে তোমার বাবার কাছে পৌঁছে দিতুম। কিন্তু এখন সে উপায়ও আর নেই—কারণ আমার নিজেরই দেশে ফিরে যাবার টাকা নেই। চাকরী-বাকরী যোগাড় করে টাকা জমাতে হবে। এর বেশী আর কিছু আমি ভাবতে পারছি না।'

হঠাৎ তিনি উঠে চলে যাচ্ছিলেন। আমি বললুম, 'কোথায় যাচ্ছো?'

অদ্ভুতকণ্ঠে খিল্ খিল্ করে হেসে উঠে বললেন, 'বিয়ে করতে!'

বুঝলুম তাঁর মাথার ঠিক নেই। বললুম, 'কী সব যা তা বকছ?' বৌদি তেমনি খিলখিল করে হাসতে হাসতেই বললেন, 'দূর পাগলা কোথাকার! তুই বড্ড বোকা! যা তা আবার কী বকছি? উনিই শুধু বিয়ে করতে পারেন, আমি পারি না?'

আমি শক্ত করে তাঁর হাত চেপে ধরে বললুম, 'এখন তোমাকে আমি কিছুতেই যেতে দোব না।'

বৌদি বললেন, 'ওমা! ছাড়্! কী পাগলামি করছিস্!' বললুম, 'না। আমি কিছুতেই ছাড়ব না। তুমি একটু ঘুমোও, তাহলেই সব ঠিক হয়ে যাবে।'

তাঁর অতন্দ্র দুটি চোখে যেন যুগযুগান্তের ক্লান্তির ছায়া নামল। বললেন, 'আঃ! ঘুম! কত দিন যে ঘুমোইনি ভাই! সত্যি, তুই আমাকে ঘুম পাড়াতে পারবি? তাহলে আমি সব ভুলে যাব।

আসলে এ সব কী জানিস? আমাকে ঘিরে যা কিছু ঘটছে সব মিথ্যে, সব দুঃস্বপ্ন। ঘুমোতে পারছি না তাই জেগে জেগে শুধুই দুঃস্বপ্ন দেখছি। আমাকে একটু গভীরভাবে ঘুম পাড়াতে পারবি ভাই? তাহলে এই অভিশপ্ত দুঃস্বপ্নগুলোর হাত থেকে একটু বাঁচি আমি! আসলে আমার স্বামী আবার বিয়েও করেননি, উনি মাতালও নন্, আমারো কোনো দুঃখকষ্ট নেই। সব দুঃস্বপ্ন!'

আমি বললুম, 'হ্যাঁ, হ্যাঁ সব দুঃস্বপ্ন। সব মিথ্যে। তুমি শোও, আমি এখুনি তোমায় ঘুম পাড়িয়ে দিচ্ছি।' তাঁকে শুইয়ে দিয়ে আমার কাছে যে কড়া ঘুমের ওষুধ ছিল খাইয়ে দিলুম। ক্রমশ তিনি ঘুমিয়ে পড়লেন।

আমি অন্ধকারে পায়চারী করতে করতে ভাবতে লাগলুম এইবার বৌদি নিশ্চয়ই পাগল হয়ে যাবেন, নয় আত্মহত্যা করবেন। কিন্তু তা আমি নিজের চোখে দেখতে পারব না। তার আগে আমাকে কাল পরশুর মধ্যেই লণ্ডন ছেড়ে অনেক দূরে কোথাও পালাতে হবে। ঠিক করলুম প্যারিসে আমার বন্ধুর কাছে চলে যাব।

বেশীক্ষণ তিনি ঘুমোতে পারলেন না। জেগে উঠে বললেন, 'আমাকে বাড়ীতে রেখে এস।' জিজ্ঞেস করলুম, 'এখন একটু ভালো লাগছে?' বললেন, 'হ্যাঁ।'

পরদিন সন্ধ্যেবেলা আমি প্যারিসে চলে গেলুম। ভেবেছিলুম যাবার আগে একবার বৌদির সঙ্গে দেখা করে যাব। কিন্তু পাছে তিনি আমাকে না ছাড়েন—অথচ যেতে আমাকে হবেই; কারণ, এখানে থেকেও আমি তাঁর করতে পারব না কিছুই, তাই দেখা না করে চুপিচুপি তাঁকে ফাঁকি দিয়ে পালিয়ে গেলুম।

প্যারিসে গিয়েও তিষ্ঠোতে পারলুম না। কেবলই মনে হতে লাগল ও ভাবে তাঁকে ফেলে চলে আসাটা অমানুষের কাজ হয়েছে। আমার উপরেই যে তাঁর সমস্ত ভরসা ছিল। ধিক্কারে নিজেকে চাবুক কষাতে

ইচ্ছে করল। এই বিবেক জিনিষটার বালাই যার মধ্যে আছে সে জীবনে বড় কষ্ট পায়।

সাতদিনের মধ্যে ফিরে এলুম লণ্ডনে। না, এলেই ভালো হ'ত। লণ্ডনে আর ঊর্মিলা বৌদিকে খুঁজে পেলুম না। ল্যাণ্ডলেডি বলল, পরশু দিন বংশীর সাথে তিনি দেশে চলে গেছেন। বংশী না কী তাঁকে তাঁর বাবার কাছে পৌঁছে দেবে। মিঃ চক্রবর্তীর কোনো পাত্তা নেই। আমি কত করে বুঝিয়ে বললুম, ও সব লোকের সঙ্গে যাবেন না, ওদের বিশ্বাস নেই। আসলে কী মতলব আছে কে জানে! আমার কথা কিছুতেই শুনলেন না। বললেন, যা হয় হোক, আমি যাবই। এখানে এ ভাবে আর এক মুহূর্তও আমি থাকতে পারছি না। বংশী খুবই ভালো লোক। বংশী আমায় মা বলে।'

নিশ্চয়ই তার মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছিল। নইলে বংশীর মতো লোককে কখনো কেউ বিশ্বাস করে তার সঙ্গে বেরিয়ে যেতে পারে! অবশ্য তার মাথা খারাপ না হওয়াটাই আশ্চর্য! তা ছাড়া তাঁর মনের যে অবস্থা তখন, তাতে বংশীকে না বিশ্বাস করে উপায়ও ছিল না। যে ডুবে মরছে সে বাতাস আঁকড়ে ধরতে চায়।

টলতে টলতে বসে পড়ে শুধোলুম, 'উনি জাহাজ ভাড়া পেলেন কোথেকে?' ল্যাণ্ডলেডি বলল, 'তা ঠিক জানি না, তবে কথায়বার্তায় যতদূর মনে হলো বংশীই দিয়েছে।'

পাগলের মতো পথে নেমে এলুম। মনে হলো সমস্ত অপরাধ আমার। আমি ওঁকে ও ভাবে ফাঁকি দিয়ে পালিয়ে না গেলে তো কিছুতেই উনি এই সর্বনাশের মুখে পা বাড়াতেন না। হয় তো আমাকে অনেক খুঁজেছিলেন। হয়তো আমার আশায় পথের দিকে চেয়ে বসে থাকতেন। সমস্ত লণ্ডন শহর যেন আমাকে লাথি মারতে লাগল।

বহু কষ্টে টাকাকড়ি জমিয়ে দেশে ফিরে গিয়ে তাঁর বাবার সঙ্গে দেখা

করে জানলুম তিনি ফেরেন নি। তাঁর নিরুপায়, দরিদ্র বৃদ্ধ বাবা জানতেনই না যে, তিনি লণ্ডন থেকে চ'লে এসেছেন! আমার মুখেই প্রথম শুনলেন। মেয়ের সর্বনাশের খবর শুনে তিনি যে ভাবে কাঁদতে শুরু করলেন, সে কান্না আজো আমার দুই কানে লেগে আছে।

বংশী যে মিথ্যে করে বৌদিকে কোথায় ভুলিয়ে নিয়ে গিয়েছিল অনেকদিন তা জানতে পারিনি। কিন্তু পেরেছিলুম—বহুকাল পরে একদিন জানতে পেরেছিলুম। বংশী প্রথমে তাঁকে সিলোনে, পরে বর্মায় নিয়ে গিয়ে মাস ছয়েক একটা বাড়ীতে রেখে নিজে তো তাঁর উপর যথেচ্ছাচার করেই। এমন কি তারই সমশ্রেণীর লোকেদের কাছে তাঁকে ভাড়া খাটিয়ে প্রচুর পয়সা করে। তার পর তাঁকে হংকংএ নিয়ে গিয়ে এক চীনে দালালের কাছে বিক্রী করে দিয়ে আমেরিকার পালিয়ে যায়।'

ব্যানার্জির কাহিনী শেষ হ'লে আমি স্তম্ভিত হয়ে গিয়ে বললুম, 'অথচ ওই বংশীই না তাঁকে মা বলত! কী শয়তান লোকটা।'

বড়দা বললেন, 'শুধু বংশী নয়,—মানুষ মুখে ভগবানের পূজারী, আসলে সব শয়তানের শিষ্য। আমার ভেবে দুঃখু লাগে, সুন্দর এই পৃথিবী, শুধু সুন্দর নয় এর মানুষগুলো!'

তার পর কালো বেড়ালটার গায়ে হাত বুলোতে বুলোতে বললেন, 'সেইজন্যেই তো বৈজ্ঞানিক প্যাস্কেল বলেছিলেন, The more I see of men, the more I love my dog.'

ব্যানার্জি চুপ করে বসে থেকে একটা নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, 'উর্মিলা বৌদি আজ বেঁচে আছেন কিনা, থাকলেও কোথায় কী ভাবে আছেন আর কিছুই আমি জানি না।'

মনটা বড় খারাপ হয়ে গেল। এ গল্প যেন না শুনলেই ভালো হ'ত।

॥ চৌত্রিশ ॥

সেদিন সকালে তাড়াতাড়ি করে সাজগোজ করছি, এমন সময় রায় এসে হাজির।

এসেই বলল, 'আপনি বাইরে যাচ্ছেন না কী?'

'হ্যাঁ। একটু ইরাকী কনস্যুলেটে যাব।'

'হঠাৎ ইরাকী কনস্যুলেটে কেন?'

'ভিসার জন্যে। ঠিক করেছি বাগদাদ যাব।'

সে কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, 'ভালোই হলো। আপনি যাচ্ছেন বাগদাদ, আমিও চলে যাচ্ছি বার্লিন।'

'কত দিনের মধ্যে?'

'দিন সাতের মধ্যেই। হয়তো একটু দেরীও হতে পারে। কিন্তু আপনাকে একটা কাজ করতে হবে।'

'বলুন?'

'এই [illegible] আমার কোথাও একটা কামরা ঠিক করে দিতে পারেন? কোথাও জানাশোনা আছে?'

অবাক হয়ে বললুম, 'কেন, কামরা তো আপনার আছে। ওটা ছেড়ে দেবেন কেন? ওটা তো বেশ ভালোই?'

রায় বলল, 'ওটায় জয়া থাকবে। আমি নিজের জন্যে একটা কামরা চাইছি। একসাথে আর থাকা চলে না। আমি আলাদা থাকতে চাই।'

আরো আশ্চর্য হয়ে বললুম, 'তার মানে?'

খানিক চুপ করে থেকে বলল, 'মানুষ ভাবে এক, হয় আর। কী হবে আর কী হবে না কিছু বলবার জো নেই। যা আশা করা যায় না সেটাই সবসময় ঘটে। ঘর আমার ভেঙে গেছে। জয়া হঠাৎ ওথেলোর সঙ্গে একটা রোমান্সে মেতে উঠেছে। ওথেলোর মধ্যে ও কিসের সন্ধান

পেয়েছে আমি জানি না! আমি অফিসে বেরিয়ে গেলে ওরা রোজই বাইরে কোথাও না কোথাও দেখা করছে। আমার বন্ধুবান্ধবরা ওদের দু'জনকে একসঙ্গে বহুবার বহু জায়গায় দেখেছে। আমি প্রথমে তাদের কথা বিশ্বাস করিনি। কিন্তু তার পর আমি নিজেও পর পর দু'দিন মিথ্যে করে অফিসে যাচ্ছি বলে বেরিয়ে গিয়ে লুকিয়ে থেকে ওদেরকে এক সঙ্গে দেখেছি। একদিন হাইড পার্কে, আর একদিন নিউ বণ্ড স্ট্রীটে একটা জুয়েলারের দোকানে।'

প্রথমে নিজের দুই কানকে বিশ্বাস করতে পারলুম না। মনে হলো পৃথিবীর সবকিছু যেন গণ্ডোগোল হয়ে যাচ্ছে। তার পরেই মনে পড়ল, তাই তো, আমিও তো ও'দের দু'জনকে একসঙ্গে দু'বার দেখেছি! একবার পিকাডিলিতে। একবার ট্রাফালগার স্কোয়ারে। তবে কী জয়া সেদিন ট্রাফালগার স্কোয়ারে ওথেলোর জন্যেই অপেক্ষা করছিল! আর সেদিন পিকাডিলির দোকানেও কী তবে ওদের হঠাৎ দেখা হয়ে যায়নি!

রায় বলল, 'আমি জয়াকে অনেক বুঝিয়েছি, কিন্তু সে কিছুতেই বুঝতে চায় না। এই নিয়ে আমাদের অশান্তির আর শেষ নেই। ওথেলো যেন ওকে যাদু করে ফেলেছে!'

জীবনে দুটি সব চেয়ে বড় ট্র্যাজেডি হচ্ছে, আমরা যা চাই তা পাওয়া, তার পর তা পেয়ে হারানো।

রায় একটু থেমে বলল, 'আমি কিন্তু জয়াকে দোষ দিই না। একজনকেই চিরকাল ভালো লাগবে বলে আমি বিশ্বাস করি না। মনের সে ধর্মই নয়।'

আমি শুধু হাঁ করে তার মুখের দিকে চেয়ে আছি। রায়ের মত এতখানি ঔদার্য আমি কোনো লোকের দেখেছি বলে মনে পড়ে না।

একটু চুপ করে থেকে রায় বলল, 'এতদিনে আমি বুঝতে পারলুম, জয়া কেন আমাকে হঠাৎ এত তাড়া দিয়ে প্যারিস থেকে লণ্ডনে নিয়ে এলো! কেন ওর প্যারিস মোটেই ভালো লাগছিল না! কেন

ওর লণ্ডন এত ভালো লাগছে!' প্যারিসেই ওথেলোর সঙ্গে ওর প্রথম দেখা হয়। আর তখনই সব গোলমাল হয়ে গিয়েছে!'

আমি বললুম, 'তাহ'লে উনি বিয়ে না করলেই পারতেন।'

রায় বলল, 'আমার মনে হয় প্রথমে নিজেকে অতটা বুঝতে পারেনি। তারপরে দিনে দিনে নিজেকে বুঝতে পেরেছে। মানুষের মন জিনিষটা বড় অদ্ভুত—বড় আশ্চর্য্য!'

আর কেউ হলে এ রকম ঘটনায় একদম ভেঙে পড়ত; কিন্তু রায়কে দেখে বোঝবার উপায় নেই যে, যে আকাশছোঁয়া প্রাসাদটা ও গড়ে তুলেছিল সেটা ওরই মাথায় হুড়মুড়িয়ে ভেঙে পড়েছে বলে! সেটাও বোধহয় ও ওর অন্তরের স্বাভাবিক ঔদার্যের জোরেই কাটিয়ে উঠেছে। যা ঘটেছে তাকে শান্ত মনে মেনে নিয়েছে।

আমার কাছে কিন্তু সেদিন ট্রাফালগার স্কোয়ারে বলা জয়ার সেই রহস্যময় কথাগুলোর মানে যেন সঙ্গে সঙ্গে অনেকখানি পরিষ্কার হয়ে গেল—সেই 'মাত্র এই কুড়িদিনে জীবনে কতগুলো বিপ্লব ঘটে গেল'; সেই 'জীবনে ঘটনাগুলো নাটকীয়ভাবেই ঘটে' ইত্যাদি।

রায় বলল, 'আমি কী হারালুম বা হারাতে বসেছি তার জন্যে আমি একটুও দুঃখিত নই। যা পেয়েছি তা'তেই আমি খুশী।'

আশ্চর্য্য!

মানুষ সারাজীবন ধরে কী পায়নি শুধু তারই হিসাব মেলায়, কী পেয়েছে একবার ভুল করেও তার হিসাব করে না। যে যতই পাক, যার যতই থাক, তবু কেউ খুশী নয়—সকলের মুখে কেবল কী পেল না, কী হলো না তারই আক্ষেপ। পৃথিবীতে অসম্ভব যদি কিছু থাকে, সে হলো মানুষকে খুশী করা। তার এক হাতে চাঁদ আর এক হাতে সূর্য এনে দিলেও বলবে তারাগুলো কেন পেলুম না!

অথচ এ পাগল বলে কী! এই প্রথম একজনের মুখে বেসুর শুনলুম।

রায়কে আমার বরাবরই ভালো লেগেছে, আজ যেন তাকে আরো বেশী করে ভালো লাগল।

তাই বলে জয়াকেও বিচারের কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়ে আমি দোষ দিতে পারলুম না। মনের উপর কারো হাত নেই। বিশেষ করে এই নারী পুরুষের সম্পর্কটা—এ এমনই এক অদ্ভুত, জটিল, রহস্যময় ব্যাপার যে, একে কোনো একটা বাঁধাধরা নিয়মে বেঁধে দেওয়া চলে না। অথচ নিয়মে না বেঁধেও উপায় নেই। তাই নিয়মও থাকবে। পাশাপাশি নিয়মের বাঁধন ছেঁড়াটাও থাকবে। এবং একে মেনে না নেওয়া ছাড়া আর কী উপায় আছে আমি জানি না।

মানুষ দাবা সাজায় একরকম করে আর কে যে আড়ালে বসে তার সব ঘুঁটি উল্টে পাল্টে দেয় কিচ্ছু বোঝবার জো নেই!

আমাকে চুপ করে থাকতে দেখে রায় শুধোল, 'কী—পারবেন না একটা কামরা দেখে দিতে?'

বললুম, 'চেষ্টা করব।'

'আজকের মধ্যেই পেলে ভালো হ'ত। এর পর আর এক দিন, এক রাতও জয়ার সঙ্গে আমার থাকা চলে না। শেষ বোঝাপড়া আমাদের হয়ে গেছে।'

'শফিক শাবানকে বলে দেখব। বেডওয়াটারে ওঁর এক নাইজিরিয়ান বন্ধু থাকে। তাদের বাড়ীতে একটা কামরা খালি আছে বলে সেদিন উনি কথায় কথায় বলেছিলেন। এখনো খালি থাকতে পারে!'

'কামরাটা তাহ'লে Kindly একটু দেখবেন'—বলে রায় চলে গেল।

জীবনটা সত্যিই আগাগোড়া একটা বিপ্লব!

এলো ফৈজাবাদী।

গায়ে সেই পাঁচমণি-ওভারকোট। হাতে রঙীন দস্তানা। গলায় বাহারে কম্ফর্টার। মাথায় সবুজ ফেল্টের টুপি।

ঢুকেই একেবারে হাঁউমাউ করে বলল, 'ইমাম সাব, কাল শাবান [৮৮]

সাবকো মু পে সুনা কেয়া আপ বোগ্দাদ শরীফ চলা যাতেঁ হেঁ ?'

বললুম, 'হাঁ ।'

'আরে বাপরে বাপ, হম্ তব ক্যায়সে লণ্ডন পে রহেগা ?' মাথায় হাত দিয়ে ধপ্ করে বিছানায় বসে পড়ল। তারপর বলল, 'মত্ যাইয়ে ইমাম সাব, একসাথ সব্ আয়া, ফের একসাথ সব্ যায়গা।'

বললুম, 'পাগল হুয়া ? আমাকে যেতেই হোগা। আপকো তো তিন বরিষ রহ্নে হোগা।'

প্রবল বেগে মাথা নাড়িয়ে বলল, 'নেই, নেই, নেই, হাম্ ওত্না রোজ নেই রহ্নে স্কাকেগা ; গোলি চালাও ডক্টরেট্পে, সালেকো জাহান্নামপে জানে দোও ; হাম আপ্না মুলুক পে আপ্না বিবিকো পাস চলা যায়গা। রাতপে মেরা নিন্ নেই হোতা— এ্যায়সা করকে কোই বাঁচ স্কাকতা ? হাম জরুর চলা যাযগা—দিল্পে আগ লেকে ক্যায়সে বাচেগা, বাতাইয়ে ?'

'বিবিকা চিঠিউঠি মিলা ?'

'আলবৎ মিলা, লেকিন তাভি হা। নেই রহেগা। ও ভি আনেকো এন্তেজাম করতি হ্যায়, মগর আজই হাম টিলিগিরাফ ভেজ দেঙ্গে, কী, মাত আও। ইঁহা হাম নেই রহ্নে স্কাকেগা। দিল খালি ভাগো ভাগো করতা আওর ভসি লিয়ে রাত পে নিন্ ভি নেই হোতা।'

চোখ তুলেই দেখি আমার সাক্ষো পাঞ্জা—শফিক শাবান।

বললেন, 'উঃ, বড্ড দেরী হয়ে গেল। আমার কিন্তু দোষ নয়। জানেন তো রাজায় রাজায় যুদ্ধ বাধলে উলুখড়ের বিপদই সবচেয়ে বেশী ?'

'কোন্ রাজায় রাজায় আবার যুদ্ধ বাধল ?'

'সকালবেলায় গিয়েছিলুম একটু হ্যাকনীতে। তার পর আপনার এখানে আসার জন্যে বাসে যেই উঠেছি, খানিক দূর এসে বাস দাঁড়িয়ে পড়ল। দেখি গাড়ীঘোড়া সব দাঁড়িয়ে গেছে, লোকজন সব ছুটোছুটি করছে। কেউ আর কারণটা কী ঠিক বলতে পারে না। কেউ বলে

একটা মশা একটা হাতীকে গিলে ফেলেছে, তা'ই দেখতেই সব ছুটেছে! কেউ বলে সবাই ছুটছে দেখে আমরাও ছুটছি, কারণটা আমরাও জানি না! শেষে জানতে পারলুম সামনেই দুই কিং-এ তুমুল লড়াই লেগেছে। পুলিশও কিছু করতে পারছে না। জানেন তো এখানেও সব গুণ্ডাসর্দার আছে। তারা সব King of অমুক পাড়া নামে পরিচিত? দুই পক্ষে অনেকক্ষণ ধরে তুমুল লড়াই চলার পর থামল। কে হারল কে জিতল জানি না। তবে শুনলুম দুই রাজারই বহু সৈন্যসামন্ত পুলিশ ধরে নিয়ে গিয়েছে। তার পর ফের বাস চলতে শুরু হলো। চলুন, আর দেরী নয়। ইরাকী কনস্যুলেট কুইনস্ গেটে, না?'

আমি বলার আগেই ফৈজাবাদী বলল, 'হাঁ, হাঁ, কুইনস্ গেট পে হ্যায়। উস্ রোজ হাম্‌নে দেখা। আচ্ছা, ইমাম সাব, শফিক সাব, হাম তব্ আভি চলেঁ।'

বাইরে বেরিয়ে দেখলুম বৃষ্টি নেই, কিন্তু সমস্ত আকাশ জুড়ে আলো আঁধারের চিরন্তন দ্বন্দ্ব চলেছে।

পথ চলতে চলতে শাবানকে বললুম, 'জয়াদের ব্যাপারটা শুনেছেন?'

গম্ভীর হয়ে বললেন, 'কাল রাতে একজনের মুখে শুনলুম।'

'কী আশ্চর্য আর অবিশ্বাস্য ব্যাপার বলুন তো?'

'এ সব আমি এত দেখেছি যে, আমার আর অদ্ভুত, অবিশ্বাস্য বলে মনে হয় না। ওই প্রেমের ব্যাপারে অসম্ভব বলে কিছু নেই।'

'একবার চেষ্টা করে দেখলে হয় না, ওদের ভাঙা তাজমহলটাকে জুড়ে দেওয়া যায় কী না?'

'অমন কাজটিও করতে যাবেন না। কিচ্ছু হবে না। কোনো উপায় নেই। এ সব অভিনয়ের নীরব দর্শক হয়ে থাকাই হচ্ছে উত্তম পন্থা। নইলে যার জন্যে চুরী করতে যাবেন সেই বলবে চোর! উট তো আর সত্যি সত্যিই ছুঁচের ছ্যাঁদা দিয়ে গলতে পারে না। শেষে ছুঁচের ছ্যাঁদায়

আটকে গিয়ে আপনার উট আপনাকেই লাথি মারবে। প্রেম হচ্ছে উটের কাঁটাগাছ খাওয়া—আনন্দ আছে বটে, কিন্তু দরদর করে রক্তও ঝরে!'

তার পর একটু চুপ করে থকে বললেন, 'শুধু রায় আর ওথেলোই নয়, জয়া এখন লণ্ডনের অনেক লোককেই পোড়াবে, অনেক ছেলেকে নিয়েই খেলবে, ওকে দেখে লণ্ডনের এখন অনেক লোকেরই মাথা খারাপ হবে।'

'কেন?'

'দেখে নেবেন—আমি বলে দিলুম। অত attractive হলে উপায় কী! পতঙ্গ পুড়ে মরবে জেনেও আগুনের মাঝখানে ঝাঁপিয়ে পড়ে! রায় এক পতঙ্গ! ওথেলো এক পতঙ্গ! আরো অনেক পতঙ্গের মরণ দেখতে পাব! জয়ার মতন রহস্যময়ী মেয়েরা প্রেমের খেলায় খেলতে ভারি ভালোবাসে, পুড়িয়ে ওরা ভারি আনন্দ পায়!'

আমি বললুম, 'না, তা নয়। আপনি বোধহয় জয়াকে ভুল বুঝছেন। আপনি যা ভাবছেন জয়া তা নয়। অবশ্য ওকে ভুল বোঝাই স্বাভাবিক, কারণ আপনি ওর অনেক খবর জানেন না। আমার মনে হয় আমি বোধহয় জয়াকে বুঝতে পেরেছি। কয়েকদিন আগে ট্রাফালগার স্কোয়ারে ও দৈবাত আমাকে অনেক কথা বলে ফেলেছিল। সেদিন ও কী মুডে ছিল আমি জানি না! সে সব কথা আমি ইচ্ছে করেই আগে আপনাকে বলিনি।'

শাবান অবাক হয়ে বললেন, 'কী?'

আমি বললুম, 'সেদিন ট্রাফালগার স্কোয়ারে জয়া আমাকে বলেছিল, সে বিধবা, এটা তার সেকেণ্ড ম্যারেজ।'

শাবান চমকে উঠে বললেন, 'এ্যাঁ!'

আমি বললুম, 'ওর ফার্স্ট হাজবেণ্ড উইলিয়াম বিয়ের মাত্র ছ'মাস পরেই মারা যায়। কিন্তু উইলিয়ামের প্রতি যে, এখনো গভীর

ভালোবাসা ওর মনের তলায় বেঁচে আছে সেটা জয়ার প্রতিটি কথায় ধরা পড়েছিল। জয়া আরো কী বলেছিল জানেন?'

'কী?'

'বলেছিল ওথেলোর সঙ্গে উইলিয়ামের চেহারার আশ্চর্য মিল আছে। দু'জনে এত মিল যে, প্যারিসে প্রথমদিন ওথেলোকে দেখে ও চমকে উঠেছিল—যেন উইলিয়াম ফিরে এসেছে!'

'তাই না কী!!!'

'হ্যাঁ। আর আমার মনে হয় ওথেলোর প্রতি জয়ার আকর্ষনের আসল রহস্যটাই ওইখানে। সাইকোলজিষ্ট আমি নই, মনস্তত্ত্বের জটিল খবর আমি জানি না, কিন্তু আমি দেখেছি, দ্বিতীয়বার বিয়ে করলেও প্রথম স্বামীর মুখের সঙ্গে আর কোনো লোকের মিল দেখতে পেলে বিধবারা আপনাআপনি তার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়ে! কেন আমি জানি না,—কিন্তু এ রকম কতকগুলো ঘটনাই আমার জানা আছে।'

শফিক শাবান বললেন, 'সাঙ্ঘাতিক জটিল ব্যাপার দেখছি!'

তার পর খানিক চুপ করে থেকে বললেন, 'বেচারী রায়ের জন্যেই আমার মায়া হচ্ছে। পাগলটা জয়ার জন্যে অনেক Sacrifice করেছে। জয়াকে খুবই ভালোবাসত।'

আমি বললুম, 'রায়ের জন্যে তো মায়া হচ্ছেই,—আমার কিন্তু জয়া আর ওথেলোর জন্যেও কম মায়া হচ্ছে না। আপনি কী মনে করেন এ রকম জালে জড়িয়ে পড়ে জয়াই মনে মনে সাফার করে জ্বলে পুড়ে মরছে না? রায়কেও যে, সে ভালোবাসে না, তা নয়। ওথেলোকেও শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হয়ে পুড়ে পুড়ে ছাই হতে হবে। তিনটে জীবনেই শুধু আগুন জ্বলবে। মরার আগে আর নির্বাণ নেই।'

শফিক শাবান একটু ভেবে বললেন, 'বাস্তবিক, তিনজনেরই কী শোচনীয় অবস্থা! মাত্র এই ক'দিনে তিনটে জীবন নিয়ে কতবড় জটিল ট্র্যাজেডীর শুরু হলো!'

'আমি শুরুটা দেখে যাচ্ছি, আপনারা মাঝখানটা দেখবেন—শেষ তো আর এত তাড়াতাড়ি হবে না।'

দেখি কথায় কথায় ইরাকী কনস্যুলেটের সামনে এসে পড়েছি।

ভিসার ফরম্ লিখতে গিয়ে কলম চলে না, ঠাণ্ডায় হাত অবশ হয়ে গিয়েছে। কন্সালের সেক্রেটারীর ঘরে গিয়ে হীটারে খানিক হাত তাতিয়ে নিয়ে তবে কলম চালাতে পারলুম।

ফরমটা নিয়ে সেক্রেটারী ইরাকী মেয়েটা বলল, 'বিপ্লবের আগে ভিসা আমরা সহজেই দিয়ে দিতুম। কিন্তু আজকাল আমরা যতক্ষণ না বাগদাদ থেকে অনুমতি পাই, ভিসা দিতে পারি না। আমরা আপনার ভিসার জন্যে বাগদাদে অনুমতি চেয়ে পাঠাব। সেখান থেকে খবর পেলে তবে আমরা ভিসা দিতে পারব।'

মাথায় যেন আকাশ ভেঙে পড়ল। ও'দিকে আমার বুকিং প্রায় হয়ে গিয়েছে। ফরম্ দেবার আগে এ সব কিছু বলেনি। কাসেমী রাজত্বে রাতারাতি যে দাবার নিয়ম বদলে গেছে তা তো জানতুম না। ভেবেছিলুম ফরমটি লিখব আর ভিসাটি পেয়ে যাব। ককিয়ে উঠলুম, 'সে কতদিন লাগবে? আমার বুকিং হয়ে গিয়েছে।'

সেক্রেটারী মেয়েটা বলল, 'প্রিপেড টেলিগ্রাম করলে দু'তিনদিন লাগবে। আর যদি চিঠিতে হয় তবে এক মাসও হতে পারে। দু'মাসও হতে পারে। চিঠিতে হলে আমরা পয়সা দোব। টেলিগ্রাম করলে আপনাকে খর্চা দিতে হবে।'

সে বিস্তর খর্চা।

শাবান আর আমি মুখ চাওয়াচাওয়ি করতে লাগলুম।

মেয়েটা বলল, 'টেলিগ্রাম করলেও অনুমতি যে আপনি পাবেনই সে বিষয়ে কিন্তু আমরা কোনো গ্যারাণ্টি দিতে পারব না।'

ভাবলুম কন্সালের সঙ্গে দেখা করে দেখি যদি কিছু হয়।

সব জায়গায় জানি বাঁদীর মেজাজ চাঁদিতে, কিন্তু 'ইরাকিয়া'য় দেখলুম

উল্টো নিয়ম—এখানে কন্সালের মেজাজ চাঁদিতে! ভাবখানা যেন স্বয়ং কাসেম আর কী! সেই যেন বাগদাদে বিপ্লবটা করেছে!

একটা লোক কতটা শিক্ষিত, কতটা মার্জিত বুঝতে পারা যায় তার ভাষায়, তার ব্যবহারে। কিন্তু নবীন ইরাকের এই দূত একজন বিদেশীর সঙ্গে ব্যবহারের যে পরিচয় দিল তাতে মনে হলো ওর দেশের তাঁবুর বেদুইনটাও ওর চেয়ে ঢের বেশী মার্জিত।

ডিপ্লোম্যাটিস্ট মানেই জানতুম মখমলের খাপে ভরা বিষাক্ত ছুরী। এই প্রথম এক ডিপ্লোম্যাটিস্ট দেখলুম যার খাপটাও মরচে ধরা লোহার! এ রকম লোকের সঙ্গে দেখা করে কিছু না হওয়াই স্বাভাবিক।

কন্সালের ঘর থেকে বেরিয়ে এসে শাবান বললেন, 'কপাল ঠুকে টেলিগ্রামই ঝেড়ে দিন। No risk no gain. আর সঙ্গে সঙ্গে আপনি বাগদাদে যাঁর কাছে যাচ্ছেন তাঁকেও একটা টেলিগ্রাম করে দিন তিনি যেন Directorate of security-তে একটু বলেকয়ে সাথে সাথে অনুমতিটা পাঠিয়ে দেন।'

সেক্রেটারী মেয়েটাও বলল, 'সেই ভালো। তিনি যখন আপনাদের এমব্যাসির ফার্ষ্ট সেক্রেটারী তাঁর নিশ্চয়ই ও'খানে জানাশোনা আছে। তিনি এটা অনায়াসেই করতে পারেন।'

মরিয়া হয়ে বললুম, 'তাই, তবে টেলিগ্রামই করে দিন।'

মেয়েটা বলল, 'অনেক টাকার ব্যাপার, তাই আমরা নিজেরা কখনো টেলিগ্রাম পাঠাই না। আমরা আপনাকে টেলিগ্রামটা টাইপ করে দিচ্ছি, আপনি পোষ্ট অফিসে নিয়ে গিয়ে পাঠিয়ে দিন। এই আমাদের নিয়ম।'

বললুম 'তবে তাই দিন।'

মেয়েটা এক লাইন টাইপ করে দিল। দিয়ে বলল, 'আর একটা কথা। আপনাদের হাই কমিশন থেকে এই মর্মে একটা সার্টিফিকেট নিয়ে আসুন যে, আপনার গায়ে ইহুদী রক্তের নাম গন্ধও নেই।' বিশ্রী এক রকম ভাবে মুচকি মুচকি হাসতে লাগল। গা জ্বলে উঠল্।